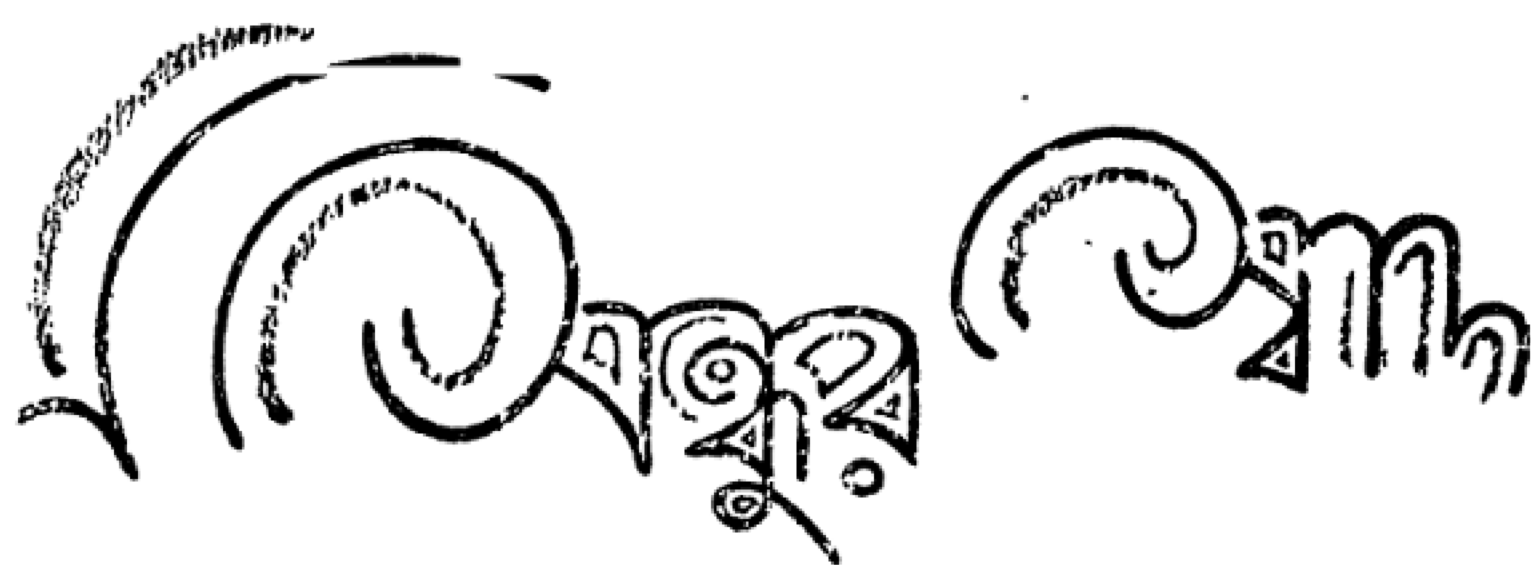


প্রেমেন্দ্র মিত্র

সম্পাদিত

সুরভি প্রকাশনী

১, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ : ২৬ জানুআরি ১৯৬০

সুরভি প্রকাশনীর পক্ষে :
প্রকাশক : শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায়
১ কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯

গ্রন্থন : মোসলেম খান্ এ্যাণ্ড্ ব্রাদার্স্

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদপট : শ্রীঅজিত গুপ্ত

মূল্য : ৭·০০ টাকা











সূচীপত্র

কৈফিয়ত

কোনো বিশেষ কাল ও দেশকে চিনতে বুঝতে উপন্যাসকে যদি কতকটা মানচিত্র ভাবা যায়, কবিতাকে ধরা যায় তার আকাশপ্রদীপ, তাহলে ছোট গল্পকে বোধহয় জানলা বলা যায়,—যে উন্মুক্ত জানলায় এক ঝলকের দেখায় একেবারে ভেতরের আসল প্রাণস্পন্দনটুকু আশ্চর্যভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ ও তারপর থেকে যাঁদের জন্ম ১৯৫৯ পর্যন্ত সেই সব লেখকদের লেখা ছোট গল্প একটি সঙ্কলনে গ্রথিত করা যে নিরর্থক খামখেয়াল নয় তাই বোঝাবার জন্যেই গোড়ার ভনিতাটুকুর অবতারণা।

বর্তমান সংকলনে সবশুদ্ধ যে ২৮ জন বাংলা গল্পকারের বাছাই করা আটাশটি গল্প সংগৃহীত, তাঁদের সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীসুবোধ ঘোষের জন্ম ১৯০৯ ও সর্বকনিষ্ঠ দিব্যেন্দু পালিতের ১৯৩৯-এ। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁদের রচনাই এই সংগ্রহের উপকরণ। গল্পগুলি অবশ্য সব ক্ষেত্রে জন্মকাল অনুযায়ী সাজান হয় নি, বরং লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পারম্পর্যই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

লেখক ও কাহিনী নির্বাচনে সময়ের এই সীমারেখা টানার প্রধান কারণ এই যে আমাদের মতে এই সময়-সীমার মধ্যে এ যুগের একটি বিশিষ্ট চেহারা রূপ ও চরিত্র সুস্পষ্ট আকার পেয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে বারুদের বিস্ফোরণ এবং যার ধূমায়িত আগুন আজকের পৃথিবীতেও নেভে নি সে বারুদের বিভিন্ন মশলা তার অনেক আগে থেকেই অবশ্য জমা হতে সুরু করেছিল কিন্তু সাহিত্য-চেতনার উন্মেষের সঙ্গেই এই প্রচণ্ড আলোড়নের যুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় এই সময়-সীমার লেখকদের-ই হয়েছে। প্রথম চোখ খোলার সঙ্গেই তাঁরা বহ্নিবলয় বেষ্টিত বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন বলা যায়।

উদ্ভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে সাহিত্যকার হিসাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুণ তাঁদের সকলের রচনায় বারুদের গন্ধ লেগেছে এ কথা ভাবা অবশ্য ভুল। অন্তরের যে নিভৃত ধ্যানলোকে সৃষ্টির সত্যকার বীজ অঙ্কুরিত হয় সেখানে বাহ্যিক আলোড়নের ঢেউ তাঁদের অনেকেই পৌঁছতে দেন নি কিন্তু যুগের অশান্ত বাষ্পমণ্ডল তাঁদের দৃষ্টিকে যে কিছুটা রঙীন বা তির্যক বা অপ্রত্যাশিত দিকে তীক্ষ্ণ করে তুলেছে এ সংগ্রহে 'দৃষ্টি' নামে যাঁর রচনা অন্তর্ভুক্ত তাঁর মত সব সংক্রামকতা অতিক্রান্ত ধ্রুবকেন্দ্রিক রচয়িতার কলমের কাজেও তা প্রচ্ছন্ন নয়।

শুধু যুগমুকুর হওয়াই এ গল্পসংগ্রহের একমাত্র বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব বললে অবশ্য এসব গল্পের অমর্যাদা করা হয় বলে মনে করি। কাল ও দেশাশ্রয়ী হয়েও দেশকালাতীত গহন কোন শিল্পসত্যকে স্পর্শ করতে পেরেছে বলেই এ সমস্ত গল্প

সাহিত্যের দুর্লভ রাজটিকা পেয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অস্বীকার করবার নয় যে এ সংগ্রহের 'সুন্দরম্' 'বৈয়াকরণ' কি 'চোর', 'কন্যা' কি 'শুভক্ষণ', শোক' কিংবা 'ঈর্ষা' বা 'অশ্বত্থ' 'ছেঁড়া তমসুক' কি 'জবানবন্দী' ইত্যাদির মত গল্প অন্য কোন যুগে লেখা বোধহয় সম্ভব ছিল না।

গল্প চিরকালের জিনিষ আকারে তা ছোটও নিশ্চয় আগেও হ'ত। কিন্তু ছোটগল্প বলতে আমরা যা বুঝি তার বয়স দুই শতাব্দীতেও পৌঁছয়নি। এ ছোট-গল্পের আদল বিদেশ থেকে নিয়ে বাংলাভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যোগ্য অনেক উত্তরসাধক তার মধ্যে নিজস্ব মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত আটাশটি গল্পে সেই সৃষ্টিধারা কত নব নব অভিযানের পথে সার্থক হয়েছে রসিক পাঠকসাধারণ তা উপভোগের সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের অদম্য প্রাণশক্তিতে গর্ব অনুভব করবার কারণ পাবেন বলেই মনে করি।

পরিশেষে এ সংকলনের নাম 'সিন্ধুর স্বাদ' দেওয়ায় একটু কৈফিয়ত দেওয়া বোধহয় প্রয়োজন। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের জীবন বিস্ময়বৈচিত্র্য ও রহস্যে সমুদ্রের চেয়েও অসীম, অগাধ ও অতল। সে অসীম অতলতার স্বাদ সমস্ত সমুদ্র নিঃশেষে পান করে পাওয়ার জন্যে অগস্ত্য হওয়া আমাদের বোধহয় সম্ভব নয় প্রয়োজনও বোধহয় নেই। জীবনের অগাধ রহস্যসমুদ্রের স্বাদ গণ্ডুষে দেবার ক্ষমতা যা রাখে তাই হ'ল সার্থক ছোটগল্প। সেই কারণেই এ সংগ্রহের নাম সিন্ধুর স্বাদ। এ নামকরণ যিনি করেছেন, এ সংগ্রহটি প্রকাশের ব্যাপারে সেই শ্রীরথীন্দ্র পালিতের মূল্যবান নেপথ্যভূমিকা শেষ পর্যন্ত সকলের অগোচর থাকা বোধহয় উচিত নয়।

সুন্দরম্

সুবোধ ঘোষ

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে সে! আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জন দুপুর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তাড়িৎ স্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুঁজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্, এই এগজামিনটা পর্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিষ পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক—এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম!

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোট বোন রানু আর ঝি—তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে—যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়! ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে—ছি, ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারের মনকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে

সই করালেন।—নাও সই কর। মুন্সেফী চাকরী, ঠাট্টা নয়! সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ীর বিষণ্ণ আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই, সব হো যায় গা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায় নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ একআধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ীর সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বললো—আপনাকে এবার ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞাচক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেণ্ট বোধ হয় সার্থক হয়ে উঠলো। সুকুমার কাব্য পড়ে, বার কয়েক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবু ফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ সুখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত ক'রে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু!

—কি?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে, আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্পপণে দয়ালু সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন।—ভাল করে দেখে নে সুকু। মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে।

যাত্রাকালে রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে! বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী সাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছে ধারকরা চুড়ি, রুলি, বালা ও অনন্ত কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট্ করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নাই!

দেখার পালা শেষ হ'লো। বাড়ী ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যোগীবর, পছন্দ তো?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয়!—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপেই রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হাঘরের মেয়ে এনে হবে কি? মুহুরী টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতে চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্রী দেখছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়। তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবন-সঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা প্রথম গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্বল্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারান্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাস ডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কাকে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউন্ডটার বিকট চীৎকার আর লাফঝাঁপ! ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোঁটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ীর সবাই এল বেরিয়ে।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পটিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কৃপা কর বাবা!

—এই বুড়ীটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরাণী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠ্ঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—আপন মেয়ে?

—হাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই করা থালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি। কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর।

মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেঢপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দন্তুর একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে। কিন্তু যদু বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। দেশী মদের একটা নতুন ভাটিখানা হবে সেখানে। সহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নাই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ায় ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বল্লেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই, এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হাঁ, দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়ীও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্বাদ করে চলে যাবার পর তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন? সবই হবে। তবে সেটা আর সত্যিই বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হলো দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত একটু ছায়া—প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইসারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধ হয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচায্যি আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠছে। ভটচায্যি বাড়ীর সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিষটা। কুলনারীর গুণ লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্বাচন করতে হবে—গৃহিণী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সবদিক যাচাই করে দেখতে হবে। সারা জীবনের ধর্ম সাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই হলো না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হাঁ, তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য একটা দেবসুলভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশী। রোগা বা অতিতন্বী দুইই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কি না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করল রাণু।—না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন—ভালই হলো। জানি তো, যা কিপটে এই অনাদি চাষা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিষ নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ীর সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল।—যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকারিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলেছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ—সুন্দরী বামা, রাজপদং ধনসুখং ইত্যাদি ইত্যাদি।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাইকরা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুম্‌কি দিল।—ওঠ্ এখান থেকে, ᾽! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিস্‌নে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল্।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছু নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম! একবার ভাব তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কান পর্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চিজ হবে সেটা!

কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাতপাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা ষ্ট্যান্ডার্ড অবশ্য আছে; অ্যানথ্রপলজিষ্টরা যেমন বলেন...।

—অ্যানথ্রপলজিষ্ট না চামড়াওয়ালা? কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন।—আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিদ্যের মুরোদ! মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব করে? আধুনিক হয়েছে? যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ী থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বল্‌তে বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে রইল। কৈলাসবাবু

সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাসবাবু জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমাকে আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নাই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য। মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুষ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। এক দৃঢ়া দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হলো। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জ স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে।

সত্যবাবু মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিলেন।—বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোর্টে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো—এ নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ পিসিমা।

পিসিমা একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সঙ্গেই বিয়ের এক রকম ঠিক। এবার একটু শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয়নি তাই হলো। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। রাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্য দাসের সঙ্গে বড় গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুর সঙ্গে একপ্রস্থ বাক্‌যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হদকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়ের ছায়া মাড়াবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিম্‌টে দিয়ে বিদেয় করে দাও না!

কৈলাসবাবুর অটলতার ব্যতিক্রম হলো না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্তি হয়ে রাণুকে বললো—সেই দৈবজ্ঞীটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো!

—কোন্ দৈবজ্ঞী?

—ঐ যে-বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এ বার্তালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ?

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

—কেন দেব না?

—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্ক-বিম্বাধর—আরও যা আছে লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমারের মার মেজাজও ধৈর্য হারাবার উপক্রম করলো। তবু মনের ঝাঁঝ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না। আমরা দেখছি।

—ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার তা হলে আমি দায়মুক্ত?

—হাঁ।

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আর আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না ঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু ডোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপার নিতাই?

—বড় পাজি এ ছুঁড়িটা হুজুর। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলো। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় বাড় বেড়েছে ছুঁড়ির। ভিখিরীর জাত দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মত্তা বাতুলীর মত আরও কটা ইটপাটকেল

ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তার বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ করে রাখবি।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়েছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আরও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হলো লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—এ কি ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা; তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো!

কৈলাস ডাক্তার সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে? টেবিল থেকে নতুন বেলেডোনার শিশিটাই বা গেল কোথায়?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হলো।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে! বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরুর সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যদু ডোম এসে তখুনি খবর দিল, তিনটে লাস এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চল্ রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে!

ময়না ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে নাকি রে যদু?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচে পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকী একটা শুধু...।

—নে কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরি মেয়েটা।

কৈলাস ডাক্তার বোকার মত যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা সাড়ীটা, গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস্ কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল করে। ইউকালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আর একটা বাতি জ্বাল।

—One more unfortunate!

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হলো। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের ওপর। গলাটা চিরে দেওয়া হলো লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ও দুপাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হলো। সাঁড়াসী দিয়ে পট্‌পট্ করে পাঁজরগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেত পটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

—ইস্, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যদু বললো—হাঁ হুজুর কাঁদবেই তো। সুইসাইড কি না। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই! গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা!

—এত লালা! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত!

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছন্ম মানুষের রূপ। এই নবনীত-পিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সুসূক্ষ্ম কৈশিক জ্বাল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখলেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন—খণ্ডস্ফটিকের মত পাঁতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক্......।

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো—এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দুভাগ করা হলো পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্লোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাউরুটী—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়লো মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছট্‌ফট্ করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন—পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ির আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুণ্ঠিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যদু এসে ডাকলো—হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই বললো—এত দেরী কেন রে যদু?

—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

আশাপূর্ণা দেবী

গাড়ীভাড়া খরচা করে বড়দি বারকয়েক এলেন হাসিকে বোঝাতে, বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিবৃত্ত করতে এই সর্বনাশা খেয়াল থেকে। কিন্তু হাসি সংকল্পে অটুট। কিছুতেই যে বুঝবে না প্রতিজ্ঞা করেছে তাকে কে বোঝাবে?

হাসির শাশুড়ী ঊষার হাত ধরে মিনতি করলেন—বোনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আটকে রেখে যাও মা, আমার অমলের প্রাণটা রক্ষে করো। বৌমা চলে গেলে ও কি একদিনও বাঁচবে?

ঊষা হতাশসুরে বলে—কি করবো মা, এই তো এতক্ষণ পাখীপড়া করালাম, কিছুতেই নয়! সেই এক জেদ ধরে বসে আছে। কী যে শয়তান ঘাড়ে চেপেছে!

—শয়তানই বটে মা, আমার ভাগ্যে সে শয়তান যে কোথায় বসে ছিল ওৎ পেতে, আমার সোনার সংসার ছারেখারে গেল। অমন চাঁদের মতন ছেলে আমার, গায়ে অসুরের বল, সেজে গুজে আপিস গেল, আর পঙ্গু হয়ে বাড়ী ফিরলো। এ কি মানুষের ভাগ্যে কখনো কারুর হয়েছে?

ঊষা নিরুপায় সান্ত্বনার সুরে বলে—মানুষের ভাগ্যেই হয় মা, ভগবান যে মানুষের জন্যেই সকল শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন।

—তাও যেন মনকে প্রবোধ দিলাম—লক্ষ্মী দেবী কেঁদে ফেলে বলেন—আমার অমন গুণের বৌ কেন অমন হয়ে গেল? এক এক সময় ভাবছি মনের আক্ষেপে পাগল হয়ে গেল না কি? নইলে যার একেবারে স্বামীঅন্তপ্রাণ ছিল, একবেলার জন্যে চোখছাড়া করে বাপের বাড়ী যেতে চাইত না, সেই স্বামীকে এই দুর্দশা দুর্দিনের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যাবে বিদেশে চাকরী করতে! একী সহজ মানুষে পারে?

ছোটবোনের দুর্মতির কথা মনে করে ঊষার আর কথা জোগায় না মুখে, তাই কথার বদলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

লক্ষ্মী দেবী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কাতরভাবে বলেন—হ্যাঁ মা, ঘাড়ে ভূত না চাপলে কখনো তোমাদের কথা পর্যন্ত এমন অগ্রাহ্যি করে? বড়ভগ্নী-পতিকে কতো মান্য ভক্তি করে, সকল পরামর্শ শোনে—তাঁর কথা সুদ্ধু কেয়ার করলো না!

—কই আর করলো মা! আমরা তো দুটো মানুষ হেরে গেলাম।

—কি বলে কি?

—বলে আর কি—উষা শুকনো মুখে বলে—বলছে, রোজগার করে টাকা পাঠাবে নার্স রাখতে। আফিসের মাইনে তো অর্ধেক করে দিয়েছে? আর তাই বা ক'দিন দেবে বলুন? এই ছ'মাস দিচ্ছে এই ঢের। আরও নয় ছ'মাসই দিক।

—টাকার কথা যদি বলো মা—লক্ষ্মী দেবী কিছু উৎসাহের সঙ্গে বলেন—আমার ঘরবাড়ী বেচেও আমি অমলের চিকিচ্ছে করাবো, আর ছেলে আমার ভালো হয়ে উঠবে না কখনো—ভগবানের বিচারে কি এমনই হবে? অমল ভালো হলে তখন আবার সব হবে।

এই অসম্ভবের স্বপ্ন যে কোনদিনই সফল হবে না সেকথা লক্ষ্মী দেবী না বুঝলেও উষা বোঝে বই কি। কিম্বা লক্ষ্মী দেবীও বোঝেন হয়তো, শুধু বুঝতে চান না বলেই এই আকাশ কুসুমের আলোচনা।

উষা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল—তা'হলে উঠি মা, হাসি এমনভাবে আমাদের গালে মুখে চূণকালি দেবে একথা কোনোদিন কল্পনাও করি নি। মুখ দেখাবার পথ রাখলো না, ছি ছি! বুঝলাম সংসারে টাকারও দরকার আছে, কিন্তু সে টাকা—তুই যদি নার্সের জন্যেই খরচ করবি তা'হলে আর স্বামী ছেড়ে চলে যাওয়া কেন? নিজেই সেবা কর?

—এই তো মানুষের মতন কথা! বুদ্ধির কথা!—লক্ষ্মী দেবী ঘাড় নেড়ে বলেন—আমিও তো চব্বিশ ঘণ্টা তাই বলছি যে—'বৌমা, তুমি চলে গেলে মনের আক্ষেপেই ওর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, তখন আর তোমার নার্সেই বা কি করবে টাকাতেই বা কি হবে? তা' কে শোনে কার কথা!

—কি বলে আপনাকে?

—সেই পুরনো কথা, যা বলছে—'কারুর অভাবে কেউ কখনো সত্যি করে মরে যায় না মা, হয় তো দেখবেন আমার অনুপস্থিতিতে ওর উপকারই হবে।' অনেক সময় না কি বেশী রাগ দুঃখু বা মনোকষ্টে পক্ষাঘাত সেরে যায়। বুঝিও না মা, ওসব কেতাবী কথা। একেই তো বাছা নিজের দুর্ভাগ্যে মরমে মরে আছে, আর কতো মনোকষ্ট চাই?

লক্ষ্মী দেবীর কথায় অবশ্য যুক্তির বালাই খুব বেশী নেই, বরং হাসির কথা এতে কিছুটা আছে। কারণ যেমন আকস্মিকভাবে সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে অমল, তেমনি আকস্মিকভাবেই হয়তো ফিরে পেতে পারে কোনোরকম দুর্দান্ত মানসিক আঘাতে। পাক না পাক তবু যুক্তিটাকে খুব অস্বীকার করা চলে না, কিন্তু সেইটাই সত্যিকার কারণ নয় হাসির। কারণ শুনে যে উষার হাত পা আছড়াতে ইচ্ছে করছে। ছি ছি!

বলে কি না—'পক্ষাঘাতগ্রস্থ পঙ্গু স্বামীকে ত্যাগ করার বিধি শাস্ত্রে আছে দিদি, খুলে বরং দেখো বাড়ী গিয়ে—'

শোনো কথা!

—শাস্ত্র মেনেই সব করা হচ্ছে যেন!

শাস্ত্রে কি না আছে? একটা পুরুষ মানুষে একশোটা বিয়ে করতে পারে এ কথাও তো শাস্ত্রে আছে, কই করুক বিয়ে? আর করলেই লোকে 'ধন্যি ধন্যি' করবে কি না? আসল কথা, মাথারই কিছু দোষ ঘটে গেছে মেয়েটার!

কথাটা ভেবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না, কিন্তু সে ভাবনাটা যে নিতান্তই কষ্ট-কল্পনা সেটা হাসিকে দেখলে আর বুঝতে দেরী হয় না।

এই তো দেখে এলো ঊষা, বিদেশে চাকরী করতে যাবার উপযুক্ত সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করতে কিছুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না হাসির।

নিজে থেকে গায়ে পড়েই বরং বললো—নতুন নতুন শাড়ী ব্লাউস গোছাচ্ছি দেখে অবাক হচ্ছো দিদি? কিন্তু—সেণ্টিমেণ্টের দিক দিয়ে না দেখে বাস্তব অবস্থাটা কল্পনা করো—আমার স্বামী অসুস্থ, আমার মন খারাপ, অতএব একটা বিদেশ বিভূঁই জায়গায় একবস্ত্রে গিয়ে উঠলাম! কী চমৎকার! অ্যাঁ?

এরপরই ঊষা হতাশ হয়ে উঠে পড়েছে।

তর্কের কাছে বরং তর্ক চলে, ব্যঙ্গের কাছে যে যুক্তি তর্ক সবই অচল।

ঊষা চলেই গেল।

কিন্তু মেজদি সেজদিই বা ছোটবোনের এরকম অমানুষিক ব্যবহারে একেবারে নীরব থাকবে কেন? খবর পেয়ে চন্দননগর থেকে এলো মেজবোন লীলা। মাসছয়েক আগে এসেছিল একবার অমলের আকস্মিক দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি জানাতে। আর এই।

লীলাকে দেখেও লক্ষ্মী দেবী আর একবার হাঁউমাউ করে উঠলেন—এসেছো মা? এই খানিক আগে বড়মেয়ে গেলেন। এই দেখো আমার সব্বনাশের ওপর সব্বনাশ!

লীলা গম্ভীরভাবে বলে ওঠে—রোসো না আমি ওর চাকরী করতে যাওয়া ঘোচাচ্ছি, পাগল না মাথাখারাপ! অমলকে এই অবস্থায় ফেলে ওর একঘণ্টার জন্যে নড়বার উপায় আছে না কি? দাঁড়ান না, ওর খেয়ালের ভূত নামাচ্ছি ঘাড় থেকে। কে ওর মাথায় ঢুকিয়েছে এসব?

—জানি না মা, আমার কপাল। আমার তো মরণ নেই? চারকাল এসেছি আরও চারকাল থাকবো। পরমায়ুর শেষ নেই।

নিজের অন্তহীন আয়ুর নির্মমতায় কপালে করাঘাত করেন লক্ষ্মী দেবী।

কিন্তু লীলার আস্ফালন বৃথাই হ'ল।

যে সমস্ত চোখা চোখা বাক্যবাণ তূণে সজ্জিত করে রণক্ষেত্রে এসে হাজির

হয়েছিল সে, প্রতিপক্ষের অভূতপূর্ব অস্ত্রে যেন থতমত খেয়ে ভোঁতা হয়ে গেল সে বাণ।

লীলাকে দেখেই হাসি হেসে উঠে বললে—এই যে মেজদি, খবর পেয়ে ছুটে এসেছো? নাও বোসো সুস্থির হয়ে, এক পেয়ালা চা খেয়ে নাও বরং। তারপর আরম্ভ করো।

—আরম্ভ মানে? কিসের আরম্ভ?

লীলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—কিসের আবার? সুশিক্ষার—নীতিরত্নমালার উপদেশাবলীর। 'পাপিষ্ঠা হাসি, তোর একি দুর্মতি! তুই আমাদের নাম ডোবালি, আমাদের মুখ হাসালি; তুই বুঝছিস না তুই কি করতে চলেছিস—এরকম গর্হিত কাজ করলে নরকেও তোর ঠাঁই হবে না'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

খিল খিল করে হেসে ওঠে হাসি।

লীলা বিমূঢ়ভাবে বলে—তুই হাসছিস?

—উপায় কি? ঠ্যাং ছড়িয়ে কাঁদতে যখন পারছি না।

—কিন্তু ভেবে দেখ—লীলা আরম্ভ করে—ভেবে দেখ অমলের মনের অবস্থাটা? তোর কাছে এরকম ব্যবহার পেলে ও হঠাৎ হার্ট ফেল করতে পারে তা জানিস?

—ক্ষেপেছো মেজদি? হার্ট ফেল করা অতো সোজা নয়। করলে সেই দিনই করতে পারতো, যেদিন একটু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে চিরদিনের মতো অকর্মণ্য হয়ে গেলো।

লীলা হতাশ ভাবে হাসির মুখের দিকে তাকায়, একী ওর পরিচিত হাসি? চিরদিনের আদুরে ছোট বোনটী?

—তুই না ওকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলি?

হঠাৎ যেন ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে লীলা।

—মনে আছে সেকথা? মেমারিটা তোমার ভালই বলতে হবে মেজদি।

—তোমার মতন পাষাণ তো সবাই নয়। সত্যি আমি ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি তুই অমলকে ছেড়ে বিদেশে চলে যাবার কথা ভেবেছিস কি করে? একটা সুস্থ মাথা লোক এরকম কথা ভাবতে পারে?

এবার হাসি একটু গম্ভীর হয়ে বলে—আমিও ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি মেজদি তোমাদের এতো বাড়াবাড়ি শোকের ঘটা দেখে! একটা সুস্থ মানুষকে চিরদিনের জন্যে একটা ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে বেঁধে রেখে দেওয়াই কি ন্যায় ধর্মের নিদর্শন?

—থাক ধর্মের কথা আর তুলো না তুমি—লীলা আস্তে আস্তে নিজের হৃতশক্তি ফিরে পায়—ধর্মজ্ঞান থাকলে হিন্দুর মেয়ে হয়ে আজ এমন সৃষ্টিছাড়া তর্ক তুলতে পারতে না। যে দেশে—

—থাক মেজদি, বেহুলা লক্ষহীরার গল্প বড্ড সেকেলে হয়ে গেছে, নতুন কোনো নজীর থাকে তো বলো।

—নজীর দিতে আমার দায় পড়েছে। সোজাসুজি বলছি তোর কথাবার্তা শুনে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে আমার। কিন্তু এতই বয়ে গেছিস লোকলজ্জাও কি নেই?

—আছে বলেই তো সময় থাকতে সাবধান হচ্ছি মেজদি। এরপর তোমাদের দরজায় হাত পেতে পেটের ভাত যোগাড় করতে হতো নাকি? তা'তে লজ্জা ছিল বৈকি।

—কিন্তু অফিস থেকে তো ওকে মাইনে দিচ্ছে শুনেছি।

ঠিকই শুনেছ। তবে পুরো নয় অর্ধেক, কিন্তু চিরদিন তো দেবে না?

লীলা স্তোক দেওয়ার ভঙ্গীতে বলে—বেশ বাপু তা'হলে তখনই না হয় করিস চাকরী।

—একটু ভুল করছো মেজদি। দুশো টাকার চাকরীটা চিরদিন ধরে অপেক্ষা করে থাকবে না আমার আশায়।

—কথায় তো চিরদিন ওস্তাদ—কিন্তু এই যে চাকরীর বড়াই করছিস এ কার দয়ায়? অমল যদি তোকে অত চেষ্টা করে মানুষ করে না তুলতো?

—তুলেছে নাকি? হাসি আর একবার হেসে ওঠে—মানুষ আর করলে কই? তোমরা তো সবাই বলছ অমানুষ।

—একশোবার বলবো। কিন্তু কথা হচ্ছে লেখাপড়া শেখানোর। বিয়ের সময় কি ছিলি? ভারী তো একটু ম্যাট্রিক পাশ, অমল না পড়ালে আজ তুই নিজের নামের পেছনে এম, এ, লিখতে পারতিস?

—এ তোমার বাজে যুক্তি মেজদি। তা'হলে তো বলতে পারো—যেহেতু ওর ভাত খেয়ে এই আট বছর ধরে জীবন ধারণ করেছি আমি, সেইহেতু ওর সেবাতেই এ জীবন নিয়োগ করা ছাড়া গতি নেই।

—নয়ই তো।

—তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মেজদি। আমাকে 'আমি' না ভেবে একটা মানুষ ভাবলে দোষ কি? ভাগ্যের অভিশাপে একজন অনড় পঙ্গু হয়ে গেল বলে আর একটা সহজ সুস্থ সবল জীবন অনড় করে রেখে দিতে হবে? তার সমস্ত ভবিষ্যত মুছে দিতে হবে একটা কালির পোঁচড়ায়? মাথায় তুলে দিতে হবে মানুষের সমাজের দেওয়া অভিশাপ?

—তবে আর একটা বিয়ে করগে যা?

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে ওঠে লীলা।

কিন্তু আশ্চর্য হাসির হাসবার শক্তি। এতো বড় গালি খেয়েও হেসে ওঠে—তা' আর পাচ্ছি কই? অতোটা উন্নতি করে উঠতে পারছি কই? শুধু একটু সরে গিয়ে হাঁফ নিতে চাই মেজদি, ওর সান্নিধ্য ছেড়ে ওর আওতা ছেড়ে।

তা' ছাড়া—ভেবে দেখো—উপায় থাকতে হাত পা থাকতে একটা পঙ্গু মানুষের গলগ্রহ হয়ে থাকাই কি ভালো? এখনো ওর প্রত্যাশায় থাকতে হবে অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনে—সেইটেই গৌরব?

—জানি না। এসব কুতর্কের উত্তর নেই আমার কাছে। তবে এও বলছি হাসি, অমলের দীর্ঘনিশ্বাস তোর ভবিষ্যত জীবন ছারখার করে দেবে।

—শাপ দিচ্ছো মেজদি।

—শাপ নয়, সত্যি কথাই বলছি। এখনো ভেবে দেখ হাসি।

নাঃ মেজদি, ভাবাভাবি সব শেষ করে ফেলেছি। ছ'মাস ধরে ভেবেছি। প্রতিদিন রাত্রি প্রত্যেকটী ঘণ্টা মিনিট ভাবছি। দেখলাম এ ছাড়া আর কিছু হয় না। ভালোবাসার খাতিরে বা নীতি ধর্মের দোহাই দিয়ে—কোন কিছুতেই মৃতের সঙ্গে জীবিতকে একসঙ্গে কবর দেওয়া চলে না।

লীলারও বাক্য হরে যায়।

অতএব চলে যাওয়াই ভালো। ওদিকে ঘন ঘন তাগাদা আসছে ট্রেন ফেল হবার আশঙ্কায়। অমলের সঙ্গে দেখা করবার মুখ নেই। হাসির কুকীর্তির গ্লানি যেন তার দিদিদেরও স্পর্শ করেছে।

—মেয়েমানুষকে চিনলাম—

গাড়ীতে উঠে প্রথম কথাটী উচ্চারণ করে লীলার বর।...আর আশ্চর্যের বিষয় লীলা থাকে চুপ করে। লীলার দাম্পত্য ইতিহাসে এরকম ঘটনা বোধ করি এই প্রথম। এতবড় অপমান সয়ে চুপ করে থাকা।

লীলা ঊষা মুখ দেখাতে পারেনি, কিন্তু হাসি দেখাতে গেল দিব্যি স্বচ্ছন্দে। যাবার সময় গেল বিদায় নিতে!

—আমি তা'হলে যাচ্ছি।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই বললে হাসি।

—সাবধানে যেও—অমলও সহজভাবেই বলে—সব ঠিকঠাক গুছিয়ে নিয়েছো তো? বাইরে গিয়ে আবার মুস্কিলে না পড়তে হয়—

—নিয়েছি সব।

—তবে আর কি—তোমার ট্রেনের সময় হয়ে এলো বোধ হয়।

—এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে।

—তা' হোক কিছুটা আগে যাওয়াই ভালো।

মিনিট দুই নীরবে বসে থেকে উঠে দাঁড়ায় হাসি—তা'হলে চললাম?

—চললাম বলতে নেই বলতে হয় 'আসি'। বলেই হেসে উঠলো অমল। বোধকরি ছ'মাস পরে এই প্রথম।...ছ'মাসের মধ্যে একবারও এমন করে হেসে ফেলেনি অমল।

কেনই বা হাসবে? ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যার অহরহ দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে হয় সে হাসবে কোন সুখে?

সুধু আজকের হাসিটা বোধকরি নিতান্ত ভাগ্যকে পরিহাস।

তবু হাসলো!

আশ্চর্য ঠিক আজকেই, যেদিন শ্রান্ত ক্লান্ত বেচারা হাসি পালিয়ে যাচ্ছে মৌন গম্ভীর অমলের সান্নিধ্য থেকে!

যাক আর কিছু বলবার নেই!

কীই বা থাকতে পারে? পথে বেরোবার সময় হিতৈষী আত্মীয়ের যেমন উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা উচিৎ, তা করেছে বৈ কি অমল, ভদ্রতার ত্রুটিও কিছু করেনি। এমন কি 'চললাম' না বলে যে 'আসি' বলতে হয় এটুকুও বলতে ভোলেনি।

'তবে আর কি!' সত্যিই বটে তবে আর দেরী করে লাভ কি হাসির।

ঘর থেকে বেরিয়ে কেন কে জানে আর একবার পিছু ফিরে চাইলো হাসি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে যেন পাথর হয়ে গেল।

কী অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে অমল।

ঘৃণা? ভয়? ধিক্কার? ব্যংগ? কি আছে ওর দৃষ্টিতে?

চোখের তারা দুটো অমন জ্বলছে কেন?

কিছুই নয় হয়তো, হাসির মনের ভ্রম মাত্র।

অক্ষম অনড় মানুষ অমনিই চেয়ে থাকে চলন্ত মানুষদের পানে। হয়তো ছমাস ধরেই ওই রকম চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছে অমল।

তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল হাসি, একঘণ্টা সময় থাকতেই বেরিয়ে পড়লো স্টেশনের উদ্দেশে।

কিন্তু সেই দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে কেন?

এই তিন মাইল পথ ছায়ার মতো পিছু পিছু আসছে সেই চোখের দৃষ্টি?

হাসি কি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে?

দিদিদের সংগে যে এতো জোরালো ভাষায় তর্ক করলো হাসি সেকি নিজের মনকে আশ্রয় দিতে? ওকালতি করতে নিজের পক্ষে? কিন্তু সে জোর আর খুঁজে পাচ্ছে না কেন? সেই দৃষ্টি! হাসির মর্মমূলে কেটে কেটে বসে যাচ্ছে সেই দৃষ্টি! অমলের সমস্ত সত্তা কি দুই চোখের দৃষ্টিতে এসে জড় হয়েছিল? তাই কিছুতেই ভুলতে পারছে না হাসি, মুছে ফেলতে পারছে না মন থেকে!

এ দৃষ্টি কী কোনদিনই মিলিয়ে যাবে না?

এমনি করে দৃষ্টির পাহারা দিয়ে চিরদিনের জন্যে হাসিকে বেঁধে রাখবে নাকি অমল? অহরহ সম্মুখ থেকে বিদ্ধ করতে থাকবে—থাকবে পিছন থেকে অনুসরণ করতে?

তার চেয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কটুভাষায় হাসিকে তিরস্কার করলো না কেন অমল? সুধু চেয়ে থাকলো কেন?

কিন্তু সে দৃষ্টি তো তিরস্কারের নয়?

তবে? তবে?

ঘৃণার নয়, ধিক্কারের নয়, বিদ্রূপের নয়, তবে কি?

না না, এতক্ষণে বুঝতে পারছে হাসি চিনতে পেরেছে সে দৃষ্টিকে।

সে দৃষ্টি ঔদার্যের—করুণার—কৃপার। শক্তিমানের চোখ যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অক্ষম দুর্বল মানুষের দিকে।

হাসির অক্ষমতাকে ক্ষমা করেছে অমল করুণা করে।

খাওয়া শোওয়া থেকে সুরু করে প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি বিষয়ে যে অমল চেয়ে থাকতো হাসির করুণার মুখাপেক্ষী হয়ে।...হ্যাঁ করুণা ছাড়া আর কি? অসহায় দুর্বলকে আর কি করা যায় করুণা ছাড়া? আর আজ অমল কৃপাদৃষ্টিতে চাইল হাসির পানে?

কিন্তু হাসি এ অপমান সইবে কেন?...

কেন লাফিয়ে পড়বে না চলন্ত ট্রেন থেকে?...

পেশা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

টিনের ওপর আলকাতরা দিয়ে অসমান হস্তাক্ষরে লেখা আছে 'নেতাজী কেবিন'।

মফঃস্বলের শহর। আদালত, হাসপাতাল, বাজার সবই পাশাপাশি, তাই টিনের চেয়ার ও ভাঙা বেঞ্চিতে সমৃদ্ধ এই হোটেলটী চলে ভালো। সকালের দিকে অবশ্য তেমন ভীড় নেই, অল্প কয়েকজন চায়ের খদ্দের। আমার টেবলের অপর দিকে যে বেঁটে লোকটী বসেছিল, যেমন তার আকৃতি তেমনি তার পরিচ্ছদ। একবার তারদিকে চাইলে দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতে প্রবৃত্তি হয়না। আপনমনে তাই ধোঁয়া-গন্ধওলা চাটুকু শেষ করছিলাম। সহসা সামনের লোকটী বলে উঠল, আমাদের কি বাবা, সরকারী চাকরী, আর দুটো বছর কাটলেই বাড়ীতে বসে পায়ের ওপর পা দিয়ে পেন্সন পাব। এইবার লক্ষ্য করলাম লোকটার কাঁধের ওপর একটা চামড়ার বেল্ট চাদরের মত ফেলা আছে, তার পেতলের চাপরাশে সরকারী হাসপাতালের নাম লেখা। ভদ্রতার খাতিরে প্রশ্ন করলাম, তুমি বুঝি হাসপাতালে কাজ কর?

চায়ে ভেজা গোঁফ বাঁ হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বললে, হাসপাতালের জমাদার—তা জুতোসেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব কাজই নিজের হাতে করতে হয়। হুজুর বুঝি এ জেলায় নূতন এসেছেন?

মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, একটা মামলার তদবির করতে এসেছি। এখানে তো শুনেছি একটা মেডিকেল স্কুল আছে, কতগুলি ছাত্র?

আছে দুচারটী—তবে এখন গরমের ছুটী, হুজুর বুঝি উকীল? তারপর একটু থেমে বললে, মফঃস্বলের স্কুল—হাসপাতাল, কী বা আছে?—কতকগুলি যন্ত্রপাতি, দুচারটে পাড়াগেঁয়ে ম্যালেরিয়া রোগী আর লাসঘর।

লাসঘর! মড়া রাখা হয় বুঝি? দেখতে দেয়? আমি কখনও লাসঘর দেখিনি।

আপনার কি আর ভালো লাগবে? লোকটী বিনয়ের ভংগীতেই বলে। এখানে তো আর বরফের ঘর নেই। এ্যাসিডে ভিজিয়ে রাখা হয়।

বললাম, লাস এগজামিন করতে কি দেরী হয়?

দেরীও হয়, তাছাড়া ছেলেদের কাটাকুটির জন্য দু একটী রাখতেও হয়।

অদ্ভুত কথা। বললাম, কখন আসব?

আজও আসতে পারেন, কিম্বা কাল নটার সময়। যা হুজুরের খুশী।

এইভাবে হাসপাতালের লাসঘরে ঢোকবার আমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম। একরকম অতি সহজেই বলা চলে। লোকটীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য হাতে আট আনা পয়সা দিয়ে দিলাম।

পরদিন লোকটীর নির্দেশমত সকাল নটা নাগাদ হাসপাতালের পাশে ছোট্ট একটি গুমটী ঘরে গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভাবলাম হয়ত বাজারে গিয়েছে। কিন্তু এই সময় আমায় আসতে বলেছিল বলে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থেকে আবার কড়া নাড়লাম। খানিকক্ষণ পরে খটাং করে দরজা খুলে গেল। একটা পাল্লা অল্প ফাঁক করে কালকের দেখা সেই মুখটা বেরিয়ে এল।

লোকটীর চোখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল। আমি বললাম, একটু তাড়াতাড়ি এসেছি বুঝি? নটা কিন্তু বেজে গেছে।

লোকটী মাথা নেড়ে বলল, না, না, তা নয় হুজুর, আমি ভেবেছিলাম আপনি রাত্রি নটায় আসবেন। যাক যখন এসে গেছেন—আর যখন হয় এলেই হল।

দরজাটি খুলে দিয়ে লোকটী সরে দাঁড়াল।

আমার পেছন থেকে সহসা কে যেন বলে উঠল, এই যে অনন্তচরণ।

আমি পেছন ফিরে দেখলাম খাকি পোশাক পরা একজন সম্ভ্রান্ত কর্মচারী।

জমাদার সসম্ভ্রমে বলল, নমস্কার হুজুর।

আমি বললাম, হাসপাতালের সিভিল সার্জন বুঝি।

মাথা নেড়ে অনন্তচরণ বলে, না, না, উনিই ত বড় দারোগাবাবু। আমাকে ভারী ভালবাসেন। বউ পালাবার পর অনেক খোঁজ খবর করেছেন। ভারী ভালো লোক।

দরজাটী ভালো করে বন্ধ করে দেয় অনন্তচরণ। দরজা বন্ধ করতে মনে হল ভাদ্রের সেই ভ্যাপসা সকাল যেন সহসা শীতল হয়ে গেল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার আর ঠান্ডা।

অনন্তচরণ বলে, ভেতরে আসুন হুজুর। আপনার কি আর ভালো লাগবে?

আমি অন্ধকার গলিপথ ধরে অনন্তচরণের অনুসরণ করে চললাম। টবেতে দু'চারটে পাতা-বাহারে গাছ বসানো আছে, আলো আর হাওয়ার অভাবে বোধহয় তারা বেশী বাড়তে পারে নি। ভেতর থেকে বাইরের কোলাহল কিছুই কানে আসে না। আর একটু এগিয়ে যাওয়ার পর অনন্তচরণ আর একটা দরজা খুলল। দরজা খোলার আওয়াজটা ভেতর থেকে ফাঁকা আওয়াজের সুরে প্রতিধ্বনিত হল। মনে হল লোকজন কেউই এখানে থাকে না।

বললাম, তুমি এখানে একা থাকো নাকি? মনে মনে ভাবলাম কি বিশ্রী জায়গা!

অনন্তচরণ বলে, বউ চলে যাওয়ার পর একরকম একাই হুজুর। আর

কোথায় যাবো? এখানে তবু আলো আছে, পাখা আছে। সরকারী খরচে এতো আরাম তো আর কোথাও মিলবে না।

এই বলে এতো জোরে দরজাটী বন্ধ করল, মনে হল যেন, সেই প্রাচীন ঘরটী কেঁপে উঠল। ব'লে চলে, তবে অনেক হ্যাংগামা হুজুর, ঝাড়ুদারেরা পর্যন্ত ভেতরে আসতে চায় না, সবই আমায় করতে হয়। ওরা বলে, ভেতরে আসতে ভয় হয়। তারপর ধরুন লাসগুলো রয়েছে—সে আর এক বিপদ। তিন রকমের লাস। পুলিশের চালানী মুদ্দো, হাসপাতালের বেওয়ারিস মড়া আর ছুরী চালানোর জন্য লাস। সবই মনে করুন আপনাদের কৃপায় আমারই ঘাড়ে। এই কথা বলে অনন্তচরণ গম্ভীর ভাবে গোঁফে হাত বুলিয়ে নেয়। বলে, ছাত্র বেশী হলে তখন তো আর দু একটা লাসে মানায় না হুজুর। তখন এই শর্মার ওপর হুকুম হয় লাস জোগাড় করবার।

ওর ওপরেই একটা বড় ঘর। কাচের শো-কেশে, বড় বড় জারে নানাবিধ অদ্ভুত আকৃতির মাথা বা দেহের অন্যান্য অংশ ডোবানো আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। সেদিকে হাত দেখিয়ে অনন্তচরণ বলে, কেউ কেউ এসব দেখতে ভালোবাসে, আবার অনেকে ভয় পায়। আমার কাছে ওসব ইট কাঠের সমান। হুজুর যদি দেখতে চান তো ভালো করেই দেখুন।

দেখছিলাম একটা অত্যন্ত বিশ্রী রকমের শিশুর জড়ীভূত দেহ আরকে ভাসছে। এমন সময় অনন্তচরণ বলে, লাস কি পাওয়া সোজা কথা—মনে করুন হাসপাতালে কেউ মরছে না, পুলিশের মুদ্দো নেই অথচ ছেলেদের জন্য লাস চাই। কোথায় পাই বলুন দেখি? সেই জন্যই ত আমার এত খাতির হুজুর। আমার মত মুদ্দো জোগাড় করতে কেউ পারবে না।

আমি সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকালাম, বললাম, তাই নাকি? কোথায় পাও?

অনেকেই আমাকে জানে আর ভালোবাসে কিনা। পথে ঘাটে যদি পড়ে থাকে তো খবর ঠিক এসে যায় হুজুর। তখন রাত্তিরে ঠেলা গাড়ী করে নিয়ে আসতে হয় আর কি। এসব জানাজানি হয়ে গেলে লোকে ভয় পায় কি-না।

তা তো বটেই।

যতসব চাষাভুষোর কাণ্ড তো। কেউ বোঝে না লাস যদি কাটা না হয় তবে কোথা থেকে ডাক্তারী শিখবে। আর মরা না কেটে কি জ্যান্ত রুগী লোকে কাটবে। এইখানেই তাদের শেষ করে দেবে।

আমার অত্যন্ত বিশ্রী লাগছিল। শুধু বললাম, হ্যাঁ।

লোকটি দোর গোড়ায় পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘরের ভেতরেই তার দৃষ্টি।

একটু চিন্তাকুল থেকে বলল, জানেন বউ এই ঘরটায় থাকতে ভালোবাসত। এই ঘরটী ছিল ওর ভারী পছন্দ। এইগুলো দেখেই ওর অর্ধেক সময় কাটিয়ে

দিত। ছেলেরা যখন ছুটীতে থাকে তখনই ওর আরো ভালো লাগত। চারিদিকে বেশ ঠান্ডা ও চুপচাপ হয়ে যেতো।

আমি বললাম, এতই যদি ওর এসব ভালো লাগত তবে ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে গেল কেন?

উত্তর না দিয়ে অনন্তচরণ আর একটী ঘরে গিয়ে ঢুকল। আমি এগিয়ে যেতে মৃদু গলায় বললে, ছোটটার জন্যে মন কেমন করত কি-না।

সেটী আবার কে?

আমাদের ছোট খুকী। দশবছরেরটী হয়েছিল। এই সেদিন মারা গেল। মাঝে মাঝে মনে হয় ওর হাসি যেন শুনতে পাচ্ছি।

আমি বললাম, হয়ত তোমার মেয়েটী মারা যেতে তার মনে কষ্ট হয়েছিল তাই আর এখানে একলা থাকতে পারল না। সত্যি কথা বলতে কি আমি তো নিজে এখানে হাজার টাকা দিলেও থাকতে পারি না। এখানে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

গোঁফটায় হাত বুলোতে বুলোতে অনন্তচরণ বলে, কে জানে, হবেও বা। তবে ছেলেরা যখন এখানে থাকে তখন এর অন্যরকম চেহারা। ডাক্তারেরা থাকেন, হট্টগোল, কত লোকজন আসে যায়। সে ভারী মজার। তখন এলে আর আপনার এরকম মনে হত না।

বারান্দায় বেরিয়ে কোমর থেকে আর এক গোছা চাবি বের করে আর একটী দরজা খোলে অনন্তচরণ। চারিদিকে চেয়ার টেবল ছড়িয়ে আছে। ঘরটী দারুণ অন্ধকার। দেয়ালে দুটো কঙ্কাল ঝুলছে। ঘরটীতে বেজায় দুর্গন্ধ। লাসকাটা টেবলের ওপর একটা কাটা পা পড়ে আছে। সহসা আমার পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন চলে গেল।

আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। বললাম, কি কান্ড, ওটা কি গেল?

কি বললেন হুজুর? ওঃ কি আশ্চয্যি, আজ ক'দিন ধরে ওটাকে দেখতে পারছিলাম না। ভাবলাম গেল কোথায়। ব্যাটা এখানেই আটকে পড়েছিল।

বিড়ালটা অদ্ভুত ধরনের। অত্যন্ত কৃশ। পেটটা একেবারে ঢুকে গেছে। সাদা রঙ, তাতে কালো ডোরা কাটা। এমনভাবে বেরোল মনে হলো অন্ধকারে থাকতেই যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বেশ লম্বা, সোজা চেহারা। মনে হল পা টিপে টিপে গুঁড়ি মেরে চলতে ও অভ্যস্ত। এ বাড়ীতে ঢোকার সময় আমিও এইভাবে এসেছিলাম। বেড়ালটার কান দুটো খাড়া। দেখলে মনে হবে যেন ভয় পেয়েছে বা ও কিছু শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। বেড়ালের যদি বুদ্ধিভ্রংশ হওয়া সম্ভব হয়, তা হলে বলব যে বেড়ালটার তাই হয়েছে। ওর বৈচিত্রহীন চোখে যেন পাগলামীর ছাপ রয়েছে।

একটা কল্পিত বল নিয়ে যেন ও খেলছে। থাবাটা শূন্যে ছুঁড়ছে। ডান-দিকের থাবা দিয়ে বাঁদিকের টিকে ঘা দিচ্ছে। শূন্যে কাঠবেড়ালীর মত লাফাবার

চেষ্টা করছে। মনে হবে যেন শূন্যে চুপ করে ঝুলে আছে। তারপর সহসা সেই ঘরটীতে পাক দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দেখে মনে হবে যেন খুব উত্তেজিত হয়েছে।

অনন্তচরণ বলল, আমাকে দেখে ও খুব উত্তেজিত হওয়ার ভাব দেখাচ্ছে। অথচ খুবই খুসী হয়েছে, তাই ওরকম করছে।

আমার কিন্তু মনে হল বেড়ালটী আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। কি জানি কেন বেড়ালটীকে দেখে আমার সেই নিঃসঙ্গ শিশুটীর কথা মনে পড়ে গেল। এই মৃতদেহ আর বীভৎস দ্রব্যগুলির মধ্যেই তো তার দিন কাটত।

সহসা ফতুয়ার পকেট থেকে খুব মলিন ভাঁজকরা এক কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়ে অনন্তচরণ বলে এই দেখুন তার চিঠি।

আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা সেই চিঠি দেখলাম :

আমার এখানে থাকতে ভয় করে। খুকী এভাবে মারা যাওয়ার পর আর থাকতে পারিনা...আমি দুঃখীরামের সংগে চলে যাচ্ছি। ও নেশাখোর। হয়ত আমাকে ধরে মারবে...কিন্তু তবু আমি এখানে থাকব না। এখানে ভূত আছে।

আমি মুখ তুলে দেখি অনন্তচরণ লক্ষ্য করছে আমার দেহ। সহসা এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে একটু অপ্রস্তুতের ভংগীতে সে গোঁফে হাত বুলোতে লাগল।

নীরবতা ভাঙার জন্যই বললাম, তোমার মেয়েটি কিসে মারা যায়?

একজন ছাত্র দেখতে পায় বারান্দায় ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। ঘাড় একদম ভেংগে গিছল। আর পাশে মাটীতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিছল একটা ছোট্ট ফুলগাছের টব।

একটু থেমে অনন্তচরণ বলে, এই যে নূতন ওষুধ বেরিয়েছে, তাতে দুচার মাস মাল ঠিক থাকে। সে আরও বলে, ডাক্তারবাবু শিখিয়ে দিয়েছেন, লাশ পেলেই ওষুধটা দিয়ে দিই, সব ঠিক থাকে।

আমার মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল। বললাম, ঘাড়টা তা হলে কি করে ভাঙল?

কি জানি হুজুর, ডাক্তারেরা বলে, হয়ত যখন ঘুমুচ্ছিল তখন টবটী পড়েছিল। ঘাড়ে সামান্য আঁচড় ছাড়া তো আর কিছু দেখা গেল না।

আমি অনন্তচরণকে চিঠিটা ফেরৎ দিলাম।

পুনরায় টেবিলের দিকে তাকিয়ে বলে, এই যে নূতন দাওয়াই—হুজুর—এ এক অদ্ভুত জিনিষ।

ওষুধের কথা আমার জানা ছিল না। তবু কেন জানি না, এই কথায় আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি বললাম, তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায়?

শ্বশুরবাড়ী শুনেছি বাংলা দেশে। তা ওদের আর বড় কেউ নেই। বারো বছর আগে কুড়ি গণ্ডা পণ দিয়ে ওকে এনেছিলাম।

আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অনন্তচরণ দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপরে গা ঘসতে ঘসতে বেড়ালটাও বেরিয়ে এল।

অনন্তচরণ বলে, হুজুর এইবার লাসঘরটাই দেখতে বাকী। আর তো কিছু নেই এখানে। আপনার ভয় করবেনা তো? আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে ও।

বললাম, খুব খারাপ নাকি?

যার যেমন লাগে হুজুর। অনেক নূতন ছাত্র ওর ভেতর গিয়ে ভয় পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে হুজুর। আমার অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেছে। আপনি তো বলেছেন আপনার তেমন ভয়ডর নেই।

আমার মুখের দিকে আবার করুণার দৃষ্টিতে তাকায়। দম্ভ করেই বললাম, আমার অতশত নেই, যখন এসেছি সব কিছুই দেখব। অনন্তচরণ একগাল হেসে বলে, এই তো কথার মত কথা হুজুর। ঐ যে কথায় বলে মরদ কা বাত আর হাতি কা দাঁত। এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে হুজুর।

সিঁড়িগুলো বড়ো সোজা আর একধারে ধরবার রেলিং দেওয়া আছে। অনন্তচরণ আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের সামনে দিয়ে বেড়ালটা তর তর করে নেমে গেল যেন কুয়াশার ভেতর ঢিল ছোঁড়া হল।

ভিতরটা ভীষণ অন্ধকার—ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসছে। আমি বললাম, এখানে আলো কই?

অনন্তচরণ জিভ কেটে বলে, ঐ দেখুন, এমন ভুলো মন। খেয়ালই ছিলনা হুজুর। এই বলে সুইচ টিপে দেয়। অনন্তচরণ বলে, দুঃখীরামকে দেখার পর বউ কিছুতেই আর নীচেতে নামতে চাইত না হুজুর। কোনদিনই অবশ্য এই ঘর ওর ভালো লাগতনা। কিন্তু ইদানিং ও একদমই আসতনা। আমার মেয়েটা এই নিয়ে ওকে ঠাট্টা করত। ভারী আমুদে মেয়ে ছিল হুজুর।

লোহার সেই ঘোরানো সিঁড়িটা লোহাচুর আর ধুলো জমে লাল হয়ে গেছে। আমার পেছন থেকে অনন্তচরণ সাবধান করে দেয়: হুঁসিয়ার হুজুর, একটু অসাবধান হলেই পা পিছলে পড়ে যাবেন। 'পড়ে যাবেন' কথাটার ওপর একটা অস্বাভাবিক জোর দেয়। আমি আবার সচকিত হয়ে উঠলাম।

নীচে ধূসর প্রেতের মত সেই বিড়ালটা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এতক্ষণে ওর স্ফূর্তি হয়েছে বলে মনে হয়। কোন হেতু না থাকলেও কেন জানিনা সহসা পূর্বজন্মের কথা আমার মনে হয়।

অনন্তচরণ বলে, এই কি কম হ্যাঙ্গাম হুজুর! এই আমার এক মহা ভাবনা। কোথা থেকে যে মুন্দো জোগাড় করি। একসময়ে ভারী টান পড়ে যায়। অথচ স্কুলের কাজ তো চলা চাই। ডাক্তারবাবু বলেন, এ হোল সমাজের মঙ্গলের কাজ—একাজ তো থামিয়ে রাখা চলে না। অথচ কোথা থেকে আসে বলুন।

যেন এই গুরুতর সমস্যায় অভিভূত হয়ে পড়ে সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্তচরণ।

আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখি এই ঘরটী অস্বাভাবিক রকমের বড়ো, প্রাচীনকালের জমিদার বাড়ীর মালখানার মত একটু মাটীর নীচে। আর ছাদ এত উঁচুতে যে সেইখানে ঝোলানো অল্প-শক্তির বৈদ্যুতিক আলো নীচ থেকে তারার মত ক্ষীণ দেখায়। ঘরটার ভিতর স্পষ্টভাবে কিছু দেখা যায় না।

দেওয়ালগুলির গায়ে সাদা বালি লাগানো, মেঝেটা লাল আর ভিতরটী বেশ ঠাণ্ডা। অনন্তচরণ পুনরায় তার পলাতক বউটীর কথা উত্থাপন করে। বলে, লাল সবুজ ঐ যে সিল্কের ফিতে উঠেছে আজকাল, বউএর ভারী পছন্দ ছিল, দাম কম ছিল বলে আমিও কোনদিন কিছু বলিনি। তবে আমরা গরীব-গুরোব মানুষ, ওসব আমাদের মানায় না। মাথায় ঐ রকম লাল ফিতে বা জরি দেওয়া ফিতে দিলে অবশ্য বউকে চমৎকার দেখাত। থাকগে ওসব কথা, আসুন, এইবার লাস দেখুন।

একধারে একটা লোহার চৌবাচ্চা, তারই ভেতর এ্যাসিডে মৃতদেহগুলো রয়েছে।

অনন্তচরণ বলে, দু চারদিন এইখানেই রেখে দিই ওদের। তারপর যেমন যেমন দরকার পড়ে ওপরে পাঠিয়ে দিই। ওর গলার আওয়াজ সহসা কেমন গাঢ় হয়ে আসে। অন্ধকারে আবছা আলোয় কিছু চট করে নজরে আসে না। অনন্তচরণের গলার আওয়াজে মনে হয় ও সহসা যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বলে, এর ভেতরেই চারটে লাস রয়েছে হুজুর। একটা বাচ্চা আর তিনটে ধাড়ী। বেশ বোঝা যায় ওর গলার আওয়াজ ক্রমেই চড়ছে। একটা বাঁশের খুঁটি নিয়ে সেই ময়লা ঘোলা জল ও নাড়তে থাকে, মনে হয় যেন কোন পিশাচ পরমানন্দে খেলা করছে। এ্যাসিড-জলের ভেতর থেকে যুবক, বৃদ্ধ, তরুণী ও শিশুর দেহ পর্যায়ক্রমে ভেসে ওঠে।

বেশ পা টিপে আমার কাছে এসে সহসা অনন্তচরণ বলে, হুজুর, এরমধ্যে সবচেয়ে কাকে বেশী ভালবাসি জানেন? এই বলে আমার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে সে পুনরায় সেইভাবে বাঁশের খোঁটাটা নাড়তে থাকে। বলে, কইরে, নটবর, একবার মুখখানা দেখাও বাপধন। এত লুকোচুরী কিসের বাবা। বেরিয়ে পড়, বেরিয়ে পড়। আ! এই যে? বাঁশের সেই খোঁটাটা সহসা ফেলে দিয়ে সেই মড়াটার চুলগুলি বাগিয়ে নিয়ে আমার দিকে তুলে ধরে দেখায়। কোনরূপ দ্বিধা নেই। অবলীলাক্রমে তার মাথাটা নিজের হাতের ওপর শুইয়ে দিয়ে মুখটা যাতে আমি ভালো করে দেখতে পারি তার ব্যবস্থা করে দেয়।

এরকম বীভৎস পৈশাচিক দৃশ্য আমি জীবনে কখনো দেখিনি। অনন্ত-চরণের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে যেন সহসা পুলকিত হয়ে ওঠে। আমার দিকে তাকিয়ে মাতালের মত ভংগী করে বলে, বেশ দেখতে না! চট

করে এখন ওকে ওপরে পাঠাচ্ছি না, সত্যি ছোকরাকে দেখতে ভালো ছিল। মেয়ে ছেলেরা ওকে পছন্দ করত। বোতল টোতলও চলত। দেখি কতদিন আটকানো যায়। এই বলে সে দেহটাকে ছেড়ে দেয়। এ্যাসিড-জলে একটা আন্দোলন জাগে।

হুজুর বোধ হয় ভাবছেন সব চুলই লাল কেন। এ্যাসিডে ওরকম হয়ে গেছে। আমি শুধু প্রশ্ন করলাম, ওদের কিভাবে ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়।

কপি-কলে দড়ি টেনে।

একটা দেবদারু কাঠের প্রকাণ্ড বাক্স দড়িতে ঝোলান রয়েছে দেখলাম। দড়ি ধরে একটু টেনে দেখায় অনন্তচরণ। কপিকলের আওয়াজটা একটা করুণ আর্তনাদের মত শোনায়।

ক্রমে আমার গায়ের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। ভয়ে বুক দুরু দুরু করতে থাকে। আরো একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি সেই কাঠের বাক্সের ভিতর মলিন চাদর চাপা কি যেন রয়েছে। আমি অনন্তচরণকে বললাম, ওর ভিতরে ওটা কি রয়েছে বলো ত? দেখা গেল একটী অল্প বয়সী স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ নগ্ন দেহ শোয়ানো রয়েছে। মাথার তলায় একখানি ইঁট দেওয়া, তাতেই মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। খোঁপার ভিতর থেকে একটা জরির ফিতে চকচক করছে। ঠিক এই সময়েই সহসা আলো নিভে গেল। আমার পকেটে টর্চ ছিল। দেখি সে হিংস্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার হাতের টর্চটা দেখে সে যেন একটু হতভম্ব হয়ে গেছে। তাই একটু অপ্রস্তুতের ভংগীতেই বলে, দেখছেন আলোটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। কী কেলেংকারী!

অনন্তচরণের গলার স্বর আবার নরম হয়ে এসেছে। আমি লজ্জা ত্যাগ করে বলে উঠি, সত্যি কথা বলতে কি আমার গা ছমছম করছে। এ সব দেখা আমার অভ্যেস নেই।

পকেট হাতড়ে দুটো টাকা তার হাতে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে এলাম। অনন্তচরণও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও আমার পেছু নিয়েছে। অন্ধকারে সেই ক্ষেপা বেড়ালটার চোখ দুটো জ্বলছে।

সেই মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে অনন্তচরণের বাড়িছাড়া বউয়ের জরির ফিতে দিয়ে বাঁধা খোঁপা আর অসহায় চোখ দুটী ভেসে উঠল। আমি কোনরকমে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম।

অনন্তচরণ কি আমাকে তাড়া করেছে!

বৈয়াকরণ

সতীনাথ ভাদ্বড়ী

......টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে। ক্লাসে যাবার জন্য এবার প্রস্তুত হতে হয়। একটু যেন তেষ্টা পেয়েছে বলে বোধ হচ্ছে। এখনই আবার ক্লাসে গিয়ে চেঁচাতে হবে—গলাটা ভিজিয়ে নেওয়া ভাল। টেবিলের উপর মৌলবী-সাহেবের পা দুটো নড়ছে। পাশেই পানের কৌটো। কৌটোটার ভিতর থেকে খানিকটা ভিজা খয়েরী নেকড়া বেরিয়ে এসেছে—দেখলেই গা ঘিনঘিন করে—দিনরাত দাঁত খোঁটেন মৌলবীসাহেব আঙুল দিয়ে—হাত ধোয়া নেই, কিছু না, সেই হাতেই পান বার করে খাবেন। অথচ কিছু বলবার উপায় নেই। এই সব অনাচারের মধ্যে রাখা জল খেতে মন সরে না। তাঁর দিককার দেওয়ালের পেরেকে টাঙানো জল-তুলবার দড়িটা পেড়ে নিলেন পণ্ডিতজী। আর এক হাতে লোটা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তিনি—পূজো আহ্নিক করেন—শুদ্ধাচারে থাকেন—কুষ্মাণ্ড দেখলে বমি ঠেলে আসে। ছেলেদের স্কুলে যখন চাকরি করতেন, তখন তেওয়ারী চাপরাসীটা জল তুলে এনে দিত। এখানে সে রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। মিথিলার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তিনি; জেলা স্কুলের চাকরি থেকে পেন্সন নেবার পর মেয়েস্কুলে চাকরি নিয়েছেন। কিন্তু ক'টা টাকার জন্য নিজের আচার-বিচার বিসর্জন দিতে আসেননি এখানে। স্কুলের দাইদের হাতের জল কি তিনি খেতে পারেন? লোটা মেজে নিজ হাতে ইঁদারা থেকে জল তুলে, আলগোছে ঢকঢক করে খেয়ে যা তৃপ্তি, তা কি কখনও অপরের এনে দেওয়া জলে পাওয়া যায়?...

আজ মাস দুয়েক থেকে পণ্ডিতজীর মনটা ভাল যাচ্ছে না। একটি মুমূর্ষু মহিলার মুখ থেকে নির্গত একটি বাক্য, তাঁর কর্ণগোচর হবার পর থেকে অষ্টপ্রহর তাঁকে পীড়া দিচ্ছে। বাক্য নয়, বাক্যের একটি শব্দ। না না, এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু নেই; এ হচ্ছে নিছক একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। মনের এই অস্থিরতার জন্য পণ্ডিতজী আজকাল নিজে উপযাচক হয়ে মৌলবীসাহেবের সঙ্গে বেশী করে গল্প করা আরম্ভ করেছেন।

......আর যদি তিনি স্কুলের দাইদের হাতের জল খেতেনও, তা হলেও কি এখান থেকে চেঁচিয়ে দাইকে ডেকে এক গ্লাস জল আনতে বলতে পারতেন?...

"মৌলবীসাহেব, কোন একটা কাজে এখান থেকে দাই, দাই, বলে চীৎকার করতে লজ্জা করে না?"

"লজ্জা মনে করলেই লজ্জা। দাই বলতে দ্বিধা হয় তো হরখুরেমা বলে ডাকলেই পারেন।"

......মৌলবীসাহেব ঠিক বুঝতে পারেননি কেন এই দ্বিধা, কিসের এই লজ্জা। সে দ্বিধাটুকু ওঁর মনে জাগে না যে কেন, তাই আশ্চর্য!......দ্বে বিধে—দ্বিধা—তদ্ধিতান্ত শব্দ।......

"মেয়ে স্কুলের পুরুষ শিক্ষক। আমাদের অবস্থাটা এখানে একটু কেমন কেমন না?"

আফিংখোর মৌলবীসাহেব এতক্ষণে চোখ খুললেন পণ্ডিতজীর কথার সমর্থনে একটু রসিকতা করবার জন্য।

"আপনাদের সানস্‌কির্তে আছে না—হাংস মাধ্যে বগুলা যথা—তেমনি আর কি আমরা এখানে।"

না। ঠিক এই ভাবটার কথা পণ্ডিতজী বলতে চাননি। তবু মৌলবী-সাহেবের কথার প্রতিবাদ সোজাসুজি করতে পারলেন না। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য ভুলে একটু খোঁচা দিয়ে কথা বললেন।

"আপনাকে আর বক বলি কি করে। বকের পালকের মত আপনার সাদা চুল আর দাড়ি, আবার ভ্রমরের মত কালো হয়ে উঠেছে। আপনি বক কেন হতে যাবেন—আপনি হলেন ভ্রমর।"

সম্প্রতি মৌলবীসাহেব আবার আর একটা নতুন বিবি ঘরে আনবেন ঠিক করেছেন। কালো কুচকুচে দাড়িগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন—"হাতী চলে বাজারে, কুকুর ডাকে হাজারে।"

"কিন্তু বুঝলেন কিনা মৌলবীসাহেব—সেই হাতী যখন পাঁকে পড়ে......"

মৌলবীসাহেব কথাটাকে শেষ করতে দিলেন না।

"আপনি চুল সাদা রেখেছেন বলে বলছেন। না? বগুলা-ভকত (বক ধার্মিক) দেখতে সাদাই হয়।" নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে আকুল মৌলবীসাহেব। সে হাসিতে যোগ দেবার চেষ্টা করেও পারলেন না পণ্ডিতজী। বকধার্মিক শব্দটা তীরের মত তাঁর মনের গভীরে গিয়ে বিঁধেছে। আজ দুই মাস থেকে যে কথাটি তাঁকে পীড়া দিচ্ছে, তারই সঙ্গে যেন বকধার্মিক কথাটার সম্বন্ধ আছে। আচমকা একটা স্পর্শকাতর জায়গায় ঘষটানি লেগেছে। মৌলবীসাহেব নিজের খেয়ালখুশীতেই অষ্টপ্রহর মশগুল; পণ্ডিতজীর মুখ-চোখের চকিতের বৈলক্ষণ্য তাঁর নজরে পড়ল না। তাঁর টেবিলেতোলা নড়ন্ত পা দুটোকে দেখে হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল পণ্ডিতজীর মন। চাকরির জীবনে অনেক কিছুই গা-সওয়া করে নিতে হয়। এখানে আসা থেকে অনেক কিছুই সইয়ে নিতে হয়েছে তাঁকে। মেয়েস্কুলে, তাঁদের গতিবিধি অবাধ নয়; সর্বত্র বাঞ্ছিতও নয়। স্কুলঘর থেকে একটু দূরে তাঁদের এই ঘরখানি। আগে ছিল স্কুলের ঝাড়ুদারনীর ঘর। এখন সেই ছোট্‌টো ঘরখানার মধ্যে পাতা হয়েছে

একখানা টেবিল, দুপাশে দুখানা চেয়ার। টেবিলখানাকে দিয়ে অলিখিত আইনে তাঁরা ঘরখানাকে হিন্দুস্থান পাকিস্থানে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন; একদিকে থাকে ঘটি, আর একদিকে থাকে বদনা। নিজের ঘটিটাকে নিয়ে তিনি বার হলেন ঘর থেকে। বহুকাল তিনি আর মৌলবীসাহেব এক সঙ্গে কাজ করেছেন জেলাস্কুলে। কিন্তু তাঁর পা-দোলান এত খারাপ এর আগে আর কখনও লাগেনি। ক্লাসে গিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলানো তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হেডমাস্টার মশায়রা বলে বলে হার মেনে গিয়েছিলেন; মৌলবীসাহেব তাঁদের ধমক পর্যন্ত গায়ে মাখতেন না। এমন একটা খোশমেজাজী লোক হঠাৎ তাঁকে বকধার্মিক বললেন কেন? নিজের জানতে তিনি তো মিথ্যাচার কখনও করেন না। টোলে পড়বার সময় কিশোর বয়সে একবার কৃচ্ছ্রসাধনার বাতিক জেগেছিল। তাঁর জীবন-যাত্রায় আজও তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক বলে পাড়ায় তাঁর খ্যাতি। তিনি নেপালের মহাকালী দর্শন করে এসেছেন, কলকাত্তাবালী কালীর চরণে জবাপুষ্প দেবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে, কামরূপ কামাখ্যায়ও তিনি সস্ত্রীক তীর্থ করে এসেছেন। তাঁর নিষ্ঠা ও সদাচারের মধ্যে কোথাও তো একটুও ফাঁকি নেই! তিনি যা নন তা' দেখাতে তো কোনদিন চেষ্টা করেননি! তবে কেন মৌলবীসাহেব তাঁকে বকধার্মিক ভাবলেন? টোলে পড়বার সময় সেখানকার পণ্ডিত মশাই তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি বলেছিলেন "তুরন্ত, তুমি ব্যাকরণ পড়। কাব্য পড়ে কি হবে? বড় মনকে চঞ্চল করে ও জিনিস। বিনাশ্রয়ং ন তিষ্ঠন্তি কবিতা বনিতা লতা। ইন্দ্রিয়াসক্তির অবলম্বনেই কাব্যের রস জীবিত থাকে।" সেই জন্য গুরুর আদেশে, লঘু চাপল্যের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পণ্ডিতজী মেরুদণ্ডহীন কাব্যের বদলে ব্যাকরণ পড়েছিলেন। ব্যাকরণের বিধানগুলোর মতনই আষ্টেপৃষ্ঠে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধা তাঁর জীবন, তাঁর আচরণ, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ। তার মধ্যে বিচ্যুতি নেই। তবে কেন মৌলবী-সাহেব অমন কথাটা বললেন? না না, ওটা একটা নির্দোষ রসিকতা—কিছু না ভেবে বলা—ঠাট্টা করে কথার পৃষ্ঠে বলা কথা মাত্র। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ও বিশেষণটা কখনই তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। আর সেই মুমূর্ষুর উক্তির যে শব্দটি দুমাস থেকে তাঁর মনে কির কির করে বিঁধছে, সেটা একটা সর্বনাম: তার উপর বহুবচন। দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই, কোন সম্পর্ক নেই। শব্দটা হচ্ছে "ওরা"। বাক্যটি হচ্ছে "ওরা কি ওই চায়!" এই 'ওরা' শব্দটিকে নিয়েই যত গোলমাল। সঃ তৌ তে—ওরার অর্থ তে।......

হঠাৎ নজরে পড়ল হেডমিস্ট্রেস নিজের কোয়ার্টার থেকে তাড়াতাড়ি আসছেন। চোখ নামিয়ে নিলেন; চোখোচোখি হয়ে গেলে অপ্রস্তুত হতে হ'ত। হেডমিস্ট্রেস যখন আসছেন, তখন টিফিন শেষ হবার ঘণ্টা এখনই পড়বে নিশ্চয়। নিজেদের বসবার ঘরে পোঁছে তবে মাটি থেকে চোখ তুললেন উপরে

পণ্ডিতজী। অকূল সমুদ্রের মধ্যে নির্বিঘ্ন দ্বীপ এই ঘরখানি। টেবিলের পর পাজোড়া নড়ছে। মৌলবীসাহেবের প্রায় সারাদিনই ছুটি, কেন না সব ক্লাসে উর্দু পড়বার মেয়ে নেই। সংস্কৃতের ছাত্রী এ স্কুলে কম নয়। পণ্ডিতজী নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, অভিভাবকদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্রী জুটিয়েছেন; নইলে মেয়েরা আবার আজকাল অন্য সব ফাঁকির বিষয় নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে চায়। সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে কি করে, নৈতিক অনুশাসন আসবে কোথা থেকে,—একথা কেউ বুঝবে না! মৌলবীসাহেবের কিন্তু ছাত্রী জুটলো কি না, সেসব বিষয়ে কোন দুশ্চিন্তা নেই।

তাঁর সঙ্গে কোন কথা না বলে ক্লাসে যাওয়া দেখায় খারাপ; ভেবে নিতে পারেন যে 'বকধার্মিক' বলবার জন্য চটেছেন তিনি। তাই পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করলেন—"ও মৌলবীসাহেব, ক্লাস নেই নাকি?"

মৌলবীসাহেব চোখবুঁজেই উত্তর দিলেন—"আমার আবার টিফিনের পরের পিরিয়ডে কোনদিন ক্লাস থাকে নাকি?"

"বেশ আছেন মৌলবীসাহেব।"

"যে যেমন নসিব নিয়ে এসেছে।"

"আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ ঝিমুতে ঝিমুতে পা-দোলান; আমি ক্লাস ঠেঙিয়ে আসি।"

নিজের অতর্কিতে তিনি আজ মৌলবীসাহেবের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছেন বারবার। কিন্তু যাঁকে বলা তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল হাসির রেখা।

"আরে ভাই, যে ক'টা টাকা মাইনে দেয়, তার বদলে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে পা-দোলানর মেহনতই যথেষ্ট।"

পাটকরা চাদরখান পণ্ডিতজী কাঁধের উপর সাজিয়ে নিলেন। পাকা গোঁফ-জোড়ার উপর হাতের উলটো পিঠটা বুলিয়ে নিলেন একবার। ঠিক আছে সব। হঠাৎ খটকা লাগল মনে—ছেলেদের স্কুলে চাকরি করবার সময়ও কি ক্লাসে পড়াতে যাবার আগে, চাদর ও গোঁফের বিন্যাস সম্বন্ধে এত সজাগ থাকতেন? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটা বিষয় না স্বীকার করে উপায় নেই; চিরকাল তিনি নিজের জামাকাপড় সাবান দিয়ে কেচে নিতেন; ইদানীং ধোপার বাড়িতে দেন। তবে এসবগুলো ঠিক প্রসাধনকর্ম নয়। দাঁত খুঁটে হাত ধোবার মত, খেয়ে কুলকুচা করবার মত নির্দোষ অভ্যাস।...

ঘণ্টা পড়ল। পণ্ডিতজী ক্লাসের দিকে পা বাড়ালেন। তাঁর অসাক্ষাতে সবাই তাঁকে তুরন্ত পণ্ডিত বলে ডাকে। কিন্তু তিনি নিজের নাম দস্তখত করবার সময় লেখেন—তুরন্তলাল মিশ্র, ব্যাকরণতীর্থ। বাড়ির চিঠিতে পর্যন্ত। ব্যাকরণ যেমন তাঁর অস্থিমজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, ব্যাকরণতীর্থ পদবীটাও তেমনি তাঁর নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রতি মাসে একবার করে আগে থেকে কোন সূচনা না দিয়ে, পুরনো পড়ার

পরীক্ষা নেন পণ্ডিতজী। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছেন যে আজ এই ক্লাসেত ছাত্রীদের পরীক্ষা নেবেন।

...এই ক্লাসের মেয়েরা সব চেয়ে বেশী বকুনি খায় হেডমিস্ট্রেসের কাছে; সবচেয়ে বেশী চেঁচামেচি করে বলে।...মহান-শব্দঃ মহাঞ্ছব্দঃ...। ছেলেদের দুষ্টু বলা চলে, কিন্তু মেয়েদের দুষ্টু বলতে বাধে। অবাধ্য কথাটাও ঠিক হয় না। হ্যাঁ, একটু চঞ্চল বেশী।...নৃত্যন-চকোরঃ—নৃত্যংশ্চকোরঃ...। কোন ক্লাসের শান্ত অশান্ত হওয়া নির্ভর করে সেই ক্লাসের লীডারদের সাহসের দৌড় কতদূর, তারই উপর। কিন্তু তিনি চিরকাল লক্ষ্য করে আসছেন যে, সব ক্লাসের ছাত্ররাই সংস্কৃত পণ্ডিতের পিছনে লাগতে ভালবাসে। দেবভাষার অনুস্বার বিসর্গ-সম্বলিত উচ্চারণগুলোই ছাত্রছাত্রীদের চোখে সংস্কৃত শিক্ষকদের ছোট করে দেয় কিনা কে জানে! ব্যাকরণের 'ষষ্ঠী চানাদরে' বিধানটি পড়াবার সময় হাসেনি, এমন ক্লাস তিনি দেখেননি। প্রথম যখন চাকরিতে ঢোকেন, তখন ভাবতেন যে ইংরাজী না জানা পণ্ডিত বলেই ছেলেরা তাঁকে উপেক্ষা করে। কতকটা এইজন্য, আর কতকটা ক্লাসে পড়ানর সুবিধার জন্য, প্রাণপণ চেষ্টা করে সামান্য ইংরাজী শিখেছিলেন। এর ফল কিন্তু হয়েছিল উল্টো; ছাত্ররা আরও বেশী করে তাঁর পিছনে লাগত। কিন্তু সেই সামান্য ইংরাজীর জ্ঞানটুকু তাঁর অতি গর্বের জিনিস। সুবিধা পেলেই ক্লাসে জানিয়ে দিতে ছাড়েন না যে তিনি ইংরাজী জানেন।...

এই ক্লাসের লীডার মালবিকা। প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি তার প্রতিটি কথা থেকে ঠিকরে পড়ে; কিন্তু প্রগল্‌ভতা যেন আর একটু কম হলেই ভাল হত! ক্লাসের সজীব গুঞ্জনধ্বনি কানে আসছে।...

একটি মেয়ে দূর থেকে তাঁকে দেখেই ক্লাসে খবর দিল—'তুরন্ত পণ্ডিত আসছে রে!' তিনি ক্লাসে ঢুকলেন হন হন করে—যেন এক মিনিটও সময় নষ্ট করতে চান না। ছাত্রীদের মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের মুখোশ। হাসি চাপবার চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। ছেলেদের স্কুল হলে তিনি বেশ কয়েকটি চপেটাঘাত দিয়ে ক্লাস আরম্ভ করতেন; কিন্তু মেয়ে-স্কুলে তাঁর সেই চিরাচরিত পদ্ধতি অচল। মেয়েদের গায়ে কি হাত তোলা যায়? মায়ের জাত! দেবীর মত পূজ্যা কুমারীরা। তাঁদের যুগে এই বয়সের মেয়েদের কবে বিয়ে হয়ে যেত।

ক্লাসের উপযুক্ত বাতাবরণ ফিরিয়ে আনবার জন্য তুরন্ত পণ্ডিত চেঁচিয়ে সুর করে বললেন—"বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্‌।" অর্থাৎ মতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে কি হয়? খুব সহজ প্রশ্ন দিয়ে আরম্ভ; এ শুধু গলা পরিষ্কার করে নিচ্ছেন; পরে আস্তে আস্তে শক্ত হবে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্রীরা বুঝে গেল, আজ গতিক সুবিধার নয়। অমন হনহন করে ঘরে ঢুকতে দেখে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

এতক্ষণে তিনি তাঁর দৃষ্টি কেন্দ্রিত করেছেন লিলির দিকে। ক্লাসের মধ্যে একমাত্র এই মেয়েটির দিকে তাকাতে তাঁর মনে কোনরূপ সঙ্কোচ আসে না। মেয়েটি কুরূপা।

"এসব নামতার মত কণ্ঠস্থ থাকা উচিত। ইউ! ইউ বয়! তুমি বলো!"

সারা ক্লাস হেসে ফেটে পড়ল।

...কেন? হঠাৎ এত হাসির কি হ'ল? মালবিকাই নিশ্চয় আরম্ভ করেছে। ওঃ! অভ্যাসবশে ভুলে 'ইউ বয়' বলে ফেলেছেন! এরকম ভুল তাঁর হয় মাঝে মাঝে। আজ দিনটাই খারাপ যাচ্ছে, সকাল থেকে। আর বুঝি ক্লাসকে শাসনে রাখা যাবে না আজ! নিজের উপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

মালবিকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই পণ্ডিতজী চোখ নামিয়ে নিলেন। মালবিকার মুখে কৌতুকের হাসি।

"একটা কথা বলি পণ্ডিতজী, কিছু মনে করবেন না। আপনার পইতাটা কানে জড়ান রয়েছে।"

...ছি, ছি, ছি! (পশ্যন-চকিতঃ—পশ্যংশ্চকিতঃ)...লজ্জায় পণ্ডিতজীর মুখ লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি পইতাটা জামার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নেবার জন্য আরও জোরে সুর করে চেঁচালেন—"বা-আ-আই ইন্‌টেলেকট্‌।"

উচ্চ হাসির রোল তাঁর গলার স্বরকেও ছাপিয়ে উঠেছে।

হাসতে হাসতেই মালবিকা জিজ্ঞাসা করে—"আজ বুঝি ব্যাকরণের পুরনো পড়া ধরবেন পণ্ডিতজী?"

অন্যদিকে তাকিয়েই পণ্ডিতজী বললেন—"আবার ব্যাকরণ শব্দটির ভুল উচ্চারণ করছ? প্রতিদিন কি একবার করে বলে দিতে হবে?"

উপরের ক্লাসগুলোর সব মেয়েই বাঙালী। অবাঙালীদের আগেই বিয়ে হয়ে যায় বলে, তারা আর অতদূর পৌঁছতে পারে না। বড় ভাল লাগে পণ্ডিতজীর, এইসব বাঙ্গালী মেয়েদের। ওরা হাসতে জানে; ওদের কথার ধ্বনি মৈথিলীর মত মিষ্টি; কিন্তু এক দোষ ওদের—সংস্কৃতভাষার উচ্চারণ মোটেই করতে পারে না। বকতে গেলে, হেসে ফেলবে; কি করে শেখাবে বলো এদের! কিন্তু ওদের মুখের ভুল উচ্চারণের ধ্বনিটা শুনতে খুব ভাল লাগে। ইচ্ছা করে, অনেকক্ষণ ধরে শোনেন।...(মহতী-ইচ্ছা—মহতীচ্ছা)...। কুক্কুটাণ্ড-লোভী বাঙ্গালী পুরুষরা কবে সাহেব হয়ে যেত; শুধু পারেনি এই মেয়েদের জন্য। নিষ্ঠায়, আচার বিচারে পুরুষদের বিচ্যুতিটুকু মেয়েরা পুষিয়ে দিয়েছে বলেই ওদের সমাজটা এখনও টিকে আছে। ওদের সম্বন্ধে কৌতূহল তাঁর কোনদিন মিটবার নয়।...

কোন্ কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় পণ্ডিতজীর উপর, সেসব ছাত্রীদের মুখস্থ।

"কেমন ভাবে ব্যাকরণ উচ্চারণ করব পণ্ডিতজী?"

মালবিকার পাতা ফাঁদে ঠিক পা দিলেন তিনি।

"বলো—বিয়াকরণ, বিয়াকরণ।"

"বিয়া-করণ, বিয়া-করণ"—বিয়া আর করণ শব্দ দুটিকে ভেঙ্গে আলাদা করে বলছে সে। ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসছে। সকলেই নিশ্চিন্ত যে পণ্ডিতজীর পরীক্ষা নেবার ঝাঁজ আজকের মত কমিয়ে দিয়েছে মালবিকা।

"আবার বলো! ত্রিশবার বলো!"

...এই চটুলা মেয়েটিকে শাসনে রাখা শক্ত। কিন্তু মেয়েটি সত্যিই খুব ভাল।...মাস দুয়েক আগের সেইদিনকার কথা তিনি ভোলেননি। তখন তাঁর মাথায় অত বড় বিপদ। ছোট শালা স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এখানে বেড়াতে। সৌখীন মানুষ; দিনে তিনবার চা না হলে চলে না। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ষ্টোভ। কে বোঝাতে যাবে এই সব ছেলেছোকরাদের যে, বাপদাদারা এতকাল যা করে এসেছে তাই করাই ভাল। হ'লও কি তাই! ষ্টোভ ধরাতে গিয়ে শালাজের শাড়ীতে আগুন লেগে যায়। ভীষণভাবে পুড়ে যান তিনি। জামা-কাপড়ে আগুন লেগেছিল কিনা, তাই গলা থেকে পা পর্যন্ত একেবারে বেগুন পোড়ার মত পুড়ে থসথসে হয়ে যায়। চোখে দেখা যায় না সে দৃশ্য! সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখখানি একটু পোড়েনি! গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলে, কে বলবে যে তিনি পুড়ে গিয়েছেন। প্রথম একদিন তো অজ্ঞান হয়েই ছিলেন। জ্ঞান ফিরে আসবার পর থেকে তাঁর বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা মোটেই ছিল না, যেতে পারলে যেন বাঁচেন।...সেই সময় বোঝা গিয়েছিল, মালবিকা মেয়েটি কত ভাল। এত প্রগল্‌ভতা সত্ত্বেও কত কোমল ওর হৃদয়। সে এসে বলেছিল—'পণ্ডিতজী, সীতাকুণ্ডের সন্ন্যাসীর দেওয়া একটা পোড়ার ওষুধ মা জানেন, লাগাবেন কি? আস্ত ডাব পুড়িয়ে তয়ের করতে হয়। খুব ভাল ওষুধ; পোড়ার দাগ একেবারে থাকে না।'

তাঁর ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাঁর শালার অ্যালোপ্যাথিক ছাড়া আর অন্য কোন ওষুধে বিশ্বাস নেই। মালবিকাকে সেকথা বললেন। তবু সে পরদিন ওষুধ নিয়ে হাজির তাঁর বাড়িতে। কোথা থেকে ডাব জোগাড় করেছে, কখনই বা মাকে দিয়ে ওষুধ তৈরী করিয়েছে, সে-ই জানে। কিন্তু সে ওষুধ ব্যবহার করা হয়নি—আজও কৌটায় অমনি পড়ে আছে। ব্যবহার করলে কি হ'ত কে জানে! তাঁর বাড়িতে বেড়াতে এসে এত বড় অঘটন ঘটেছিল, তাই নিজেকে আজও দোষী দোষী মনে হয়; খানিকটা দায়িত্ব ছিল বৈকি। তাঁর ছোট-শালার মুখের দিকে তাকান আর যেত না, শালাজ স্বর্গে যাবার পর। অনেক মৃত-পত্নীক দেখেছেন, কিন্তু অত মুষড়ে ভেঙ্গে পড়তে আর কাউকে দেখেননি। ওর জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেল! বড় অনুরাগ ছিল দুজনকার মধ্যে; সচরাচর

দেখা যায় না অমন। এত অনুরাগ, তবু কেন স্বামীর সম্বন্ধে ওরকম ধারণা ছিল সেই পতিব্রতার?...

"হয়ে গেল ত্রিশ বার? গুড্। Expound সমাস—অর্ধদগ্ধশরীরঃ।"

"অর্ধদগ্ধং শরীরং যস্য সঃ—বহুব্রীহি।"

"গুড্। কিন্তু অর্ধদগ্ধটুকু যে বাকি থেকে গেল।"

"অর্ধং যথা তথা দগ্ধম্—সুপ-সুপেতি সমাস।"

"গুড্। কিন্তু চংড়ী মছলি খাওয়া বাঙালীরা দন্ত্য স উচ্চারণ করতে পারে না। শমাশ নয়, বলো সমাস। দন্ত্য স দিয়ে।"

"ওতো পণ্ডিতজী সামাসা হয়ে যাচ্ছে।"

"ওই ঠিক উচ্চারণ। ওই বলো দশবার!"

...কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখের আধো-আধো বুলি যে রকম ভাল লাগে, সেই রকমই ভাল লাগছে এই মেয়েটির শুধু উচ্চারণ ক'রবার ব্যর্থ চেষ্টার ধ্বনি। সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত এর মধ্যেও একটা মিষ্টতা আছে।

...মধুরাঃ ঝঙ্কারাঃ—মধুরাঝঙ্কারাঃ।...

"হ'ল দশবার? সিট্ ডাউন! এবার গৌরী তুমি বলো। expound সমাস—মৃতপত্নীকঃ। ভেবে বলো, তাড়াতাড়ি করবার দরকার নেই। ভয় কিসের?......আশ্‌ন-কতে। আশঙ্কতে? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক হচ্ছে। গুড্। সিট ডাউন। নেক্সট্। গীতা। নম্বর এক, তুমি বলো। আজকাল গীতা নামটা এত বেশী কেন তোমাদের মধ্যে? কিন্তু নামটি বেশ ভাল। ওরকম গ্রন্থ আর নেই পৃথিবীতে।"

...স্ত্রীর অনুরোধে, তিনি শালাজের মৃত্যুশয্যার পাশে গীতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তখন শেষ সময়। যাঁকে শোনান, তাঁর তখন শোনবার বা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না। আগের দিনও শালাজ কথা বলেছেন; জ্ঞান ছিল পুরো মাত্রায়। যে কথাটি তাঁকে গত দু মাস থেকে পীড়া দিচ্ছে সেটা তো তার আগের দিনই বলা।...তাঁর স্ত্রী ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছিলেন তখন শালাজের গায়ে। পুরুষ মানুষদের সে ঘরে যাবার উপায় ছিল না। তিনি পাশের ঘরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু কোন ভরসা দেননি রোগিণী সম্বন্ধে। ননদ কত কি বলে চলেছেন...'খুব কষ্ট হচ্ছে? ওষুধ দিতে লাগছে? ভাবনা কি, সেরে যাবে দিন-কয়েকের মধ্যে। না, আবার কিসের? সারবে না! কত লোকের কত শক্ত শক্ত রোগ সেরে যাচ্ছে, আর তোমার এই ঘা-ফোস্কাটুকু সারবে না!'...

...'না না আমার আর বেঁচে দরকার নেই'...'ছি, ওকথা বলতে নেই।'... 'আমার মরে যাওয়াই ভাল।'...'কি যে বলো। কেন, হয়েছে কি তোমার?'... এর পরের কতকগুলি কথা তিনি মাঝের বন্ধ দরজায় কান লাগিয়ে বুঝতে পারেননি। একটু পরে আবার কানে এল...'না না সে সব ভেবো না তুমি।

সর্বাঙ্গ পুড়েছে তোমার কোথায়? দেখ দিকিনি, এই ব্যথা বিষের মধ্যেও তোমার মুখখানি কি সুন্দর দেখাচ্ছে!'...'ওরা কি ওই চায়'...যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দটিও তাঁর কানে এল। অন্তরের তাগিদে বেরিয়ে এসেছে হৃদয় নিঙড়ানো কথা কয়টি। এই বাক্যটিই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে গত দুইমাস থেকে। কথাটিকে মোটেই লঘু বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পাণিনির সূত্রের মতই সংক্ষিপ্ত ও অর্থপূর্ণ। বহু টীকা ভাষ্য করেও আজও বোঝা গেল না, ঠিক কি মনে করে মহিলাটি ওই ওরা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।...

"পণ্ডিতজী, আমিও কি সমাসের উচ্চারণ অভ্যাস করব নাকি?"

"ও. তুমি। নো। তুমি বলো সন্ধি—তদ-ছবিঃ—কি হয়? তচ্ছবিঃ। গুড্। সখী-উত্তম—সখ্যুত্তম। গুড্। বাণী-ঔচিত্যম্। ঠিক হচ্ছে। বলো। হ্যাঁ। বাণ্যৌচিত্যম। গুড্। সিট্ ডাউন। কিন্তু মূর্ধন্য ণএর উচ্চারণ হ'ল না। তোমরা যে দন্ত্য ন আর মূর্ধন্য ণএর একই উচ্চারণ কর। আচ্ছা এবার বাণী উঠবে। বাণী তোমার নামের উচ্চারণ কর। সংস্কৃত উচ্চারণ। বাংলা নয়। যে নামের উচ্চারণ করতে পার না, সে নাম রেখে লাভ কি? দশবার বলো।"

এই চেষ্টায়. হাসির ধুম পড়ে গেল ক্লাসে। হেডমিস্ট্রেস অফিস থেকে বেরিয়ে, একবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে গেলেন। পণ্ডিতজীর ক্লাসের সময় এ তাঁর ডিউটি দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ক্লাস শান্ত হয়ে গেল। অপ্রতিভ পণ্ডিতজী কথার খেই হারিয়ে ফেললেন অল্প কিছুক্ষণের জন্য।

...মালবিকা আসছে। কেন তা তিনি জানেন। ফাঁকি দিতে পারলে ও ছাড়ে না; কিন্তু কি বুদ্ধিমতী!...ও গন্ধতেল মাখে। পায়ের নখ কাটে না কেন?...সে এসে টেবিলের উপর থেকে বাইরে যাবার 'পাস'টা নিয়ে গেল। ছেলেদের স্কুলে এ ব্যবস্থা ছিল না। এ স্কুলেও অন্য শিক্ষয়িত্রীদের ক্লাসে 'পাস'এর ব্যবস্থা নেই। এ তিনি নিজে করেছেন, নিজের ক্লাসের জন্য। পকেটে করে নিয়ে যান প্রতি ক্লাসে। প্রথমে গিয়েই টেবিলের উপর রেখে দেন, যা'তে মেয়েদের বাইরে যাবার সময় মুখ ফুটে কথাটা বলতে না হয়। শোভন অশোভন সম্বন্ধে এত সজাগ কেন তিনি মেয়েদের বেলায়? এত নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবার প্রয়াস কেন? এসব মেয়েরা তাঁর নাতনীর বয়সী; তবু কেন তিনি এদের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করতে পারেন না? ছেলেদের স্কুলের সেই নিঃসংকোচ ভাব এখানে আসে না কেন?...ক্লাসে এর পরে কি প্রশ্ন করবেন, কিছুতেই মনে করতে পারছেন না তিনি। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। হেড্ মিস্ট্রেস একবার ক্লাসের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি হেনে চলে যাবার পর এমনিই হয়।...স্ত্রী চ পুমাংশ্চ স্ত্রীপুংসৌ—দ্বন্দ্ব সমাস নিপাতনে সিদ্ধ—তাঁর বড় পছন্দসই প্রশ্ন, ছেলেদের স্কুলে থাকা কালের। নির্দোষ শব্দটি, কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করতে বাধল। আবার খটকা লাগল মনে—আচ্ছা, বাঙ্গালী ছেলেদের

মুখের ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত বলা, তাঁর কানে কি এত মিষ্টি লাগত?...মনে পড়েছে আর একটা ব্যাকরণের প্রশ্ন। ছেলেদের ক্লাসে পড়াবার সময় প্রায়ই জিজ্ঞাসা করতেন—বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় বলো। বিম্বোষ্ঠী ও বিম্বোষ্ঠা দুইই হয়, এই উত্তর তিনি আশা করতেন। কিন্তু এ প্রশ্নটি যে মেয়েদের ক্লাসের অনুপযোগী। এ সব শব্দ ব্যবহার না করেও যদি পারা যায়, তবে দরকার কি! কে কোন্ মানেতে নেবে কে জানে। ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবাদের মত, তাঁকেও যে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়; কে আবার কি কোথা থেকে ব'লে দেবে।...আচ্ছা ব্যাকরণের অমোঘ বিধানগুলি তো স্থান-কালপাত্র নিরপেক্ষ। তবে তাঁর পড়ানর উপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে কেন? মেয়েদের বেলা একরকম, ছেলেদের বেলা আর একরকম হয়ে যান কেন তিনি?... দুজনের মনের ভাবই যে আলাদা। অদর্শ ছাত্র শিক্ষককে গুরু বলে ভক্তি করে—সেটা ভয়ের সম্বন্ধ; ছাত্রীরা শিক্ষয়িত্রীদের দিদি বলে—সেটা ভালবাসার সম্বন্ধ।...কারণটা ঠিক মনের মত হ'ল না।...

"লিলি! কাম্ টু দি বোর্ড।"

যখনই দিশেহারা পণ্ডিতজীর মুখে ক্লাসে জিজ্ঞাসা করবার মত প্রশ্ন জোগায় না, তখনই তিনি লিলিকে ডাকেন। এই রুগ্না কুরূপা মেয়েটিই তাঁর খেই-হারানো নিবারণের ওষুধ।

"লেখো, ওরা শব্দের সংস্কৃত কি। এর মধ্যে আবার ভাবছ কি?"

"আমি ভাবছিলাম যে আপনি সমাস না হয় সন্ধি জিজ্ঞাসা করবেন।"

"বাঃ, বেশ জবাব। তাই শব্দরূপ জিজ্ঞাসা করলে পারবে না? তুমি হচ্ছ বিদুষীকল্পা—অর্থাৎ ঈষদূনা বিদুষী। বুঝেছ? সম্ভবত বোঝনি। শব্দরূপ যে জানে না, তার পক্ষে তদ্ধিত বোঝা কঠিন। ব্যাড্। গো টু ইয়োর সিট্।"

অযথা দরকারের চেয়েও চটে উঠেছেন পণ্ডিতজী। লিলির হাত থেকে খড়ি আর ঝাড়ন তিনি টেনে নিলেন। অন্য কোন মেয়ে হলে তিনি অপেক্ষা করতেন তার খড়ি আর ঝাড়ন যথাস্থানে রাখবার; তারপর নিতেন।

এতক্ষণে নজরে পড়ল। ব্ল্যাকবোর্ডের উপর আগে থেকেই লেখা আছে—"বিয়াকরণ শব্দটি দিয়া একটি বাক্য রচনা কর। উত্তর : মৌলবী সাহেবের ন্যায় পুনরায় বৃদ্ধবয়সে শ্রীতাড়াতাড়িলাল মিশ্র, বিয়াকরণতীর্থে যাইবার মনস্থ করিয়াছেন। গুড্। সিট ডাউন।"

মৈথিলী আর বাংলার লিপি একই। সেইজন্য পণ্ডিতজীর বাংলা পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। তুরন্ত শব্দটির হিন্দীতে অর্থ তাড়াতাড়ি। তাই তুরন্তলাল নামটা চিরকাল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের হাসির খোরাক জুটিয়ে এসেছে। চটুলা মালবিকা একদিন তাঁকে তুরন্তলাল নামটার মানে পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল। দুষ্টু ছেলেরাতো চিরকাল বাইরে যাবার ছুটি নেবার সময় বলত—তুরন্ত ফিরে আসবো পণ্ডিতজী। শুনে ক্লাস সুদ্ধ সবাই হাসত,

আর তিনি বেশ উত্তম মধ্যম প্রহার দিতেন তাদের। কিন্তু তিনি এখানে মনে মনে হাসেন ছাত্রীদের এই সমস্ত রসিকতায়। বাঙগালী মেয়েদের সূক্ষ্ম মনের অন্ধিসন্ধিগুলোর সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের সীমা নেই। বোর্ডের লেখাটি নিশ্চয়ই মালবিকার; হ্রস্ব ইকারটা রেফের মত করে লেখা। সেই জন্যই ক্লাস থেকে পালিয়েছে। শব্দবিন্যাসে কিন্তু বেশ রসনিপুণতা আছে। সারা ক্লাস থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে আসছে। মেয়েরা জানে যে হেড মিস্ট্রেসের সঙ্গে কথা বলতে হবে ভয়ে, পণ্ডিতজী কোন দিন নালিশ করতে যাবেন না তাঁর কাছে। তাই তাদের এত সাহস। মেয়েরা যে সব বোঝে। তারা যে সব সময় বলাবলি করে, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের সময় পণ্ডিতজী অন্য শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে চোখ বুজে আড়ষ্ট হয়ে, কেমন করে বসেছিলেন। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে, ক্লাসের ছাত্রীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, এ নিয়ে যে তারা কত সময় হাসি ঠাট্টা করে নিজেদের মধ্যে।

পণ্ডিতজী ঝাড়ন দিয়ে বোর্ড পরিষ্কার করে নিয়ে লিখলেন—সঃ তৌ তে। "তে বহুবচন, তে মানে ওরা। তে শব্দটির সঙ্গে ইংরাজী they শব্দটির কি রকম মিল লক্ষ্য করেছ লিলি?" তিনি ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে মুখ করেই বলছেন। 'তে'র জায়গায় গিয়ে খড়ি সুদ্ধ হাত থেমে গিয়েছে।...সেই সতী-সাধ্বী মরবার আগের উক্তিতে বহুবচন ব্যবহার করলেন কেন? 'ওরা কি ওই চায়'। 'ওরা' বলতে তিনি কী বুঝেছিলেন? নিজের স্বামীর কথাই কি তিনি তখন ভাবছিলেন? 'ওরা' বলতে সমগ্র পুরুষ জাতিকে তিনি বোঝেননি তো? তা' কি করে হবে। ওরূপ সামান্যীকরণ যে ভুল, সে কথা নিশ্চয়ই তাঁর শালাজও জানতেন। তাঁর জানা শোনা আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই কত নিষ্ঠাবান সংযমী পণ্ডিত তিনি দেখেছিলেন। সকলে সে রকম হতে যাবে কেন! স্বামীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত মন্তব্যের তীব্রতা বয়স্থা ননদের সম্মুখে কমাবার জন্যই কি তিনি অনিচ্ছায় একবচনের বদলে বহুবচন ব্যবহার করেছিলেন? নিজের স্বামীর সম্বন্ধেই বা ওরকম ধারণা হল কেন সে পতিব্রতার? কি ভেবে সে মহিলা 'ওরা' বলেছিলেন তিনিই জানেন। দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।... আচ্ছা এই ক্লাসের ছাত্রীরা তাঁকে আর মৌলবী সাহেবকে একই শ্রেণীর লোক বলে ভাবে নাকি? ব্ল্যাক বোর্ডের উপরকার লেখাটা দেখে তো তাই মনে হয়? কেন এরকম ভাবে?...কি দেখে তাঁকেও ওই দলে ফেলল?...

স্কুলের দাই চিঠি নিয়ে ক্লাসে এসে ঢুকল। খামে চিঠি এসেছে পণ্ডিতজীর। ডাক পিয়ন হেড মিস্ট্রেসের কাছে স্কুলের ডাক দিয়ে যায়, তিনি তারপর যার যার চিঠি তার তার কাছে পাঠিয়ে দেন। দাই-এর হাত থেকে চিঠিখানা নেবার সময়, খুব সাবধানে নিলেন পণ্ডিতজী, যাতে দাই-এর আঙুলের সঙ্গে তাঁর আঙুল না ঠেকে। এ সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি সদা জাগ্রত। কিন্তু আজ প্রথম খটকা লাগল মনে। প্রশ্ন করলেন নিজেকে—পরস্ত্রীর ছোঁয়াচ

থেকে বাঁচবার জন্য এই এত শ্চিবাই কেন?...কেন স্ত্রীলোকদের সম্মুখে সহজ ব্যবহার করতে পারেন না তিনি?

পণ্ডিতজী চিঠিখানা খুললেন। বড় শালা লিখেছেন তাঁর দিদিকে। এদেশে স্ত্রীর চিঠি স্বামীর নামেই আসে, তাই খামের উপর তাঁর নাম ছিল। ছোট শালার বিয়ে এক সপ্তাহ পরে; তাই বোন আর ভগ্নীপতিকে যেতে লিখেছেন। ছোট শালা কিছুতেই বিবাহ করতে রাজী হচ্ছিল না; অতি কষ্টে ধরে-বেঁধে রাজী করান গিয়েছে।

চিঠি পড়েই কি জানি কেন পণ্ডিতজীর মেজাজ বিগড়ে গেল ছোট শালার উপর।...দুই মাসও কাটেনি! সবুর সইছে না! আর কিছুদিন পর করলেই তবু কতকটা শোভন হ'ত!...

"লিলি, বুঝেছ—তে হচ্ছে বহুবচন। সাধারণত অনেক লোককে বোঝায়। কিন্তু বলতো একজন লোকের বেলায় কখন বহুবচন ব্যবহার হয়? জান না? নেক্সট্! নেক্সট্! এনি বডি ইন্ দি ক্লাস? কেউ জান না?...(মালবিকা থাকলে পারত)...। গৌরবে বহুবচন হয় কেউ জান না? স্ত্রীর উক্তিতে পতির সম্বন্ধে উল্লেখের সময়, সম্মানার্থে বহুবচনের ব্যবহার হতে পারে। বুঝেছ?"

পণ্ডিতজী ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন—"গৌরবে বহুবচন।" লেখাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, নিজের বিবেককে আশ্বাস দেবার জন্য। এতক্ষণে তাঁর ক্লাসের দিকে মুখ ফেরাবার সময় হল। নজর পড়ল লিলির দিকে। কাঁদছে তাঁর বকুনি খেয়ে। ছেলেরা বিলক্ষণ প্রহার খেয়েও কাঁদত না; কিন্তু সামান্য কথাতেই মেয়েদের চোখে জল আসে। তিনি এমন কিছু রূঢ় ভর্ৎসনা করেননি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে কেঁদে ভাসাতে হবে!...

"ললিতা, এবার তুমি বলো। সন্ধি। খুব সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তোমাকে। মধু-উৎসবঃ কি হয়? বানান করে বলো। গুড্। হ্যাঁ, দীর্ঘ-উকার, মনে করে রেখো। সমাস কর—দ্বিতীয়া ভার্যা যস্য সঃ। হ্যাঁ। গুড্। সিট্ ডাউন। নেক্সট্। গায়ত্রী। তুমি ভ্রম সংশোধন কর এই বাক্যটির—ভ্রমরাঃ পুষ্পমধু পিবতুম ধাবন্তি। না। ভেবে বলো। হ'ল না। এনি বডি ইন দি ক্লাস; কেউ পার না?...(মালবিকা এখনও ফেরেনি)!...পিবতুম ভুল। পাতুম হবে। মনে করে রেখো।"

...আজকে মালবিকাকে বেশ করে বকে দিতে হবে। এ কি অন্যায় কথা! গিয়েছে, সে কি এখন! সমস্ত ঘণ্টাটা বাইরে কাটিয়ে সে আসবে! প্রতিদিন সে এই করে! নাই দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়েছে! এতটুকু আক্কেল নেই—অন্য মেয়েদেরও তো ঐ পাসখানা নেবার দরকার হ'তে পারে!

মেয়েরা সকলেই জানে যে পণ্ডিতজীর সব চেয়ে কড়া ধমক হচ্ছে 'ব্যাড্' শব্দটি।

মালবিকা এসে ক্লাসে ঢুকল। তার মানে ঘণ্টা শেষ হবার আর দুচার

মিনিট মাত্র দেরি আছে। পাসখানা পণ্ডিতজীর টেবিলের উপর রাখবার জন্য সে এগিয়ে আসছে। তেলের গন্ধটা নাকে এল।

...শোভনঃ—গন্ধ শোভনোগন্ধ। পায়ের আঙুলের নখ কাটে না কেন?

"অনেক দেরি হ'ল তোমার।"

"আমি তো পণ্ডিতজী পরীক্ষা দিয়ে, বিয়াকরণ আর সামাসার উচ্চারণ শিখে, তারপর গিয়েছি।"

...মেয়েটি এমন সব কথা বলবে যে না হেসে উপায় নেই। বড় বড় পাকা গোঁফের মধ্যে হাসিটুকু আটকে গেল। ক্লাসের মেয়েরাও হাসছে। পণ্ডিতজী হাসি চাপবার চেষ্টা করতে করতে বললেন—"ক্লাস ফাঁকি দেবার শাস্তি হিসাবে তোমাকে আবার পরীক্ষা দিতে হবে।"

"উচ্চারণের পরীক্ষা নাকি পণ্ডিতজী?"

অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে তিনি বলেন—"না না। তুমি বলতো বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে কি হয়?"

এত সহজ প্রশ্ন? মালবিকার মত ক্লাসে ফার্স্ট-হওয়া মেয়েকে? ক্লাসের মেয়েরা একটু অবাক হল।

"বিম্বোষ্ঠী, বিম্বোষ্ঠা দুইই হয়।"

এতক্ষণে পণ্ডিতজী নিজেকে সামলে নিলেন। গুড সিট্‌ডাউন, বলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মালবিকা ফিরে আসবার এক মুহূর্ত আগেই যে উনি ঠিক করেছিলেন, আসামাত্র আগেই ওকে কড়া ধমক দিতে হবে—ব্যাড্‌ বলতে হবে! মুহূর্তের অসংযতচিত্ততায় তিনি ব্যাড্‌ বলতে ভুলে গিয়েছেন! শুধু তাই নয়। আজ প্রথম এই স্কুলে বিম্বোষ্ঠঃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ জিজ্ঞাসা করেছেন। ক্লাসের মেয়েরা কি তাঁর এই বিচ্যুতির কথা ধরতে পেরেছে? আতঙ্ক, বিষাদ, আর অনুশোচনার ছায়া পড়ল তাঁর মনে। মনের কুহেলীর মধ্যে শুধু একটা জিনিস তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। 'ওরা' শব্দের অর্থ। ভদ্রমহিলা কাউকে বাদ দেননি। পক্ককেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পর্যন্ত না। অদ্ভুত অর্থবোধিকা শক্তি কথা কয়টির। বৃথাই তিনি গত দুই মাস থেকে একটি অলঘু বিষয়কে লঘু করবার চেষ্টা করছিলেন, গৌরবে-বহুবচন সূত্র দিয়ে। বুঝেও বুঝতে চাচ্ছিলেন না।

ঝাড়নখানাকে নিয়ে তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা 'গৌরবে বহুবচন' কথা কয়টি মুছে দিলেন। মনের মধ্যে এতদিনকার পোষা আত্মগৌরবটুকুও মুছে গেল এরই সঙ্গে।

"এসব তোমাদের দরকার নেই, বুঝলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এসব প্রশ্ন কখনও আসে না।"

ঘণ্টা পড়ল ক্লাস শেষ হবার।

খড়ির গুঁড়ো ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবার ছলে, নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাকরণের সমস্যাটা মিটেছে; কিন্তু অঙ্কর উত্তর মিলে যাবার পরিতৃপ্তি নেই এর মধ্যে। নিজের উপর অপ্রসন্নতায় সব কিছু খারাপ লাগছে। সবাই সমান—তিনি, মৌলবীসাহেব, ছোটশালা,—সবাই!...গতো ঔৎসুক্যম—গতাবৌৎসুক্যম...। শোভন আচরণের পথ দিয়ে তিনি মাটির দিকে তাকিয়ে বিশ্রামঘরের দিকে চলেছেন।...আকৃষ—তঃ আকৃষ্টঃ...। সহস্রজোড়া কুতূহলী চোখ নিশ্চয়ই তাঁকে লক্ষ্য করছে,—চিনে গিয়েছে সবাই তাঁকে—বিবস্ত্র, নগ্ন তিনি আজ—লজ্জার ভারে ঝুঁকে পড়েছেন—ঘরে ঢুকবার আগে চৌকাঠে হোঁচট খেলেন।

টেবিলের উপর মৌলবীসাহেবের পা দুটো নড়ছে, অবিরাম গতিতে। এর জ্বালায় টেবিলের উপর একখানা বই পর্যন্ত রাখবার জো নেই!—পুস্তক হলেন সাক্ষাৎ সরস্বতী! এই বকধার্মিকবলা লোকটা যদি চোখদুটোও খুলে রাখত পা দোলানর সময়, তা'হলে আর তাঁর কানে পইতা জড়ানো অবস্থায় ক্লাসে যেতে হ'ত না আজ!

"ও মৌলবীসাহেব, ঘুমিয়ে নাকি? একটা কথা বলছি—এতদিন বলি বলি করেও বলিনি—কিছু মনে করবেন না। আপনি যদি আবার বিবাহ করেন, তাহলে হেডমিস্ট্রেস আর স্কুল কমিটির মেম্বররা বিরক্ত হবেন।"

মৌলবীসাহেব চোখ বোঁজা অবস্থাতেই ছড়া আওড়ালেন—"জো গুল কি জাহিয়া হ্যায়, উসে কেয়া খার কা খট্‌কা? যে গোলাপ তুলতে চায় তার কি কখনও কাঁটার ভয় করলে চলে?"

......বলা বৃথা লোকটাকে!...অলঘুম্ লঘুম্ করোতি—লঘু-করোতি। উ-এ দীর্ঘউ হবে, বুঝলে মালবিকা।...আচ্ছা, আজকের চিঠিখানির কথা স্ত্রীর কাছে চেপে গেলে কেমন হয়? পোষ্ট অফিসে কত চিঠিইতো হারিয়ে যায়। তাহ'লে তাঁকে আর যেতে হয় না ছোটশালার বিয়েতে!...কিন্তু, মেয়েমানুষদের চোখে ধুলো দেওয়া কি অত সহজ! তারা যে সব ধরে ফেলে! তারা যে পুরুষদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়!...কোন উপায় নেই!...তবু তিনি চেষ্টা করে দেখবেন আজ।—আজ প্রথম জেনেশুনে মিথ্যাচার করবেন।...কিন্তু সত্যিই কি বকধার্মিকের এই প্রথম মিথ্যাচার?

চোর

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমি যেদিন পেঁপে চারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়িতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।

স্কুলে যাবার সময় রাস্তার নর্দমার পাশে সবুজ কচি, আমার আঙুলের সমান, কি তার চেয়েও ছোট লিকলিকে একটা পেঁপে চারা চোখে পড়েছিল। কচু আর কাঁটা-নটের জংগলের মাঝখানে চারাটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দেখে আমার তখনি লোভ হচ্ছিল ওটা তুলে নিই। কিন্তু ক্লাসে গাছটা রাখবার সুবিধা হবে না, এ ও পাঁচটি ছেলে হয়তো ওটা হাতে নিয়ে দেখতে চাইবে, দেখতে দেখতে হাতের চাপে নরম চারাটাকে চট্‌কে ফেলবে—তা ছাড়া জামার পকেটে লুকিয়ে রাখলেও বেলা চারটে পর্যন্ত জল-মাটি ছাড়া ওইটুকু গাছ শুকিয়ে আধমরা হয়ে যাবে চিন্তা করে তখন সোজা স্কুলে চলে গেছি। স্কুল ছুটি হওয়ামাত্র অন্য কোনোদিকে না তাকিয়ে কারো সংগে একটা কথা না বলে আবার সোজা সেই নর্দমার পাশে কচু আর কাঁটা-নটের জংগলের কাছে চলে এসেছি। তারপর হাত বাড়িয়ে টুক্‌ করে পেঁপে গাছটা তুলে নিয়েছি। বর্ষাকাল। জলে ভিজে ভিজে মাটি এমনি নরম হয়েছিল। আমার খুব ভাল লাগল অত তাড়াহুড়ো করে গাছটাকে মাটি থেকে উপড়ে ফেলার পরও যখন দেখলাম দশ নম্বর সূঁচের মতন সরু লম্বা আর দুধের মতন সাদারঙের মূলটা আর মূলের চারপাশের চুলের মতন সরু ছোঁচালো শিকড়গুলোর একটাও ছিঁড়ে বা ভেঙে যায়নি। যেন মূল ও শিকড় সমেত চারাটা আমার হাতে উঠে আসতে তৈরী হয়েছিল।

হ্যাঁ, তখন বিকেল। আমাদের রান্নাঘরের পিছনে ছাই আর জঞ্জাল নিয়ে চারহাত পাঁচহাত একটুকরো জমি দিনের পর দিন বছরের পর বছর এমনি পড়ে আছে। দিনরাত ছায়ায় ঢাকা থাকে বলে সেখানে কোনো গাছ হয় না। এত বড় একটা যজ্ঞডুমুরের গাছ ডালাপালা ছড়িয়ে জমিটা অন্ধকার করে রেখেছে, সেখানে আর অন্য কিছুর চারা বা গাছ মাথা তুলতে সাহস পায় না। শীতের গোড়ার দিকে মা ফি-বছর ধনেশাক লাগাতে গেছে কিন্তু হয়নি। বাবা এই সেদিনও ডাঁটার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। বীজ ফুঁড়ে অগুণতি কুঁড়ি বেরিয়েছিল। কুঁড়িগুলো যখন দু পাতার ছোট ছোট গাছ হয়ে বড় হচ্ছিল তখন আস্তে আস্তে সব ফ্যাকাশে রং ধরে শুকিয়ে খড়কের মতন হয়ে-হয়ে

মরে গেছে। দুটো-একটা ডুমুরের ডাল কেটে দিয়েও বাবা সুবিধা করতে পারেনি। মুশকিল এই যে সবটা গাছ কাটা যায়নি। কাটতে গেলে আমাদের পিছনটা একেবারে বে-আব্রু হয়ে পড়বে এই ভয়ে বাবা ডুমুর গাছটা রেখেছিল।

তা হোক, আমার পেঁপে গাছ বাড়বে না, ছায়ায় থেকে-থেকে ফ্যাকাশে রং ধরে একদিন খড়কের মতন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি যত্ন করে চারাটা পুঁতলাম। পুঁতে বেশ করে খানিকটা বাড়তি মাটি উঁচু করে গুঁড়ির চারপাশে তুলে দিলাম। চৌবাচ্চার ঠাণ্ডা জল মগে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারাটাকে প্রায় স্নান করিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি যখন শূন্য মগ হাতে করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি তখন ও আমার পিছনে এসে দাঁড়ায়। শুকনো পাতার মচমচ শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সুকুমারদের বাড়ির সেই যে ছোকরা চাকর—নামটা অবশ্য তখনি মনে পড়ে গেল—মদন। মিট্‌মিট্‌ করে হাসছে। বগলে একটা ছোট পুঁটলি। পরনে ময়লা ছেঁড়া হাফ-প্যাণ্ট। গায়ের গেঞ্জিটা আরো বেশি ছেঁড়া। পিঠের দিকটা কেমন আছে চোখে পড়ছে না, দেখলাম বুকের দিকটা ফুটো হয়ে-হয়ে জামাটার আর কিছু নেই।

'হাসছিস কেন?' আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম।

'গাছ দেখছি।' আমাকে গম্ভীর দেখে মদনও গম্ভীর হয়ে গেল। 'বটের চারা?'

'তোর মাথা।' রাগ করে বললাম, 'বাড়ির ভিতর কেউ বটগাছ লাগায় নাকি হাম্মক। পেঁপে চারা। বটের পাতা এমন হয়?'

কথা না বলে মদন চোখ তুলে মাথার ওপর যজ্ঞডুমুরের ছড়ানো ডালপাতার দিকে চেয়ে রইল। তখন আমি লক্ষ্য করলাম মদনটা খুব শুকিয়ে গেছে। হাত-পা কাঠির মতন হয়েছে দেখতে। কানের পাশে গলায় ময়লা জমে ছাতা পড়েছে। ওর মাথায় কেমন চমৎকার টেড়ি দেখেছি—তার কিছু ছিল না, যেন অর্ধেক চুল উঠে গেছে, ছোট হয়ে গেছে মাথাটা। এইটুকুন ছোট-ছোট চুল—তা-ও কতকাল যেন তেল-জলের মুখ দেখেনি।

একটা ঢোঁক গিললাম।

'কোথায় ছিলি এতকাল। সুকুমারদের বাড়িতে তো দেখিনি?'

'ব্যামো হয়েছিল। দেশে গিছলাম।' মদন আমাদের উঠোনের দিকে ঘাড় ফেরাল। 'মা-ঠাকরুন আছেন ঘরে?'

আমার চোখে চোখ রেখে যখন ও প্রশ্ন করল তখন হঠাৎ আমার মাথায় কথাটা এল।

'সুকুমারদের বাড়িতে আর তুই চাকরি করিসনে?'

মুখ বেজার করে মদন ঘাড় নাড়ল।

'মা কোথায়?'

চুপ করে ওর রোগা হাত পা ও ছেঁড়া জামাটা আর-একবার দেখতে দেখতে

পরে বললাম, 'মার শরীর খারাপ। সবে আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে। শুয়ে আছে

'ভাই হয়েছে বুঝি?'

মুখ বেজার করে আমি মাথা নাড়লাম।

'বোন। রংটা যদিও আমার চেয়ে ফরসা হয়েছে।'

মদন চুপ করে থেকে আমার পেঁপে চারাটা দ্যাখে।

একটা কথা মনে হল। কিন্তু চেপে গেলাম।

'কেন, মাকে,—আমার মাকে কি দরকার?'

মদনের চোখের দিকে তাকাই।

মদন অল্প হাসল।

'দরকার আছে।'

'আয় আমার সঙ্গে।'

কলতলায় গিয়ে হাত ও পায়ের কাদা ধুয়ে ফেলি। মুখটা ধুয়ে ফেললাম হাতের পুঁটলি চৌবাচ্চার সিমেণ্টের ওপর নামিয়ে রেখে মদন হাত ধোয় প ধোয় তারপর আঁজলা করে ঢকঢক করে অনেকটা ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেয়। রোগ পেটটা ফুলে ওঠে। মাথায় আমরা দুজন সমান। আমার বয়স বেশি কি মদনে বয়স—চিন্তা করছিলাম। হয়তো দুজন এক বয়সের ছিলাম।

'আয় ইদিকে আয়।'

ঘরের পৈঠায় উঠে মাকে ডাকলাম।

মদন আমার পেছনে দাঁড়ায়।

বাচ্চা বোনটাকে নিয়ে মা সম্ভবত শুয়ে ছিল। আমার ডাক শুনে উে বসল। রোগা ফ্যাকাসে মুখখানা দরজার কাছে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কেন, বি হয়েছে।'

'মদন—সুকুমারদের বাড়ির মদন। এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

মা হঠাৎ চুপ করে রইল। মদনকে ভাল করে দেখল।

'কি হয়েছিল তোর?' একটু পর মা প্রশ্ন করে।

'ব্যামো—কালাজ্বর।' মদন এক পা এগিয়ে চৌকাঠ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'এখন আর জ্বর হয়?'

মদন মাথা নাড়ল।

আবার কি ভাবল মা। তারপর :

'ও বাড়ি গিয়েছিলি?'

মদন এবারও কথা না কয়ে ঘাড় কাত করল। মানে সুকুমারদের বাড়ির কথা হচ্ছে। আমি চুপ থাকি।

'গিন্নীমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে।' মদন মার দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকায়। 'আমাকে আর রাখবে না,—গিন্নীমা বলল, অন্য লোক রাখা হয়ে গেছে।'

'সে কি রে!' অবাক হবার সুরে মা বলল, 'তুই ওদের পুরনো লোক, এতকাল কাজ করলি!' একটু থেমে মা পরে আস্তে আস্তে, যেন অনেকটা নিজের মনে বলল, 'তা অসুখ-বিসুখ তো মানুষের হবেই—অসুখ করল দেশে গেল, এর মধ্যে অন্য লোক রাখা হয়ে গেল! না হয় রাখল, কিন্তু—' আবার কি ভেবে মা মদনের মুখ দ্যাখে।

'আর কারো বাড়ি গিয়েছিলি? কেউ কথা দিলে?'

মদন মাথা নাড়ল। আর তৎক্ষণাৎ আমি বলে বসলাম, 'সুকুমারদের বাড়িতে "না" করে দিতে ও সোজা এখানে চলে এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'তুমি চুপ কর, তুমি থাম!' মা আমাকে ধমক দিতে আমি চুপ করলাম। চুপ করে মদনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ও কাঁদতে আরম্ভ করেছে। কান্নার শব্দ নেই। চোখে জল আসছে আর হাতের পিঠ দিয়ে ক্রমাগত তা মুছতে চেষ্টা করছে।

'তা কর্তা আসুক—', মা বলল, 'একবার ওঁকে জিজ্ঞেস করে দেখি।' বাচ্চা বোনটা কেঁদে উঠতে মা ঘুরে বসল।

চোখ মোছা শেষ করে মদন আমার দিকে তাকায়। আমিও ওর মুখ দেখি। একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ওর ঠোঁটের ধারে উঁকি দেয়। সম্ভবত আমার ঠোঁটের কিনারেও এমন একটা রেখা জেগেছিল। বস্তুত আমি তখনও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না অতবড় বাড়ির চাকর আমাদের বাড়িতে চাকরি করবে। তেতলা বাড়ি, মোটরগাড়ি, রেডিও, আরও তিনটে চাকর-চাকরানী, হৈ-চৈ খাওয়া-দাওয়া—আমাদের ছোট উঠোন, টালির ঘর, কেরাসিনের আলো, টিমটিমে ঠাণ্ডা সংসার।

সন্ধ্যার দিকে বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে বাবা ঘরে ফিরল।

আমি আমার ছোট্ট ঘরে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে বসার উদ্যোগ করছি। মদন বাইরে পৈঠার অন্ধকারে চুপচাপ বসে আছে। দুটো পয়সা দিয়েছিল মা ওকে। সেই সকালের ট্রেনে দুটো পান্তা খেয়ে দেশ থেকে ট্রেনে চেপেছিল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। তার ওপর সবে ব্যারাম থেকে উঠে এসেছে। পয়সা দিয়ে মুড়ি কিনে খেয়ে মদন অন্ধকারে বসে ঝিমোচ্ছিল, মাঝে মাঝে চড়-চাপড় দিয়ে গা থেকে মশা তাড়াচ্ছিল। কিন্তু আমি কান পেতে ছিলাম বাবা কি বলে শুনতে। হাত মুখ ধুয়ে বাবা বিশ্রাম করতে বসে। মা উঠে চা তৈরী করে দেয়। বস্তুত এই খারাপ শরীর নিয়েই মাকে রান্না ও ঘরের আরও পাঁচটা কাজ করতে হচ্ছিল। চা খেতে-খেতে বাবা সব শুনল। শুনে হাসল।

'কেন, তিনটে লোক আছে, ড্রাইভার আছে, বাগানের কাজ করতে বাইরের একটা লোক রাখা হয়েছে—না হয় আর-একটা—কত বয়স, আমাদের মিণ্টুর চেয়ে বড় হবে না—কি নাম যেন ছেলেটার? মদন। পুরনো লোক ওদের—এভাবে ওকে মুখের ওপর "না" করে দিলে?' একটু থেমে বাবা শেষ করল, 'বড়লোক কি আর গরীবের দুঃখ বোঝে! এখন বেচারা যায় কোথায়।'

মা যেন ও-ঘর থেকে আরও কি বলল।

বাবা চিন্তা করছে। বুঝতে পারলাম বাবা চিন্তা করে দেখছিল সবটা বিষয়।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে চৌকাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। মদন বাবার পায়ের কাছে চুপ করে বসে আছে। বলতে কি মদনের জন্য আমার বুকের ভিতর ভয়-ভয় করছিল। যদি বাবা 'না' বলে বসে, যদি বাবা বলে যে—

'কত মাইনে দিত ওরা বললি?'

'দশ টাকা।'

'আর দুবেলা ভাত দুবেলা জলখাবার?'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মদন ঘাড় কাত করল। বাবা আবার চিন্তা করছে। মা ছোট বোনটাকে দুধ খাওয়ায়। মার দিকে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বাবা প্রশ্ন করে,

'তুমি কি ওষুধটা খেয়েছিলে?'

মা মাথা নাড়ে।

'ওষুধটা ভাল। ওইটুকুন শিশি। ছ'টাকা দাম। তা ভাল জিনিস। খাও। নিয়মিত খেতে থাকলে শরীরে বল পাবে।' ব'লে বাবা আবার মদনকে দ্যাখে। তারপর :

'আমি গরিব। কেরানী মানুষ। অত মাইনে দিতে পারব না। অথচ একটা লোকও চাই। মিণ্টুর মার শরীর একেবারে ভেঙে গেছে। তা বাপু—

মা মদনের মুখ লক্ষ্য করছে। আমিও তাকিয়ে আছি ওর দিকে। মদন ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছে।

বাবা বলল, 'দুবেলা ভাত খাবে—আর সকালে বিকালে ওই একটু চা রুটি—আমাদের যা হয়—আর আর—' হাত থেকে চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বাবা গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

অর্থাৎ বাবা ইতস্ততঃ করছিল। একটা বাড়তি লোকের খোরাক জুগিয়ে অতিরিক্ত দুটাকা একটাকা ঘর থেকে বার করে দিতেও বাবার কষ্ট হবে আমার জানতে বাকি ছিল না। অনেক কষ্ট করে বাবা মার জন্য একটা ওষুধ কিনে এনেছে। আমার স্কুলের দু মাসের মাইনে জমে গেছে। বাবা এসবই চিন্তা করছিল, মুখ দেখে বুঝলাম।

মা মদনের দিকে তাকাল।

'দশ টাকা মাইনে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না বাপু,—তিন টাকার বেশি পাবে না।'

অবাক হয়ে দেখলাম মদন তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করেছে।

বাবা খুশি হল।

'তা ছাড়া কাজকর্ম আমার সংসারে আর তেমন কি—অতিথি অভ্যাগত নেই, বাইরের লোক নেই। তিনজন তো আমরা মানুষ।'

মদন আবার ঘাড় কাত করেছে। হ্যারিকেনের আলোয় চোখে পড়ল ওর মুখে হাসি ফুটেছে। মানে, তাতেই সে রাজী। মদন আমাদের বাড়িতে থেকে গেল। আমার এত ভাল লাগছিল!

বড় বড় চারটে ডুমুরের ডাল কেটে ফেলল মদন। আকাশটা ফরসা হয়ে গেল। আমার পেঁপে চারাটা ফট্‌ফটে রোদের মুখ দেখে হাসতে লাগল।

'এইবেলা গাছটার জোর বাড় হবে', মদন বলল, 'ওই ডুমুরের ডাল দিয়ে আমি বেড়া তৈরী করে দেব—ছাগল গরু এসে মুখ লাগাতে পারবে না।'

'আরো দু চার রকমের চারাগাছ এনে পুঁতব', আমি বললাম, 'জমিতে এখন রোদ লাগছে, এখন গাছ বাড়বে।'

'তার জন্যে চিন্তা কি—আমি যখন এসে গেছি আর চিন্তা নেই, আমি হরেক রকমের চারা এনে লাগিয়ে দেব।' খুশি হয়ে মদনকে চুমো খাবার মতন আমার মনের অবস্থা। সকালে মাকে বাটনা বেটে দিয়ে জল তুলে দিয়ে, ঘর বারান্দা ঝাঁট দিয়ে একটু অবসর হতে ও ছুটে এসেছিল রান্নাঘরের পিছনে। পেঁপে চারাটা ছায়ায় ঢাকা আছে দেখে তখনি ও কাটারি হাতে করে ডুমুর গাছে উঠেছে। রোগা শরীর। পা দুটো ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিল। ভয় পেয়ে আমি নিচে দাঁড়িয়ে বলছিলাম, 'সাবধান, দেখিস পড়ে-টড়ে না যাস!' গাছের ডালে কাটারির কোপ বসাতে বসাতে মদন বলছিল, 'আমরা চাষীর ছেলে, হুট্ করে কি গাছ থেকে পড়ে যাই—' আমি আর কিছু বলিনি।

অতবড় চারটে ডাল কাটা হয়েছে দেখে বাবা চোখ কপালে তুলল। 'এটা করলি কি মদন, বাড়ির আব্রু নষ্ট করে ফেললি!'

মা পিছনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে। বাবা যখন ডুমুর গাছের অবস্থা দেখে খুব একটা হায় আফসোস করতে আরম্ভ করল তখন মা মুখ থেকে আঁচল সরাল : 'আমি তো বুড়ো হতে চললাম, তোমার ছেলের বৌ আসতে এখনো ঢের দেরি। অত আব্রু রাখার দরকার কি—তা ছাড়া—'

যেন একটু অবাক হয়ে বাবা মার মুখ দেখছিল।

মা বলল, 'তা ছাড়া আমাদের পিছনটা তো ফাঁকা। পোড়ো মাঠ। মানুষের মুখ দেখা যায় না। আব্রুর দরকার পড়ে না।'

অর্থাৎ মা যে মদনের কাজটা সমর্থন করল আমি বুঝে গেলাম। কেন করবে না। আমি বাগান করতে চাইছি আর মদন এ বাড়ির কাজে লাগতে না লাগতে আমাকে সাহায্য করছে মা কি সেটা ভাল চোখে না দেখে পারে!

তা ছাড়া এমনিও মদন মার খুব বাধ্য হয়ে পড়ল। মা শুধু চোখের ইঙ্গিত করতে মদন এটা এনে দেয় ওটা বাড়িয়ে দেয়। কয়লার গুঁড়ো জমে ছিল। মাটি এনে মদন নিজে থেকে এত এত গুল তৈরী করে ফেলল। মাকে বলতে হল না। রোদে শুকিয়ে সব গুল নিজেই তুলে রান্নাঘরের কোণায় এনে জড়ো করে রাখল। মা বলল, 'গরিবের ছেলে গরিবের সংসারেই তোকে মানিয়েছে বাবা।'

 জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

'ও বাড়ি আমি আর ইয়ে করতেও যাব না।' মদন একটা খারাপ কথা বলতে যাচ্ছিল, মা ধমক দিতে ও চুপ করল। তারপর মা কি ভেবে হাসল : 'কেন, ওরা কি তোকে খেতে-টেতে দিত না?'

'ছাই দিত!' যেন কথাটা বলতে মদনের মুখ চুলবুল করছিল। 'সরু চালের ভাত, গাওয়া ঘি, মাছ, ঘন দুধ—এই এতবড় টুকরো মাছের—সব ওরা খেয়েছে। কর্তা খেয়েছে গিন্নী খেয়েছে খোকা খেয়েছে—আমাদের ঝি-চাকরের জন্যে মোটা চালের ভাত আর ডাল আর পুঁই-চচ্চড়ি—মাসের মধ্যে এক-আধদিন কুচো চিংড়ি পেতাম চচ্চড়িতে—আর ডালের কি চেহারা—গঙ্গাজল!' এমনভাবে হাত নেড়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে মদন সুকুমারদের বাড়ির খাওয়ার বর্ণনা করছিল যে আমি ও মা একসঙ্গে জোরে হেসে ফেললাম। বাবা এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে কেউ দেখতে পাইনি।

বাবা ধমক লাগায়।

'হয়েছে হয়েছে—একজনেরটা খেয়ে এসে নিন্দে করতে নেই—বলে, যার নুন খাব তার গুণ গাব—নিন্দে করা পাপ।' আমাদের হাসি নিভে গেল। মদন চুপ করে রইল। আমি সেখান থেকে সরে গিয়ে আমার পেঁপে গাছের তদারক করতে লেগে গেলাম। রান্নাঘরের পিছনে দাঁড়িয়ে আমি বাবার গলা শুনছিলাম। 'তা অত গুল দেওয়াবার কি দরকারটা ছিল—একটা কচি বাচ্চা পেটের দায়ে নয় এখানে চাকরি করছে—তাই বলে তুমি সব কাজ ওকে দিয়ে সারছ।' বুঝলাম মাকে বলা হচ্ছে। মা বলছিল. 'আমি কিচ্ছু বলিনি—বরং আমি না করেছি—নিজে থেকে ও মাটি এনে বসে বসে এসব দিয়েছে।'

তারপরও বাবা গুমগুম করে কি বলছিল আমি শুনতে পাইনি। না, একটা বাচ্চা ছেলে রাতদিন খাটুক বাবা যেমন পছন্দ করে না, মা-ও তা চায় না। আমি নিজের চোখে দেখতাম। ঘি, ঘন দুধ, বড় মাছ আমরা কেউ খেতে পেতাম না। মাসের আটাশ দিন ডাল তরকারী শাক চচ্চড়ি হত। কিন্তু তা হলেও যদি মা কোনোদিন পটলটা বেগুনটা ভাজত, কি বড়াটড়া করত, আমাকে বাবাকে তো বটেই, মদনকেও দুটো একটা না দিয়ে মা শান্তি পেত না, ভাত খেতে পারত না। চোখের ওপর তো দেখলাম মদন আমাদের বাড়িতে কাজে লাগতে না লাগতে মা আমার একটা ছেঁড়া হাফ-প্যান্ট সুন্দর করে সেলাই (ভাল বা ছেঁড়া বলতে আমারও অতিরিক্ত প্যান্ট ঐ একটাই ছিল) করে ওকে পরতে দিয়েছে। বাবা সামনের মাসে মাইনে পেলে মদনকে একটা গেঞ্জি কিনে দেবে মা এখন থেকেই বলে রাখছে। যদি মা অল্প ক'দিনের মধ্যে ওকে এতটা আদর যত্ন করতে আরম্ভ না করত তো মদনই কি মার এমন বাধ্য হয়ে পড়ত? মার মুখে শোনা, আমি স্কুলে চলে গেলে মদন সারাটা দুপুর মার কাছে বসে থাকে, কাগজ জেললে আমার ছোট বোনের দুধ-বার্লি গরম করে দেয়, হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে ছুটে গিয়ে উঠোনের দড়ি থেকে জামা-কাপড়গুলো তুলে ঘরে এনে রাখে—

'মিণ্টু আমার ছেলে, তুইও আমার ছলে।' আমি ক'দিন মাকে বলতে শুনেছি। শুনে ফ্যাকাসে ড্যাবড্যাবে চোখে মদন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসত।

পাঁচ দিনের মাথায় পেঁপে চারাটার আরো দুটো কুঁড়ি-পাতা দেখা গেল। সব মিলিয়ে ছ'টা ডাঁট, আর পুতুলের ছাতার মতো ছোট ছোট ছ'টা পাতা হয়েছে। 'এখন আর চারা না, রীতিমতো একটা গাছ বলা চলে', ভাবতাম আমি আর অবাক খুশী চোখে বাদলা হাওয়ার ছোট ছাতার মতন পাতাগুলোর কাঁপন দেখতাম। মদন ডুমুরের ডাল কেটে সুন্দর একটা বেড়া তৈরী করে দিয়েছে।

'আমি আরো কিছু চারা এনে পুঁতব', মদন বলত, 'আতা, করমচা, বাতাবি-নেবু, পেয়ারার চারা।'

'কোথা থেকে আনবি?' আমি বলতাম, 'পারবি জোগাড় করতে? বৌবাজারে এসব চারা পাওয়া যায় রথের মেলায়। এখন তো রথ শেষ হয়ে গেছে।'

'আরে ধেৎ, রথের মেলা—কিনে আনব নাকি—এমনি সব নিয়ে আসব।'

'কোথা থেকে শুনি?' উৎসাহে খোলা বই ফেলে রেখে আমি মদনের বিছানায় গিয়ে বসতাম। আমার পড়ার ঘরেই দুজনের শোবার জায়গা। পাশাপাশি বিছানা। বাবা মা খেয়ে ও-ঘরের দরজায় খিল এঁটে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ত। বেশ একটু রাত জেগে আমি পড়তাম। মদন আমার পড়া শুনতে শুনতে কোনদিন ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনদিন একটা দুটো কথা সুরু করে পরে গল্প জুড়ে দিয়েছে। বাবা মা শুনতে না পায় এমনভাবে নিচু গলায় দুজনে কথা বলতাম।

'তুই কি পেয়ারা করমচার চারা দেখে এসেছিস কোথাও?'

'আমি কি এ-পাড়ায় নতুন', মদন প্রশ্ন শুনে চাপা গলায় হাসত, 'কার বাড়িতে কোন্ গাছ আছে আমি সব জানি।'

'শুনি না কোথা থেকে করমচার চারা জোগাড় করবি?' আমি তখন মদনের বালিশে মাথা রেখে তার পাশে শুয়ে পড়েছি।

মদন আমার পেটের ওপর হাত রাখে, তারপর আমার কাছে মুখ এনে কথাটা বলে। শুনে আমি চুপ করে থাকি। একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলি, 'এমনি তো দেবে না ওরা, চুরি করে আনতে হবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো—চুরি করব। সুকুমারদের বাড়ির পিছনের পাঁচিল টপকে বাগানের সব ফল আর মুলের চারা নিয়ে আসব। যেগুলো আনতে পারা যাবে না, ভেঙে মুচড়ে নষ্ট করে রেখে আসব।'

উত্তেজনায় মদন তখন উঠে বসেছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'চুরি করে ওসব আনলে মা রাগ করবে।'

'মাকে বলতে গেছি নাকি চুরি করে এনেছি কি দেখিয়ে এনেছি?' মদন আমার পেটে চিমটি কাটল। 'রাত থাকতে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়ব, কেমন?'

আমি ঘাড় নাড়ি। কি ভেবে একটু পরে বলি, 'সুকুমারের ওপর তোর খুব রাগ, কেমন? ওর মা তোকে আর ও-বাড়ি রাখল না বলে?'

'বয়ে গেছে ও-বাড়ির কাজ করতে।' ভেংচি কেটে মদন আমার কথার উত্তর দেয়। একটু চুপ থেকে পরে: 'রাগ থাকবে না? রোজ ইস্কুলে যাবার সময় সুকুমার পায়ের জুতোটা বাড়িয়ে দিয়ে বলত, বুরুশ করে দে। লাটসাহেবের ছেলের জুতো বুরুশ করতে করতে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে যেত—আর আজ কিনা বলে এখানে তোর সুবিধে হবে না, অন্য বাড়িতে কাজ পাস কিনা দ্যাখ্ গে।'

'সুকুমারও বলেছে এ-কথা?'

'তবে!'

যেন মদনের চোখে জল এসে পড়েছিল। আলো নিভিয়ে শুয়ে শুয়ে সেদিন সুকুমারের চেহারাটা মনে করছিলাম। ব্যারিস্টারের ছেলে। ভাল জামা-জুতো পরে স্কুলে আসে। আমার সহপাঠী। কিন্তু তা হলে হবে কি—সুকুমার আমার সঙ্গে ভাল ক'রে মিশবে দূরে থাক, কথাই বলে না। আমার সঙ্গে না হাবুলের সঙ্গে না সনাতনের সঙ্গে না। ওর বন্ধু অংশু অনুপম নীহার। ওরা বড়লোক, আমরা গরিব। আমরা খালি পায়ে স্কুলে আসি, আমাদের জামা প্যাণ্ট ময়লা ছেঁড়া—

ভাল হবে খুব ভাল হবে। মদনের প্রস্তাবটা মাথায় ঘুরছিল। ওদের বাগানের সব ফলের গাছ ফুলের গাছ যদি ছিঁড়ে ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দেয়া যায় বেশ হয়।

অন্ধকারে একসময় মদন আমার কানের কাছে মুখ সরিয়ে আনে।

'ঘুমিয়ে পড়লি?'

'না।'

'সুকুমারের বাবা রোজ বাড়িতে মদ খায়।'

'ধেৎ!' আমি অল্প হাসলাম।

'হ্যাঁ রে—ওদের টাকা পয়সা থাকবে না। গাড়ি-বাড়ি সব বিক্রি হয়ে যাবে।' মদন থমথমে গলায় বলল, 'ওরা যদি আমাদের মতন গরিব হয়ে যায় তবে খুব মজা হয়, কেমন না?'

অন্ধকারে মাথা নেড়ে আমি উত্তর করলাম, 'তা হয় বটে।'

দুদিন আমরা চেষ্টা করলাম। কিন্তু দুদিনই ব্যর্থ হলাম। শেষ রাত্তিরের অন্ধকারে টিপটিপে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমরা সুকুমারদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি কি অমনি মোটা লাঠি বাগিয়ে বাগানের মালী আমাদের তাড়া করেছে। আর সুকুমারদের কুকুরটা! বাঘের মতন লাফিয়ে মদনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোনরকমে ছুটে পালিয়ে এসেছি।

'কত বড় এক একটা পেয়ারা, দেখলি তো!' বাড়ি ফিরে মদন আফসোসের গলায় বলত, 'একবার যদি পাঁচিলের ওপর উঠতে পারতাম, পাঁচ-সাতটা পেয়ারা আনা যেত।'

'থাক গে—শেষে ধরা-টরা পড়ে—' আমি মদনকে সান্ত্বনা দিতাম। কিন্তু মদন চুপ থেকে যেন ও-বাড়ির বাগানের ডাঁশা পেয়ারাগুলোর কথা ভাবত। নর্দমার পাশে একটা মাধবীলতার চারা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। পেঁপে গাছের গুঁড়ি থেকে আধ হাত দূরে সরিয়ে চারাটা পুঁতলাম। মদনকে বললাম, 'তুই দু মগ জল এনে ঢেলে দে। আমি একটা বাঁশের কঞ্চি কোথাও পাই কিনা দেখি। লতাটা তরতর করে বেয়ে উঠবে।'

বাঁশের কঞ্চি নিয়ে যখন ফিরে এলাম, দেখলাম মদন তেমনি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। কি ভাবছে। ওদিকে মা মদনকে ডাকছে কয়লা ভেঙে দিতে। মদন নড়ছে না, সাড়া দিচ্ছে না। এক-পা এক-পা করে মা রান্নাঘরের পিছনে চলে আসে। 'বেলা হয়েছে, উনন ধরাতে হবে—তোরা কি কেবল বাগানের পিছনে লেগে থাকবি।' কিন্তু মার কথা শুনে মদন মুখ তুলল না। 'তোর কি হয়েছে, ভূতে পেয়েছে?' মা হাসে।

হুট্ করে আমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম মদন অসন্তুষ্ট হল আমার কথা শুনে। আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল একবার।

শুনে মা হাসছিল : 'ছিঃ, পরের জিনিসের ওপর লোভ করতে নেই। এমন একটা খুব ভাল জিনিস না পেয়ারা।'

তারপরও মদন মুখ নিচু করে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। উঠোনে বাবার খড়মের শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে মার কয়লা ভাঙতে গেছে।

না, পেয়ারা না, ভাবছিল সে ভূষণের কথা। সুকুমারদের বাগানের মালী। 'ওর সেবার জ্বর হয়েছিল, আমি নিজের হাতে কয়লা ভেঙে উনন সাজিয়ে ওর উনন ধরিয়ে দিলাম, সাগু জ্বাল দিয়ে দিলাম। আর আজ শালা আমায় লাঠি নিয়ে তেড়ে মারতে আসে!'

আমি হাসি : 'তুই তো আর এখন ওদের চাকর নস—ও-বাড়ির কেউ না তুই—কাজেই।'

'বটে!' দাঁত কিড়মিড়িয়ে মদন ভেংচি কাটে। 'ওই শালা—ভূষণের মাথাটা আমি ইঁট মেরে ভেঙে দেব।'

'না না ওসব করতে যাবিনে—খামকা একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি।' আমি মদনকে বুঝিয়ে বললাম, 'জানতে পারলে বাবা রাগ করবে। বাবা গণ্ডগোল পছন্দ করে না। সাদাসিধে মানুষ, নিরিবিলি থাকতে চায়।' বলে আমি স্কুলে চলে গেলাম। কিন্তু মদন আমার কথা শুনল কি? যেন ও-বাড়ির ওপর তার আক্রোশের আর শেষ ছিল না। হ্যাঁ, তখন বিকেল, বেশ জোরে বৃষ্টি হয়ে গেছে দুপুরে,—রাস্তায় জল জমেছে। আমরা স্কুল থেকে ফিরছি। আমি

হাবুল সনাতন পিছনে হাঁটছি। আগে আগে চলেছে সুকুমার আর তার বন্ধুরা। হঠাৎ দেখলাম—বিপরীত দিক থেকে আমাদের মদন সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। সম্ভবত মা মুদি-দোকানে কিছু কিনতে পাঠিয়েছে ওকে। মদন নিশ্চয় সুকুমারদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে হাবুলের সঙ্গে দু-একটা কথা বলে তবে দোকানের দিকে যাবে। চিন্তা করলাম। কিন্তু চিন্তা করবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। ইচ্ছা করেই মদন এটা করল সবাই বুঝল। পা দিয়ে রাস্তার জল ছিটিয়ে সুকুমারের সাদা ধবধবে সাটিনের শার্ট প্যান্ট নোংরা করে দিয়ে মদন ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু যাবে কোথায়। সুকুমারকে দেখেশুনে বাড়ি নিয়ে যেতে একটু দূরে দূরে যে ভূষণ মালীও হাঁটছিল মদন নিশ্চয় দেখতে পায়নি। ছুটে গিয়ে ভূষণ মদনকে ধরে ফেলল। সুকুমার আর তার বন্ধুরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মদনকে হিড় হিড় করে ভূষণ সুকুমারদের বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি আর আমার বন্ধুরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখলাম।

কথাটা মা শুনল। আফিস থেকে ফিরে বাবা শুনল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। তারপর রাত। রাত আটটা পর্যন্ত বাবা আমাদের বাড়ির সামনে বড় কাঁটাল গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে ছিল।

বাবা একসময় ঘরে ফিরতে মা বলল, 'তুমি কি একবার যাবে, ও বাড়ি? নিশ্চয় ছেলেটাকে বেঁধেটেঁধে রেখেছে। এখন পর্যন্ত ফেরার নাম নেই।'

'রাখুক বেঁধে।' বাবা গম্ভীর গলায় বলল, 'যেমন কর্ম করেছে তার ফল ভোগ করুক। কেন হারামজাদা কাদা ছিটোতে গেল।'

'আহা, ছেলেমানুষ, না হয় একটা অপরাধ করেছে,—আর কী তেমন অপরাধ। হয়তো ছুটে যাচ্ছিল বলে—'

আমি মার কথায় সায় দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাবা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়ল।

'বড়মানুষের বাড়ি গিয়ে আমার চাকরের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার—আমারও সম্মানে বাধে। ওদের কাছে ওরা বড়—কিন্তু আমিও শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। আমিও—' বুঝলাম মদনকে একটা রাত অবধি আটকে রাখা হয়েছে বলে ভিতরে ভিতরে বাবা খুব উত্তেজিত ক্ষুব্ধ হয়ে আছে।

মা আর কথা বলল না। কাজকর্ম একলা হাতেই সব সারতে লাগল। বাবা বারান্দার অন্ধকারে বসে তামাক খাচ্ছিল আর ভাবছিল। আর আমি হ্যারিকেনের সামনে বই খুলে মদনের বিছানা, দেওয়ালের হুকে ঝোলানো তার তালিমারা ময়লা হাফ-প্যান্ট ও শার্টটা দেখছিলাম। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল।

সত্যিই মদন সে রাত্রে আর এল না।

সকালে চা খেতে খেতে বাবা ও মা ঠিক করল আমাকে একবার ও-বাড়ি পাঠানো হবে মদনের খোঁজ নিতে।

মা বলল, 'ময়লা প্যাণ্ট ছেড়ে ধোয়া প্যাণ্টটা পরে নে।'

বাবা বলল, 'অন্য কারো সঙ্গে কথা-টথা বলে লাভ নেই—কেবল সতীশবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবি মদন কাল বাড়ি ফেরেনি কেন। শুধু জেনে আসবি। আর কিছু বলতে হবে না।'

'জিজ্ঞেস করলে বলবি বাবা পাঠিয়েছে।'

'না না না।' মার কথায় বাবা আবার প্রতিবাদ করে উঠল। 'বলবি মা পাঠিয়েছে। আমি কেন! আমি এ-ব্যাপারে নেই। হয়তো ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে কি গেছে। কিন্তু বাড়ির কর্তা—মানে পুরুষমানুষ খোঁজখবর নিচ্ছে জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার অন্যরকম হয়ে দাঁড়াবে, জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মেয়েমানুষের মধ্যেই থাক এটা—বুঝলে না? সেজন্যেই তো আমি মিণ্টুকে সুকুমারের মার কাছে পাঠাচ্ছি।'

অল্প হেসে মা বলল, 'আচ্ছা।'

মানে, বাবা রাগ দুঃখ দুশ্চিন্তা অভিমান—মনে মনে যা-ই পোষণ করুক না কেন, বাইরে সব বিষয়ে নিরিবিলি মুক্ত থাকতে চায়। মদনের ব্যাপারে আর একবার তা প্রমাণ হয়ে গেল, বুঝে মা আর উচ্চবাচ্য করল না।

কেবল আমি যখন ঘর থেকে বেরোচ্ছি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মা—চিরুনি দিয়ে আমার মাথার চুলটা ঠিক করে দিল। বলল, 'সুকুমারের সঙ্গে কথা-টথা বলে কাজ নেই—কি বলতে কি বলে দিলে তুই আবার ঝগড়া-টগড়া বাধিয়ে আসবি।'

আমি বললাম, 'না, বলব না।'

বাড়ির ভিতরে ঢুকতে হল না। সুকুমারদের গেট্-এর সামনে শিউলী গাছের তলায় আমি থমকে দাঁড়াই। মদনকে পেয়ে গেলাম। কিন্তু মদন খুব ব্যস্ত। বালতি করে ভিতরের চৌবাচ্চা থেকে জল বয়ে আনছে। সুকুমারদের গাড়ি ধোয়ানো হচ্ছে। ভূষণ গাড়ি ধোয়াচ্ছে। ড্রাইভার হারাণ দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করছে। বেশ বড় বালতি। গাড়ির ফুটবোর্ডের কাছে বালতিটা নামিয়ে রেখে মদন হাঁপায়। তারপর আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, ও ফিক্ করে হাসে।

'আমি এ বাড়ির কাজে লেগে গেছি।'

'কবে থেকে?' বেশ আস্তে বললাম।

'ওই কাল বিকেল থেকেই।' হলদে দাঁত ক'টা বার করে মদন তেমনি হাসতে থাকে, 'আমায় কিছু বলল না গিন্নীমা—বরং ভূষণাকে গালমন্দ করেছে। ছেলেমানুষ ছুটতে গিয়ে জল ছিটিয়েছে—তা বলে—'

আমি ফিরে আসছিলাম!

মদন বলল, 'শোন্। তোর মাকে বলবি, আর আমি তোদের বাড়ির কাজ

করব না। এখানে লেগে গেছি। গিন্নীমা কাল রাতে বলল ওরা গরিব মানুষ। নিজেদেরই চলে না, তো ও-বাড়িতে তুই থাকবি কি।'

আমি ফিরে এলাম।

মা শুনল। বাবা শুনল।

শুনে তারা একটা কথাও বলল না।

আমি মুখ ভার করে রান্নাঘরের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পেঁপে গাছে আরও দুটো নতুন পাতা মেলেছে। মদনের হাতের তৈরী ডুমুরের ডালের বেড়াটা দেখছিলাম। কিন্তু আমি কি তখন জানতাম, মদন গেছে—আমার পেঁপে চারাটাও আর থাকবে না।

তিন দিন পর শেষ রাত্রে আবার জোর বর্ষা নামল। সে কী বৃষ্টি! যেন জল ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু থাকবে না। কতক্ষণ আর ঘরে আটক থাকা যায়। সেই অন্ধকার থাকতে জেগে বিছানায় বসে ছিলাম। হ্যাঁ, তখন বেলা আটটা সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। বৃষ্টির জোরটা একটু কমেছে কি আমি হুট্ করে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে সোজা রান্নাঘরের পিছনে চলে গেলাম। আমার বাগানের অবস্থা কি হয়েছে দেখতে ভীষণ মন কেমন করছিল। কেননা উঠোনে জল জমেছে। রান্নাঘরের পিছনটা ঢালু। সেখানে কত জল দাঁড়াল, পেঁপেগাছ মাধবী-চারা ডুবে গেল কিনা এবং যদি তা-ই হয়, জলটা সরাবার কি ব্যবস্থা করা যায় ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে আমি বৃষ্টি মাথায় করে ডুমুরতলায় ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বাগানের চেহারা দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পেঁপে চারাটা নেই। মাধবী-লতাটা জলে কাদায় লুটোপুটি খাচ্ছে। ডুমুরের ডালের বেড়াটা ভেঙে তছনছ হয়ে আছে। আমার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হল। বারান্দা থেকে মা ডাকছিল, বাবা ডাকছিল : 'ভিজিস্‌নে, জ্বর হবে, চলে আয়, চলে আয়।'

'আমার পেঁপে গাছটা নেই।' চিৎকার করে উঠলাম।

'জলে ভাসিয়ে নিল কি?' মা বলল, 'উঠোনের সব জল তো নদীর স্রোত হয়ে ঘরের পিছনে ছুটছিল—'

'বেড়া ভেঙে গেছে। যেন কে ভেঙে দিয়ে গেল।' বলতে বলতে আমি বাগান ছেড়ে ঘরের পৈঠায় উঠে এলাম।

'তাই বলো, বেড়াও ভাঙা, পেঁপে চারাও নেই।' বাবা গম্ভীর হয়ে মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে, আমার দিকে না মার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই হারামজাদা গরুটা নিয়ে গেছে। শেষ রাত্তিরে একটা খচখচ শব্দ শুনলাম না রান্নাঘরের পিছনে?'

'আমি শুনিনি শব্দ।' মা আমার দিকে মুখ ফিরাল, 'হবে হয়তো, যদি জলে ভাসিয়ে নিত এদিক ওদিক কোথাও থাকত তো, এতবড় গাছটা তো অদৃশ্য হয়ে যেত না। ঐ গরুর কর্ম।'

'একেবারে গোড়াসুদ্ধ খেয়ে গেছে। যেন উপড়ে তুলে সবটা গাছ মুখে নিয়ে সরে পড়েছে।' আমি কান্নার সুরে বললাম, 'একটা শেকড় পর্যন্ত রেখে যায়নি।'

মা চুপ করে রইল। বাবা আবার মুখে হুঁকো তুলল।

'কত যত্ন করে গাছের সবটা ঘিরে মদন ডুমুরের ডাল পুঁতে বেড়া করে দিয়েছিল—' যেন নিজের মনে বললাম আমি। শুনে মা একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। বাবা নির্বিকার। আমার ওই বাগানের সঙ্গে যে মদনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে মা তা স্বীকার করল। মার নিশ্বাস ফেলার শব্দে তা বুঝলাম। কিন্তু বাবা যেন কথাটাকে তেমন আমল দিচ্ছিল না।

'যা যা এখন পড়তে যা—সামনে পরীক্ষা।'

বাবার ধমক খেয়ে গাছের শোক বুকে পুষে এক-পা এক-পা করে পড়ার ঘরে চলে এলাম।

হ্যাঁ, তারপর ছ'মাস গেছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ। শীতের দুপুর। হঠাৎ আবার কি করে যে সুকুমারের সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল বলা শক্ত। আমার মনে হয় 'ডিটেকটিভ' গল্পের বইটা। আমার এক মামাতো ভাই বড়দিনের ছুটিতে বেড়াতে এসে বইটা আমাকে দিয়ে গেছে। কি করে কি করে যেন সুকুমার জানতে পেরেছিল। একদিন হুট্ করে গল্পের বই নিতে আমার পড়ার ঘরে এসে হাজির। একটু অবাক হলেও তৎক্ষণাৎ তাকে বইটা পড়তে দিলাম। তারপর আর কি। ও আমাদের বাড়িতে এল যখন আমাকেও ভদ্রতা রাখতে ওদের বাড়ি যেতে হল। এবং এটা সবাই স্বীকার করবে, দীর্ঘকাল ঝগড়াঝাঁটি চলার পর যখন ঐ বয়সের দুটি ছেলের মধ্যে ভাব হয় তখন তা দেখতে দেখতে বড় বেশি গাঢ় নিবিড় হয়ে ওঠে।

যেন সুকুমার আমাকে না দেখে থাকতে পারে না, আমি তাকে না দেখে শান্তি পাই না। ওর বাড়ির ঘরে বসে দুজন গল্প করি, ওদের প্রকাণ্ড ছাদে উঠে বেড়াই,—কখনো আমরা বাগানে নেমে যাই।

হ্যাঁ, বাগানের মতো বাগান বটে!

একধারে ফুলের গাছ, একধারে ফলের গাছ।

পাঁচিলের এ মাথা থেকে আরম্ভ করে ও-মাথা পর্যন্ত বাগানের আর শেষ নেই। কোন্‌টা কলমের চারা কোন্‌টা বীজের গাছ সুকুমার আমাকে আঙুল দিয়ে দিয়ে দেখায়।

তারপর দুজন একটা গাছের কাছে এসে দাঁড়াই। দীর্ঘ কাণ্ড লম্বা ডাঁট সতেজ সবুজ ছড়ানো পাতা নিয়ে একটা সুন্দর পেঁপে গাছ! ফলতে আরম্ভ

করেছে। 'ওটা এনে লাগিয়েছে মদন—আমাদের চাকর—এইটুকুন গাছ ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল!' সুকুমার বলছিল।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমি গাছটা দেখলাম। যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলাম। সুকুমার আমার হাত ধরে বলল, 'চল এখন ওপাশটা ঘুরে দেখা যাক।'

বাগান দেখা শেষ করে গল্প করতে করতে দুজন যখন সুকুমারদের বাঁধানো উঠোন পার হয়ে ওর বাড়ির ঘরের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম মদন চৌবাচ্চার ধারে বসে মাথা গুঁজে চায়ের কাপ প্লেট ধুচ্ছে। ও আমায় দেখতে পায়নি। যদি মুখ তুলে তাকাত আমি নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে নিতাম।

বাড়ি ফিরে কথাটা মাকে বললাম না।

আমার মনে যে কষ্ট লেগে রইল, মাকে আর তার ভাগ দিয়ে কি হবে ভেবে চুপ করে রইলাম।

কেবল চাকরি না, আমাদের রান্নাঘরের পিছনের ছায়ায় ঢাকা স্যাঁতসেঁতে জমির চেয়ে ও-বাড়ির রোদালো বিশাল বাগানের মাটি ওর কাছে প্রিয় হবে তাতে অবাক হবার কি আছে। কিন্তু অবাক লাগল নিজের কাছে, মদনের ওপর আমি এতটুকু রাগ করতে পারলাম না। কি, তারপর যখনই সুকুমারদের বাড়িতে গেছি আমি সরাসরি ছুটে গেছি ওদের বাগানে। সতেজ সবুজ যৌবনের লাবণ্যে মণ্ডিত দীর্ঘছত্র পেঁপে গাছটা আমাকে বড় বেশি টানতে লাগল। সকাল নেই বিকাল নেই সুকুমারের হাত ধরে পেঁপে গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি,—এদিকে সুকুমারের সঙ্গে গল্প করি—কিন্তু আমার চোখ ওদিকে—যেন গাছটাকে দেখে দেখে আর আশ মিটত না।

একদিন দুপুরবেলা গাছটা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বুকের ভিতর কেমন ভয় ঢুকল। মাঝখানে গল্প থামিয়ে আমি সুকুমারকে বললাম, 'চলি রে।'

'কেন?' একটু অবাক হয়ে ও আমাকে দেখছিল। কিন্তু ওর দিকে আর না তাকিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এলাম। তখনও বুকের ভয়টা ডেলা পাকিয়ে আমার গলার কাছে ঠেকে ছিল। মদন পেঁপে চারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল পেঁপে চারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে—কেবল মদনকে না, আমাকেও—না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন।

বাড়ি ফিরে মার পায়ের কাছে চুপ করে বসে রইলাম।

'কি হ'ল।' মা প্রশ্ন করছিল।

আমার চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছিল।

'কাঁদছিস কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা শুধোয়। আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে

িগয়ে ও-বাড়ির শাড়ি গয়না পরা প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য স‍ুকুমারের মার দিকে তাকিয়ে থাকতাম—আর কখন তিনি শাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও স‍ুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি ল‍ুকিয়ে থাকতাম—থাকতে আরম্ভ করেছি?

আর কোনোদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি।

নীলনেশা

বিমল মিত্র

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের শ্বশুরও রায়সাহেব। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। শ্বশুর-জামাই দুজনেই রায়সাহেব, এমন যোগাযোগ সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু শ্বশুর-জামাই দুজনের বহু দুর্ভাগ্যের ফলেই বুঝি এমন ঘটেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল পাটনায়।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সামান্য একজন সুপারভাইজার থেকে পদোন্নতি পেয়ে সুপারিন্‌টেন্ডেন্ট। সহরে এবং অফিসে বেশ প্রতিপত্তি তাঁর। সামনের সব ক'টা উন্নতির ধাপ চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। একটিমাত্র ছেলে, রূপসী স্ত্রী আর একটি সুন্দর অট্টালিকার মালিক। ব্যাঙ্কের টাকায়, স্বাস্থ্যের জৌলুসে, প্রতিপত্তির প্রসারে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বৃহস্পতি তখন তুঙ্গী-ই বলতে হবে।

সেই সময়ে সেই চৌদ্দ বছর আগে চাকরি খুইয়ে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মেয়ের কাছে এলেন। সঙ্গে আরো তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে। জ্যোটি, লোটি আর রুবি। জ্যোটি, লোটি আর রুবিকে নিয়ে মিলির বাড়িতে এলেন। মিলি বড় মেয়ে।

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় স্টেশনে গিয়েছিলেন মিলিকে নিয়ে। শ্বশুরকে চিনতেন। রাশ-ভারী, শৌখিন, সাহেবী মেজাজের লোক। সস্ত্রীক রিসিভ্ করতে না গেলে কী ভাববেন তিনি।

শীতকাল সেটা। তাঁর পেটেণ্ট স্যুট্, সাহেব-বাড়ির অভিজ্ঞ টেলারের তৈরি। হাতে স্টিক্। বাট্‌ন্-হোলে বোকে। মাথায় ফেল্ট-হ্যাট্—বাঁকানো। মুখে লম্বা চুরুট।

চায়ের টেবিলে মিলি বললে—তুমি তাহলে চাকরি ছেড়ে দিলে বাবা?

সেই সময়ে চৌদ্দ বছর আগে চাকরি ছেড়ে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জ্যোটি, লোটি, রুবির তখনও বিয়ে দিতে হবে। সারা জীবন মোটা মাইনে পেয়েছেন, আর দু'হাতে খরচ করেছেন। না করেছেন একটা বাড়ি, না জমিয়েছেন টাকা। কেবল লাঞ্চ, পার্টি আর স্যুট্।

মিলির কথার উত্তরে বললেন—চাকরি আর করবো না রে, মিলি—

তাহলে?...কথাটা বলতে গিয়ে বড় মেয়ের গলায় যেন আট্‌কে গেল।

—বাঃ, তা তোরা আছিস কী করতে?

বলে হাসতে হাসতে চুরুট ধরালেন একটা। তারপর বললেন—আমি বুড়ো বাপ সারা জীবন চাকরি করি, এইটেই তুই চাস নাকি?

কথাটা বলে মিলি, জ্যোটি, লোটি, রুবি, শেষ পর্যন্ত জামাই মৃত্যুঞ্জয়ের মুখের ওপর চোখ বুলালেন। কিন্তু কেউ হাসলে না দেখে নিজেই হো হো শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর চায়ে চুমুক দিয়েই বললেন—এ কী চা রে, মিলি? কত করে পাউন্ড? ফ্লেভার নেই তো তেমন—

আড়চোখে স্বামীর দিকে চেয়ে মিলি কুণ্ঠিত হয়ে বললে—কেন বাবা, এ তো দামী চা...

—তা হোক্‌গে দামী, আমার জিভে এ-চা চলবে না মা—

ঘাড় নাড়তে লাগলেন, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। সদ্য কলকাতা-ফেরত। পাটনার পাড়াগেঁয়ে মেয়ে জামাইকে ফ্যাশন শেখাবার অধিকার আছে বৈকি তাঁর।

—আর এ কাপ-ডিশ্‌ও চলবে না। আর কিছু না হোক চা-টা বাপু আমাকে দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনো, চা-টাই যদি পছন্দমতো না খেলুম তাহলে বেঁচে থেকে লাভ?

কিন্তু দেখা গেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির কিছু পছন্দ হওয়াই ভারি শক্ত।

—লুঙ্গি দিয়ে কখনও জানলা-দরজার পরদা হয়? মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি সবই পাটনাই টেস্ট—

—বাড়ি করেছ, কিন্তু ডাইনিং হল-এর স্ট্যান্ডার্ড সাইজ-ই জানো না—

—ড্রইংরুমে জর্জ দি ফিফ্‌থ-এর ছবি রেখেছ, কিন্তু কুইন মেরীর ছবিটা নেই পাশে—ইংরেজদের চরিত্রে এইটে পাবে না, এই সেন্স অব প্রোপোরশনের অভাব...

—আ...হ্যা...তোমাদের কিচেনের পোজিশনটাই ঠিক হয়নি, কিচেন হবে নর্থ-ঈস্ট কর্নারে—মৃত্যুঞ্জয়ের দেখছি......সুপারিনটেন্ডেণ্ট হলে কি হবে...

পরদিন থেকে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সংস্কারে লেগে গেলেন। জ্যোটি, লোটি আর রুবি আদেশ পালন করে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের গেট্-এ ট্যাবলেট লাগানো হলো। পালিশ করা সেগুন কাঠের বোর্ডের ওপর "রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি" লেখা। বিকেলবেলা ড্রেসিং গাউন পরে একবার বাগানে দাঁড়িয়ে দেখে এলেন। তারপর নিজের চুরুটের আর চায়ের ব্র্যান্ড লিখে চাকরকে বাজারে পাঠানো হলো। নতুন নেটের পরদা এল দরজা-জানলার জন্যে। মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে থেকে থেকে মিলি-টারও টেস্ট খারাপ হয়ে গেছে। মিলির টেস্ট, মৃত্যুঞ্জয়ের টেস্ট, সকলের টেস্ট বদলাবার চেষ্টায় লেগে পড়লেন জীবন পণ করে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। প্রথম দিনটি থেকে।

মিলি বললে—ওপরের দক্ষিণের ঘরটাতেই তোমার থাকবার ব্যবস্থা হলে বাবা—

বাড়ির শ্রেষ্ঠ ঘর সেটা।

ঘরখানা গোছানো হলো। রায়সাহেবের পছন্দমতো গোছানো হলো শোবার খাটের পাশে 'হোয়াট্‌নট'। চিঠি লেখবার টেবিল একটা জানলার দিকে মুখ করে। একটা ট্রিপয়। আর খাটের দিকে মুখ করে বসানো ড্রেসিং আলমারি। রায়সাহেব বললেন—লর্ড কিচেনারের বেডরুম এইরকম সিম্‌প্‌ল ছিল—

তখন কি মিলি জানতো, না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় জানতেন। কেউ জানতে না। জ্যোটি, লোটি, রুবিও জানতো না যে, চৌদ্দ বছর রায়সাহেব এ-বাড়িতে থাকবেন। শুধু থাকা নয়, সদম্ভে সগৌরবে থাকবেন মাথা উঁচু করে।

দেশী ইংরিজী একখানা দৈনিক পত্রিকা আসতো মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। তিনি বাতিল করে দিলেন। কুড়ি বছর 'হোয়াইটম্যানে' সহ-সম্পাদকের চাকরি করে এসেছেন। ওইটে চাই। 'হোয়াইটম্যান' আসতে লাগলো পরদিন থেকে।

চায়ের টেবিলে পরোটা বা ওমনি কিছু একটা হতো। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আপত্তি করলেন।

—তোদের এইটে ভারি খারাপ সিস্টেম মিলি, টেবিলে খাবি অথচ লুচি পরোটা, দু'তিন টাকা বেশি পড়ে বটে, কিন্তু বেকারীতে বলে রাখলেই রোজ সকালে কেক বা পেস্ট্রি দিয়ে যায়—কোনও হ্যাঙ্গাম নেই, কত পরিশ্রম বাঁচে,...

পরদিন থেকে তা-ই হলো। বাথরুমটা সাজানো গেল নতুন করে। বিলিতী টুথপেস্ট, বুরুশ, হেয়ার অয়েল আর সাবান। বাজারের শ্রেষ্ঠ জিনিস সব। টেবিলে উঠলো বিলিতী লেটার-প্যাড।

মিলির বাবা, মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুর। রায়সাহেব শ্বশুর। শৌখিন ইংরিজী-জানা পাকা সাহেব শ্বশুর। খাতিরের কোনও ত্রুটি রাখলেন না জামাই।

সেক্রেটারিয়েটের বন্ধুবান্ধব আসে বাড়িতে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দেন—ইনি আমার শ্বশুর, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি—

চুরুটটা মুখে লাগিয়েই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি মাথা নাড়েন। ভোরবেলা শার্টের গলায় টাই থাকে না, কেমন যেন খালি-গা খালি-গা মনে হয় তাঁর। বলেন—মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ যেবার বেঙ্গল গবর্নরের মিলিটারী সেক্রেটারি, সেইবার আমি রায়সাহেব হলুম—কিন্তু এখন রায়সাহেবিটাও ছ্যা ছ্যা হয়ে পড়ছে—রামা-শ্যামা, ডিক্‌-হ্যারি সবাই পাচ্ছে—কোনও ইজ্জত রইল না আর আমাদের—

তারপরেই প্রশ্নকর্তা যদি প্রশ্ন করেন তো ভালোই, না হলে নিজের রায়-সাহেব হওয়ার ইতিহাসটা নিজেকেই বলতে হয়—

'হোয়াইটম্যানে' আমার লীডার পড়েই তো প্রথম মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ চম্‌কে যায়, খাস বাচ্ছা কিনা, বিলিতী গুণের কদর করতে জানে—তারপর যখন শুনলে লিখেছে একজন বাঙালী আরো অবাক, একদিন নেমন্তন্ন করলে ডিনারে। বললে—বাঙালীর মধ্যেও যে জিনিয়স্‌ জন্মায় এটা তোমাকে দেখার আগে কল্পনাও করতে পারিনি মিস্টার ব্যানার্জি—ওয়েল্‌, তখনও আমি শুধু মিস্টার-ই ছিলাম কিনা—

তারপরেও যদি প্রশ্নকর্তা আগ্রহ না দেখান, তখন নিজেকেই বলতে হয়—

—আশ্চর্য হয়ে গেলেন মেজর যখন শুনলেন আমি একটা রায়সাহেবিও পাইনি। বললেন—ওয়েল, এটা আমারই কর্তব্য, দেখি আমি কী করতে পারি—

প্রশ্নকর্তা যদি তখন প্রশ্ন করেন—তারপর... ?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সে-প্রশ্নের উত্তর দেবেন না। চুরুটটাকে দাঁতে চেপে সেইখানে বসেই বহুদিন আগে শেখা মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থের সুরের অনুকরণ করে চীৎকার করবেন—মহারাজ—চা—

আগে হাতে করে চায়ের কাপ দেওয়া হতো। রায়সাহেব আসার পর ট্রের বন্দোবস্ত হয়েছে। বিকেলবেলা একটা পর্ব আছে রায়সাহেবের। সামান্য পর্ব নয়। ঝাড়া ঘণ্টাখানেক লাগে। তখন বেরোয় আলমারি থেকে নির্ভাজ স্যুট্‌গুলো। একটা একটা করে মিলি কিংবা জ্যোটি, লোটি, রুবি যে-কেউ নামিয়ে দেয়। যেটা কাল পরেছেন আজ সেটা পরতে নেই। সবগুলো বিছানার ওপর পর-পর বিছিয়ে দিতে হবে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একটা সেট্‌ বেছে নেবেন তারি মধ্যে থেকে। কোনো দিন ওয়ালনাটের স্টিক্‌, কোনো দিন অ্যাশ কাঠের। স্যুটের সঙ্গে যেন ম্যাচ করে। মাথায় লাইট নেভি-ব্লু ফেল্ট-হ্যাট্‌। আর ঝকঝকে চকচকে দাঁতে কামড়ানো চুরুট। পায়ে পেটেন্ট লেদারের শু। হাতের পাঁচটা আঙুলের মতন ওই চুরুটটা ছিল তাঁর শরীরের সঙ্গে একাত্ম। বাথরুমে যাবার সময়ও মুখে থাকতো চুরুট। মিলির মনে পড়ে না বাবাকে কখনও সে চুরুট ছাড়া দেখেছে। কোথাকার কোন্‌ লর্ড স্যালস্‌বারি নাকি মারা যাবার পর হিসেব করে দেখা হয়েছিল, জীবনে যত চুরুট তিনি খেয়েছেন তা জোড়া দিলে সাড়ে ছ' মাইল লম্বা হয়। তা ছাড়া চুরুট খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে! সেই লর্ড স্যালস্‌বারি বলেছিলেন—ইতিহাসে কোনও চুরুটখোরের আত্মহত্যার রেকর্ড নেই—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বলতেন—চুরুট খেতে শেখান আমাকে মিঃ অকিনলেক—এদিকে তো পণ্ডিত লোক, ইংরিজীর মাস্টার—ইংরিজী ভাষাটা গুলে খেয়েছিলেন—ওদিকে চুরুট খান আমার মতো—তাঁর কাছেই তো এই ইংরিজী বিদ্যেটা আর চুরুট খাওয়ার হাতেখড়ি আমার—

স্যুট্ পরে ছড়িটি ফেলতে ফেলতে যারা পাটনার রাস্তায় রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিকে হাঁটতে দেখেছে তারা জানে সেই মন্থর অথচ দ্রুত চালের মুভমেণ্ট। প্রতি পদে সেই ঈলাস্টিক স্টেপ্। দেখেই মনে হবে যেন বিরাট গাড়ি, বিরাট বাড়ি সবই আছে—সমাজে সংসারে যেন সুউচ্চ প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। শুধু স্বাস্থ্যের খাতিরে একটু পদচারণা করতে বেরিয়েছেন।

একমাস পরেই হতাশার সুর বেজে উঠলো।

—নারে মিলি, যা দেখলুম তোরা পাটনায় কী সুখেই আছিস—এতদিনের মধ্যে একটা ভদ্দরলোক নজরে পড়লো না—

পেস্ট্রির ডিশ্‌টা বাবার দিকে এগিয়ে দিয়ে চা ঢালতে ঢালতে মিলি বললে—কেন বাবা—ওই তো ই'য়েরা রয়েছেন, হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা রয়েছেন, সব ভাই ক'টা বি-এ পাস, তারপর মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ বিলেত ফেরত—তারপর নিউ-পাটনায় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট বাবুল মিত্তির এম-এ, চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্ট রণধীর চৌহান...

—আরে ছি ছি—ওদের তুই বলিস ভদ্দরলোক?

চায়ের কাপটা ঠোঁটে তুলতে গিয়ে একটা 'শ্রাগ্' করলেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি।

—কেউ ইংরিজীর 'ই' জানে না, হোয়াইটম্যান পড়ে না—আবার পলিটিক্স নিয়ে তর্ক করতে আসে, ইংরিজী জানা লোক গোটা ভারতবর্ষেই তো আছে মাত্র আড়াইটে, একটা তোদের গান্ধী, একটা টেগোর আর আধখানা...

আধখানা যে কে তা আর বলা হলো না। হঠাৎ যেন স্বগতোক্তির সুরেই রায়সাহেব বললেন—ইংরিজীটা কি অত সহজ রে......তা যদি হতো...এই দ্যাখ্‌না আজকের হোয়াইটম্যানেই তো চারটে ইংরিজীর ভুল ধরেছি...

ইংরিজী ভাষাটাই জানতেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। তিনি নিজেই একদিন বলেছেন—কেমন করে শিখলেন বিদ্যেটা। ওটা বড় অদ্ভুত ভাষা নাকি। ভাবতে হয়, পড়তে হয়, লিখতে হয়, স্বপ্ন দেখতে হয়—অনেকের আবার তাতেও হয় না। ওটা অনেকটা কবি হওয়ার মতো। সবাই কি চেষ্টা করলেই কবি হতে পারে? তেমনি সবাই চেষ্টা করলেও ইংরিজী শিখতে পারে না। ওটা একটা ভগবান-দত্ত ক্ষমতা। না হলে তো রামা-শ্যামা টম-ডিক্-হ্যারি সবাই শিখে ফেলে বসে থাকতো। ইংরিজীটা কি অত সহজ রে!

কথাগুলো অনেকটা ধমকের মতো। না জেনে মিলি তার বাবাকে অন্য সকলের সঙ্গে সমান পর্যায়ে নামিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বড় শিশুর মতো সরল মন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। কিছু মনে রাখেন না। বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ পরের দিন মিলি নিজে বাজারে গিয়ে বাবার পছন্দ-করা চুরুট আর-এক বাক্স আনিয়ে দিলে।

কিন্তু হোয়াইটম্যানের কুড়ি বছরের চাকরিটা যাওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে।

যাঁর ধ্যান জ্ঞান স্বপ্নই হলো ইংরিজী, ইংরিজীর ভুল তিনি সইবেন কেমন করে! ভুল দেখলে সইতে পারতেন না, তা সে স্বয়ং এডিটরেরই হোক, আর নিজেরই হোক। একবার নিজেরই একটা ভুল ধরা পড়লো। উঃ, সে কী আত্মগ্লানি! ছাপার অক্ষরেও বেরিয়ে গেল সেটা। সাধারণ পাঠকরা কেউই ধরতে পারলে না বটে, এডিটরও পারেনি। কিন্তু যে-টা ভুল সেটা তো ভুল-ই। কেউ ধরতে পারুক আর না পারুক। নিজেকে তিনি ক্ষমা করবেন কী করে? নিজের কাছে কী কৈফিয়ত দেবেন তিনি?

গল্প হচ্ছিল ডিনার খেতে খেতে।

জ্যোটি, লোটি, রুবি আর মিলি। আর ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিন্টেন্ডেন্ট। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন—তারপর?

মিলিও চচ্চড়ির ডাঁটা চিবোনো থামিয়ে বললে—তারপর কী করলে, বাবা?

সুপের চামচেটা মুখ থেকে নামিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে দু'টো ঠোঁট মুছে নিলেন। তারপর আধখাওয়া চুরুটটা মুখে দিয়ে আবার ধোঁয়া ছাড়লেন লম্বা করে। বললেন—ঠিক করলাম আত্মহত্যা করবো, আত্মহত্যাই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! বোঝো, আমরা সে-যুগে কতখানি জীবন দিয়ে ভালোবাসতুম ইংরিজী ভাষাকে—যাক্‌গে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করা হলো না—

চমকে উঠেছে মিলি। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নিজের মনেই নিঃশব্দে খেতে লাগলেন।

ছোট মেয়ে রুবি আর চাপতে পারলে না কৌতূহল। বললে—কেন বাবা? ধরা পড়ে গেলে বুঝি?

চুরুটটা টানতে-টানতে থেমে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—এই চুরুট-ই আমায় বাঁচিয়ে দিলে শেষ পর্যন্ত, লর্ড স্যলস্‌বারির কথা মনে পড়লো—কোনও চুরুটখোর আত্মহত্যা করেছে ইতিহাসে এমন ঘটনা তো পাওয়া যায় না—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি এক স্লাইস রুটি ছুরি দিয়ে কাটতে লাগলেন।

—তারপর এল ডানকান সাহেব। স্কচের বাচ্ছা। জাঁদরেল লোক। কিন্তু ইংরিজী ভুল। ধরলাম একদিন। অতি সাধারণ ভুল। সাহেবের হাতে অমন ভুল বড় একটা দেখা যায় না। তর্ক হলো। এডিটর বলে ঠিক—অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে ভুল।...

রায়সাহেব রুটি কামড়ালেন। তারপর বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে মাংস তুলে মুখে পুরলেন—

—দিলাম চাকরি ছেড়ে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখনও রায়সাহেব হননি। বললেন—এই সামান্য কারণে চাকরি ছেড়ে দিলেন আপনি?

—একে তুমি সামান্য বলছ, মৃত্যুঞ্জয়?

যেটা সত্যি কথা সেটা ডানকান সাহেব জানুক। আর কারুর জানবার দরকার নেই। সেই সামান্য কারণে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সাতশো টাকার চাকরি ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে, জ্যোটি লোটি আর রুবিকে নিয়ে এখানে চলে এলেন। মিলির বাড়িতে। নাই বা থাকলো টাকা, সাতশো টাকার মাইনের চাকরি। মিলি আছে, মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়—পাটনা সেক্রেটারিয়েটের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আছে। জ্যোটি, লোটি, রুবির বিয়ে মিলি-ই দেবে। তাঁর ডিনার, কেক, পেস্ট্রি, চুরুট, চা, স্যুটের খরচ মিলিই দেবে।

এ সবই চোদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

সেই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় বাসী মুখে বেড্-টি খাওয়া। তারপর ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চড়িয়ে চুরুট ধরানো। 'হোয়াট্‌নট' থেকে হোয়াইটম্যান নিয়ে পড়া। পায়জামাপরা পা দু'টো হোয়াট্-নট-এর গায়ে লাগিয়ে দেওয়া আর কাগজ পড়া। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে পড়া। হাতের ফাউন্‌টেন পেন দিয়ে মার্জিনে দাগ দেওয়া। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে তা দাগিয়ে দেওয়া। এই কাজেই লাগে দু'ঘণ্টা। এ-সময়ে রায়সাহেবকে পৃথিবী ভুলে যেতে হয়। এই দু'ঘণ্টা তিনি অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে ছোট ছোট অক্ষরের সমুদ্রে ডুবে যান।

তারপর পড়া, ভাবা, দাগ দেওয়া যখন শেষ হয় তখন লেটার-প্যাড নিয়ে লেখবার টেবিলে গিয়ে বসেন। চিঠি লিখতে বসেন। লম্বা শুদ্ধ ইংরিজীর চিঠি। হোয়াইটম্যানের সম্পাদকের নামে। কুড়ি বছর হোয়াইটম্যানের চাকরি করে এসেছেন, লেখার প্রুফ দেখেছেন। এ-কাজে তিনি অভ্যস্ত। সিদ্ধহস্ত বলা চলে। সেই অভিজ্ঞ কলম নিয়ে লিখে চলেন। চিঠির আকারে জানিয়ে দেন সম্পাদককে কোথায় সেদিনকার কাগজের সম্পাদকীয়তে ছাপার ভুল, নয়তো ইংরিজীর ত্রুটি। বিস্তারিত সমস্ত আলোচনা। মতবাদ নিয়ে, কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নিয়ে, বিজ্ঞাপন নিয়ে, কাগজের প্রচার নিয়ে। কাগজের একজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতো ডাক-খরচা দিয়ে চোদ্দ বছর ধরে দিনের পর দিন এমনি সমালোচনা। মৌখিক নয়, লিখিত। এ যেমন বিস্ময়কর তেমনি কৌতুকজনক।

তারপর সেই চিঠি ডাকে দিয়ে আসা। যে-সে গেলে চলবে না। মহারাজকে নিজের রান্না ফেলে চিঠি ফেলে আসতে হবে। একমাত্র বিশ্বাসী লোক সে-ই। চীৎকার করে ডাকবেন—মহারাজ—

রায়সাহেবের মেজাজী গলার আওয়াজে সমস্ত বাড়ির ঘরগুলো গমগম করে ওঠে। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় তখন অফিসে যাবেন। ঠাকুর চাকর সবাই ব্যস্ত।

মিলিও ব্যস্ত স্বামীর তদারকে। হাতের কাছে গুছিয়ে দিতে হবে জামা, কাপড়, গেঞ্জি, রুমাল, চাবি—সমস্ত। সেই ব্যস্ত আবহাওয়ায় মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও ডাকলেন—মহারাজ—

মিলি বললে—মহারাজ নেই—

—কোথায় যায় অফিসে যাবার সময়?

মিলি বলে—বাবা পাঠিয়েছেন ডাকের চিঠি ফেলতে—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি নিজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং মহারাজের কোনও দোষ নেই। কিন্তু এখন তিনি অফিসে যাচ্ছেন, তিনি এ-বাড়ির মনিব, তিনি অফিসে চলে যাবার পরই চিঠি ফেলতে পাঠালে হতো! কিছু বললেন না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু যেন কেমন বিরক্ত হলেন, অন্তত স্বামীর মুখ দেখে মিলির তাই মনে হলো।

আর একদিনের ঘটনা। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ড্রেসিং গাউন পরে বারান্দায় পায়চারি করছিলেন চুরুট মুখে। যেমন সচরাচর করে থাকেন।

একটা চাকর এধার থেকে ওধারে যাচ্ছিল ঘর ঝাঁট দিতে। ডাকলেন তাকে।

—এই, শোন্—

চাকরটা সামনে এল বেকুবের মতো।

বললেন—গায়ে জামা দিস না কেন?

মিলিকে ডেকে আনালেন। বললেন—তোদের এ কী সিস্টেম? চাকর-বাকর উর্দি না পরুক, খালি গায়ে থাকে কেন? একটা গেঞ্জি জোটে না—

সেই সময়ে একদিন পয়লা জানুয়ারি তারিখে খবর বেরুল মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রায়সাহেব হয়েছেন। শ্বশুর রায়সাহেবই ছিলেন, এবার জামাইও রায়সাহেব হলেন। বাড়ির গেট্-এ আর একটা ট্যাবলেট ঝোলবার কথা। কিন্তু কেন জানি না মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় রাজী হলেন না।

সেদিন সকালেও রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি কাগজের উপাধির তালিকাটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়লেন। দেখলেন কার কার প্রমোশন হলো। নতুন কে কে জাতে উঠলো। খাবার টেবিলে বসে বললেন—এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়...... আমার সময় মনে আছে, টেলিগ্রাম এসেছিল দেড় শো, আর চিঠি বোধহয় শ' তিনেক......কয়েকটা কাগজে ফোটোও বেরিয়েছিল—চাকরিটা রেগে ছেড়ে না দিলে রায়বাহাদুরও হয়ে যেতাম......কিন্তু তোমার বেলায় এ কী রকম হলো মৃত্যুঞ্জয়......আজকালকার লোক গুণের কদর করতে কি ভুলে যাচ্ছে......

মিলিকে বললেন—তোকে বলেছিলুম মিলি তোদের এখেনে একটা ভদ্দর-লোক নেই—দেখলি তো, মৃত্যুঞ্জয়কে একটা পার্টি পর্যন্ত কেউ দিলে না...... আমার মনে আছে মেজর উইন্‌স্‌ফোর্থ...

এ সবই চৌদ্দ বছর আগেকার ঘটনা।

তারপর চৌদ্দ বছরের প্রাত্যহিকতায় দৃশ্যপটের কতই না পরিবর্তন হয়ে গেল। মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বরাবর কম কথার মানুষ ছিলেন, কথা কওয়া আরো কমিয়ে দিয়েছেন।

শ্বশুর জামাইবাড়িতে বেড়াতে এসেই থাকে, কিন্তু এমন বরাবরের মতো বে-আক্কেলে হয়ে যে থেকে যাবেন এ-কথা কে জানতো।

একে একে জ্যোটি, লোটি এবং শেষ পর্যন্ত রুবির বিয়েটাও দিলেন জামাই। প্রত্যেক বিয়েতে মোটা রকমের খরচ করতে হলো। নইলে পাটনার সমাজে মান থাকে না। সকলের বিয়ে দিলেন জাঁকজমক করে। আর তা ছাড়া টাকা খরচের প্রশ্নটাই তো বড় নয়, মেহনত কী কম!

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কিছু দেনা করতে হলো। মিলির গায়ের গয়না কিছু ভাঙতে হলো। টাউনের বাইরে কিছু খোলা জমি কেনা ছিল মিলির নামে, সেটা সস্তা দরে ছেড়ে দিতে হলো। উপ্রি উপ্রি তিনটি মেয়ের বিয়ে দেওয়া সামান্য কথা নয়। তবু রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় সেই অসাধ্যই সাধন করলেন। একটিমাত্র ছেলে ছোটবেলা থেকে দেরাদুনে থেকে পড়তো। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করার পর কলেজে পড়ছে সেখানে, সুতরাং খরচ পাঠানোও বেড়েছে।

এত কাণ্ড ঘটছে, এত দৃশ্যপট বদলাচ্ছে, কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তাঁর সেই উঁচু চূড়ো থেকে একচুল নড়েন নি। সংসারের দৈনন্দিন সচ্ছলতা অসচ্ছলতার কথা যেন তাঁর জানবার কথা নয়। তিনি যে একজন ব্যয়বহুল গলগ্রহ সে-কথা ভাববার বা বোঝবার তাঁর অবসরই নেই। জামাইকে মেয়ে দিয়েছেন বলে শ্বশুরকে ভরণ-পোষণ করাও যেন জামাইয়েরই অন্যতম কর্তব্য। আর তা ছাড়া তিনি তো এ-সংসারের একজন গর্বের ও গৌরবের পাত্র। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি তিনি, চালচলনে বলনে নামধাম-পরিচয়ে যে-কোনও জামাই-ই গৌরবান্বিত বোধ করবে। নিয়ে আসুক না মৃত্যুঞ্জয় দশটা নাইট, বিশটা রায়বাহাদুরকে এ-বাড়িতে, দেখাই যাক না তারা মোহিত বিগলিত হয় কিনা রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির আদব-কায়দায় কেতা-দুরুস্ত ব্যবহারে, ঈর্ষান্বিত হয় কিনা মৃত্যুঞ্জয়ের শ্বশুরসৌভাগ্যে! বিলেতে তিনি যাননি সত্যি, কিন্তু অন্তত দু'শো লোক তো তাঁর কাছে বিলেত যাবার আগে আদব-কায়দা শিখে নিতে এসেছে। কাঁটা-চামচ থেকে সুরু করে ডিনার, ড্রয়িংরুম, বাথ, বো, স্যুট্—হাই সোসাইটির সমস্ত রকম খুঁটিনাটি।

তা সেদিন চা মুখে দিয়েই কাপ নামিয়ে নিলেন রায়সাহেব।

—মিলি, ছি ছি, তোদের টেস্ট দিন-কে-দিন কী যে হচ্ছে—

মিলি কিছু উত্তর করলে না। মিলি ভালো করেই জানে এ-চা বাবা মুখে

তুলবেন না, তবু চুপ করে রইলো সে। একটু কম দাম। একটু ফ্লেভার কম। কিন্তু সব দিক ভেবেই তো চলা উচিত। উনি বলেছেন—এত দামী চা কি না-হলেই চলে না? তোমার বাবাকে তো পয়সা আয় করতে হয় না, যাকে করতে হয় সে বোঝে।

কথাগুলো তো একেবারে মিথ্যেও নয়। মিলি দেখলে বাবা চা ছুঁলেন না। বললেন—এ নিশ্চয়ই মহারাজের ভুল হয়েছে রে, কিংবা ওকে ঠকিয়ে দিয়েছে—তুই একটা স্লিপ লিখে পাঠা এখুনি—পাঠা তুই...প্রমাণ হয়ে যাক—পয়সা দিয়ে কেন খারাপ জিনিস খাবো—বল্?

বাবাকে চিনতো মিলি।

শেষ পর্যন্ত লিখতে হলো স্লিপ। স্লিপ লিখে মহারাজের হাতে দিতে যাচ্ছিল—

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—আর ওই সঙ্গে আমার সেই চুরুটের কথাটা লিখে দে না, এ মাসে হঠাৎ ওই খারাপ চুরুটটা যে কেন আনালি—জানিস তো আমি চল্লিশ বছর ধরে ওই এক ব্র্যান্ড খেয়ে আসছি...

শেষ পর্যন্ত মহারাজকে দিয়ে ভালো চা আর চুরুটের ফরমাস দিতেই হলো। কিন্তু বার বার কাল রাত্রের কথা মনে পড়তে লাগলো মিলির। স্বামী শেষ পর্যন্ত অধৈর্য হয়েই বলেছিলেন—তোমার বাবা বিড়ি খেতে পারেন না—যাঁর একপয়সার মুরোদ নেই—তাঁর আবার অত শখ কেন শুনি...?

রাত্রে শোবার ঘরের মধ্যে মিলিকে অনেক সহ্য করতে হয় বাবার জন্যে। আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের কী যে হয়েছে—বাড়িতে তিনি থাকেন কম। অফিসের আগে আর অফিসের পরে যতক্ষণ তাঁর বাড়িতে থাকার কথা, সে-সময়টা কাটে তাঁর বাগানে। রাত্রে হারিকেন আর টর্চ নিয়ে চলে তাঁর গাছের তদবির তদারক। কোনও বন্ধু এলে দেখা করেন বাগানে। মিলি সারাদিন সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আর ওদিকে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি? যখন রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিসে বেরিয়ে যান, তখন নেমে আসেন তিনি ওপর থেকে।

চীৎকার শোনা যায় দূর থেকে—মহারাজ—

অর্থাৎ আর একবার তাঁর চা চাই।

সেই তখন থেকে যতক্ষণ না রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় অফিস থেকে আসেন, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর চা চাই। আর সেই দামী চা। সংসার ভেসে যাক, কারু পেট ভরুক আর না-ভরুক, রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির চুরুট, চা চাই! তা ছাড়া সকালবেলা চাই তাঁর নিজস্ব একখানা 'হোয়াইটম্যান', লেখবার প্যাড, কলম, কালি আর স্ট্যাম্প। চাই নিজস্ব ব্র্যান্ড টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, স্নো, পাউডার আর মাসকাবারী হাতখরচ কুড়িটি টাকা।

প্রতি মাসের পয়লা তারিখে মিলি দু'খানা দশটাকার নোট বাবার হাতে গিয়ে দিয়ে আসে।

মিলির সেদিন নজরে পড়ে। বিকেল থেকে বাবার সেদিন সুরু হয় উদ্যোগ-আয়োজন। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি আবার যেন তাঁর পুরনো ফেলে-আসা দিনগুলো ফিরে পান। আলমারি থেকে বেরোয় সেইসব চৌদ্দ বছরের পুরনো স্যুট্। কোনোটা আর শরীরের সঙ্গে এখন ফিট্ করে না। জুতোর গোড়ালি থেকে প্যান্টটা দু'ইঞ্চি ওপরে উঠে পড়েছে। জায়গায় জায়গায় পোকায় এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে। অ্যাশ কাঠের শৌখিন ছড়িটা বেরোয়। বেরোয় ফেল্ট-হ্যাট্। মাথায় ঈষৎ বেঁকিয়ে বসিয়ে দেন। হাফসোল দিয়ে দিয়ে পেটেন্ট লেদারের শু-জোড়ার সে গৌরব আজ অস্তমিত। তবু মাস্টার-টেলারের তৈরি সেই পোশাকে হঠাৎ রায়সাহেবের দেহটা কেমন ঋজু হয়ে ওঠে। যেমন হতো চৌদ্দ বছর আগে সাহেবী হোটেলে ডিনার খেতে যাবার সময়। চুরুটটা দাঁতে কামড়ে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়েন তখন আর ধরতে পারার কথা নয়। খাঁটী বনেদী চাল। হোন নিঃস্ব, জামাইয়ের গলগ্রহ—একদিন আধদিন নয়, চৌদ্দ বছর ধরে—তবু চালচলন দেখে বোঝা যায় ইজ্জতদার মানুষ—খানদানী আদব-কায়দার মানুষ। সম্ভ্রমে মাথা নীচু হয়ে আসতে বাধ্য।

তারপর যেমন ভঙ্গীতে সে-যুগে হোটেলে গিয়ে ঢুকতেন, তেমনি ভাবে গিয়ে ঢোকেন পাটনার বড় একটা হোটেলে। কলকাতার হোটেলের কাছে এ হয়ত কিছু নয়। কিন্তু রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি ভুলে যেতে চেষ্টা করেন যে, এটা পাটনার হোটেল। তাঁর মানসচক্ষে ভেসে ওঠে পাম্ গ্রোভ্, জাজ্ ওয়াল্জ্ আর স্যুট্-পরা স্ত্রী-পুরুষের ভিড়।

একটা চেয়ারে গিয়ে মধ্যেখানে বসেন—সকলের দৃষ্টির সামনে। তারপর যারা সেই অবস্থায় সেখানে ডিনার খেতে দেখেছে তাঁকে, তারা জানে পাকা বনেদিয়ানা কাকে বলে। তাঁর সেই ন্যাপকিন নেওয়া থেকে সুরু করে নিখুঁত সব মুভমেন্ট লক্ষ্য করবার মতো। অন্তত পাটনার ওই হোটেলে এর আগে আর কাউকে অমন ভাবে দেখা যায়নি ডিনার খেতে।

কিন্তু মাত্র তো কুড়িটি টাকা। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই শুধু চলে—আর বাকী সমস্তটা মাস আবার বসে থাকতে হয় পরের মাসের পয়লা তারিখটির দিকে চেয়ে। কারণ খাওয়াই কি শুধু? বকশিশ দিতেও যে মোটা বেরিয়ে যায়, আর ওটা না দিলে তো খাতিরও থাকে না।

একবার মেয়েকে বলেছিলেন—মিলি, আমার স্যুট্গুলো সব তো গেছে, আর অন্তত হাফ ডজন না করালে তো আর চলছে না—তোর কী ভুলো মন, তিনমাস থেকে তো কেবল করাবি বলছিস—

রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের সেটা ইন্সিওরেন্স-এর প্রিমিয়াম দেবার মাস। সে মাসে হয় না। সুতরাং মিলি চুপ করে থাকে। পরের মাসে ছেলের

পরীক্ষার ফিস্ দিতে হলো অনেক টাকা। তার পরের মাসে মিলির বিয়ের মাস, জামাই একটা নেকলেস কিনে দিলে স্ত্রীকে, তার পরের মাসেও একটা-না-একটা কী খরচ হয়ে গেল। সুতরাং রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির সামান্য হাফ-ডজন স্যুট্ তা-ও হয়ে উঠলো না বহুদিন।

ড্রেসিং গাউনটা ছিঁড়ে যেতে বসেছে। ওই একখানাই এখন সম্বল। কোন্‌দিন পিঠের দিকটায় টান পড়লেই ফ্যাস্ করে যাবে। তবু সকালবেলা ওইটে পরেই হোয়াট্‌নট-এর ওপর থেকে হোয়াইটম্যান-খানা নিয়ে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কাগজ পড়তে থাকেন। সেটা ছোট-চা।

তারপর বড়-চা হবে আটটা থেকে ন'টার মধ্যে। আগে কিছু পেস্ট্রি বা বিস্কুট বা টোস্ট্ থাকতো সঙ্গে। আজকাল আবার পরোটায় নেমেছে। তবু সেই পরোটাই ছুরি কাঁটা দিয়ে চিবোতে চিবোতে চা খাওয়া।

আজকাল রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এই বড়-চা'তে থাকেন না। তিনি তখন থাকেন বাগানে। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি একাই গল্প করে যান তখন।

—জানিস মিলি, এবারকার শীতে লণ্ডনের মে-ফেয়ার-এ চৌদ্দ ইঞ্চি বরফ পড়েছিল...

মিলি একমাত্র নীরব শ্রোতা। শুধু বললে—তাই নাকি বাবা?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—এতেই তুই অবাক হচ্ছিস, কিন্তু যেবার বার্লিনে কলের জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল, নাইনটিন টোয়েনটিতে—তিনশো তেতাল্লিশ জন লোকের নাক যে একেবারে খসে গিয়েছিল—

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লণ্ডন, বার্লিন আর নিউ ইয়র্কের গল্প করে চলেন। তারপর এক সময় দেখেন মিলি কখন অজান্তে উঠে চলে গেছে, তখন আস্তে আস্তে ওপরে উঠে যান। ওপরে উঠে গিয়ে লেখবার টেবিলে চিঠি নিয়ে বসেন। চিঠির তাড়া। ম্যানচেস্টার থেকে মিস্টার ক্রফোর্ড চিঠির জবাব দিয়েছেন। ফ্লীট স্ট্রীট থেকে জবাব এসেছে কোনো এক কাগজের মালিক লর্ড ফেয়ারওয়েদারের। চিঠির জবাব পড়া এবং জবাবের জবাব লেখার মধ্যে হঠাৎ দেশলাইয়ের কাঠি ফুরিয়ে গেল।

চীৎকার করে ডাকেন—মহারাজ—

মহারাজ এল না। সাড়াও দিলে না। কী হলো সব! কিছু বুঝতে পারলেন না রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি। অথচ চুরুট নিভে গেছে।

আবার ডাকেন—মহারাজ—

এবার মহারাজ এল। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—একটা দেশলাই আনো তো মহারাজ—দেশলাই একটা—

কিন্তু সোজা হুকুম তামিল না করে মহারাজ বললে—জামাইবাবু এখন অফিসে যাচ্ছেন। তিনি অফিসে বেরিয়ে গেলে দেশলাই কিনে আনবো—

সাহেবী মেজাজ হঠাৎ যেন গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুরুটখোররা সহজে রাগে না বলেই তিনি কিছু না বলে চুপ করে রইলেন।

কিন্তু খাবার টেবিলে রিপোর্ট না করে পারলেন না। বললেন—আদর দিয়ে দিয়ে তুই চাকরদের একেবারে মাথায় তুলে ছেড়েছিস, মিলি, কী বুদ্ধি দ্যাখ্—আমার চুরুটটা তখন নিভে গেছে, আমার দেশলাইয়ের চেয়ে জামাইবাবুর অফিসে যাওয়াটাই বড় হলো—

এখন, ঠিক এই সময়ে, এক পয়লা জানুয়ারির সকালবেলায় কাগজ পড়তে পড়তে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি থমকে গেলেন। রায়সাহেব মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রমোশন পেয়ে রায়বাহাদুর হয়েছেন!

সেই অবস্থাতেই নেমে এলেন। সেই ড্রেসিং গাউন, বাঁ হাতে চায়ের কাপ, আঙুলের ফাঁকে চুরুট।

—মিলি, মিলি—

মিলি রান্নাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—মৃত্যুঞ্জয় কোথায় রে—

মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বাগানে ছিলেন। যথারীতি চা খেয়েই বাগানে গিয়েছেন।

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি হাত বাড়িয়ে দিলেন—কন্‌গ্রাচুলেশন্‌স্—

ভিড় হয়ে গেল সকাল থেকেই। লোকের আসা যাওয়া। স্যার জীবনপ্রসাদ এলেন বুইক হাঁকিয়ে। চার্টার্ড একাউন্‌টেণ্ট রণধীর চৌহান সাহেব। হরসিংপুরের জমিদার জনকবাবুরা। বিলেত-ফেরত মুন্সেফ রঘুবীর প্রসাদ। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বাবুল মিত্তির এম-এ।

দুপুর বারোটা নাগাদ দু'-তিনখানা টেলিগ্রামও এসে গেল।

তারপর বিকেলবেলা আর এক দফা। চা, হাসি, কথা, নমস্তের ধাক্কা এক-দিনেই শেষ হলো না। দু'তিনদিন ধরেই চললো। ডাকে চিঠি আসতে লাগলো। জ্যোটি, লোটি, রুবিরা আর তাদের বরেরা লিখেছে। দেরাদুন থেকে ছেলে লিখেছে। চেতলা থেকে মাসিমারা। দিল্লী থেকে লিখেছে পরেশবাবুর স্ত্রী। ভাগলপুর থেকে মামাবাবু লিখেছেন। বেরিলি থেকে জ্যাঠতুতো ভাই লিখেছে। অনেক অনেক চিঠি। সকলকে উত্তর দিতে দিতে মিলি বিব্রত হয়ে পড়লো।

প্রথমে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি সত্যিই খবরটা দেখে প্রীতই হয়েছিলেন। কিন্তু এই বাড়াবাড়ি তাঁর ভালো লাগলো না। ডানকান সাহেব তো কথাই দিয়েছিলেন। ওখানে চাকরিতে থাকলে এতদিনে রায়বাহাদুরিটা পেতে অন্তত দেরি হতো না। তা এত বড় রায়বাহাদুরের তালিকা তো আর কখনও বেরোয়নি। এমন বছর-বছর গাদা গাদা রায়বাহাদুর যদি বেরোতে থাকে তাহলে কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন!

কিন্তু এতেও বোধ হয় বিচলিত হবার মতো কিছু ছিল না। সবই চাপা পড়ে যেত একদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেক্রেটারিয়েটের অফিসাররা একটা বিরাট পার্টি দেবার বন্দোবস্ত করে বসলো রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে। হাসি পেল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির। এমন হাস্যকর ব্যাপার শুধু পাটনা বলেই সম্ভব বুঝি।

তা হোক, পৃথিবী কারো হাসি-ঠাট্টা, সুখ-দুঃখের ভালো লাগা না-লাগার তোয়াক্কা করে না।

দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেছে। আগামী রবিবার। হাতে আর মাত্র চারদিন। ছাপানো কার্ড বিলি হলো সকলের নামে। পাটনার রথীমহারথীরা কেউ বাদ পড়লেন না। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নামেও আলাদা চিঠি এল একটা।

রবিবার পার্টি। আর শনিবার দুপুর পর্যন্তও কেউ জানতো না।

শনিবার সন্ধ্যাবেলা বললেন মিলিকে। বললেন—কাল তো আমি থাকতে পারছি না, মিলি—আমাকে যে কলকাতায় যেতে হচ্ছে—

—কেন বাবা, হঠাৎ ?... মিলির চমকে উঠবারই তো কথা।

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয়ও কম চমকে উঠলেন না। বললেন—কেন ?

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি বললেন—তোমার পার্টিতে থাকতে পারবো না, মৃত্যুঞ্জয়, কিছু মনে কোরো না—ডানকান সাহেব জরুরী চিঠি লিখেছে গিয়ে দেখা করবার জন্যে—এতদিন পরে বোধ হয় ওদের ভুল ওরা বুঝতে পেরেছে...

—তোমাকে কি আবার ওরা চাকরি দেবে নাকি, বাবা ?......মিলি প্রশ্ন করলে।

—কে জানে !

—কবে যাবে ?

—কালই সকালে, জরুরী চিঠি লিখেছে, দেরি করা উচিত নয়।

—তা তো বটেই—রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় বললেন।

গুছিয়ে দিলে মিলি। রাত পোহালেই সকাল। সময় বড় কম। রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি চলে যাবেন পাটনা ছেড়ে। চাকরি পেলে আর ফিরবেন না। আর একটা দিন পরে গেলেই তো ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। নইলে জামাইয়ের সম্মানে যে পার্টি দেওয়া হচ্ছে, তাতেই কিনা তিনি থাকতে পারবেন না !

যত কিছু জিনিসপত্র নিজের বলতে ছিল রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির, সব গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা হলো। মিলি স্লিপ পাঠিয়ে দু' কেস চুরুটও আনালো।

সকালবেলা উঠেই মিলি এসেছে বাবার ঘরে। হঠাৎ রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। চৌদ্দ বছর আগে যেদিন তিনি এ বাড়িতে এসেছিলেন, সেদিন যেন এমনি করে মিলি কাছে এসেছিল। এমনি

করে তাঁর তদারক করতো। মিলি এরই মধ্যে এক ডজন রেডি-মেড শার্ট আনিয়েছে। আনিয়েছে এক ডজন টাই। রুমাল ছ'টা। এক টিন বিস্কুট, রাস্তার খাবার।

আজই সন্ধ্যাবেলা রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টি। সহরের সমস্ত গণ্যমান্য লোকের নেমন্তন্ন। কথাটা মনে পড়তেই রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি লম্বা করে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

মিলি শেষ সময়ে বললে—বাবা, হপ্তায় হপ্তায় একটা করে চিঠি বরাবর দিয়ে যেও—তুমি চলে গেলে, বাড়িও একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল—

রায়সাহেব অন্যমনস্ক হয়ে বললেন—দ্যাখ্ মিলি, জানিস রায়বাহাদুর আমিও হতুম......সব বন্দোবস্ত ঠিক—এমন সময় ডানকান সাহেব এসে সব গোলমাল করে দিলে—

কী কথার উত্তরে কী কথা শুনে মিলি যেন অবাক হয়ে গেল, বললে—তা হোক্‌গে বাবা, সেই ডানকান সাহেবই তো ডেকেছে—সেই ডানকান সাহেবই তো আবার তোমায় চাকরি দিচ্ছে—লোকটা ভালোই বলতে হবে—

একটা খামের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে বাবার জামার বুকপকেটে রেখে দিয়ে বললে—এই পকেটে দুশো টাকা রেখে দিলাম বাবা, মনে থাকে যেন—

আজ আর রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের নয়, আজ যেন রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির হুকুম তামিল করতে ছুটেছে চাকর-বাকরেরা।

ট্রেন ছাড়লো। মিলির চোখ দুটো করুণ হয়ে উঠেছিল। রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় হাত উঁচু করলেন। হাতের চুরুটটা দাঁতে চেপে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জিও হাত উঁচু করে আঙুল নাড়তে লাগলেন। ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে তাঁরও একটা স্বস্তির সুদীর্ঘশ্বাস পড়লো। পাটনায় থাকলে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের পার্টিতে তাঁকে যেতেই তো হতো!

সাতদিন পরে মিলি তখন চায়ের আয়োজন করছে।

বাইরে থেকে হঠাৎ চীৎকার এল—মহারাজ—

মিলি বেরিয়ে এসে দেখলে—ট্যাক্সি থেকে নামছেন বাবা।

মিলিকে দেখে বললেন—এই ট্যাক্সি ভাড়াটা দিয়ে দে তো মিলি—

ঘরে ঢুকে বলেন—রাজী হলাম না, বুঝলি রে......ডানকান সাহেব বললে—সাতশো টাকা দেব, করো তুমি চাকরি আবার। আমি বললাম—চাকরি আমি করবো না সাহেব। তখন বললে—হাজার টাকা দিচ্ছি—। তখন আমিও বললাম—দু'হাজার টাকা দিলেও করবো না—

মিলি বললে—তারপর?

—তারপর আর কি—চলে এলাম, চাকরি করবো কোন্ দুঃখে বল্—তোরা

থাকতে বুড়ো বাপ চাকরি করবে—এটা কি ভালো দেখায়—লোকেই বা কী বলবে?

অফিস থেকে এসে রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও শুনলেন। শ্বশুরের হাজার টাকা মাইনের চাকরি না-নেওয়ার কাহিনী।

রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জি প্রশ্ন করলেন—ভালো করিনি—তুমি কী বলো মৃত্যুঞ্জয়?

রায়বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ও মিলির মতো কোনো মতামত দিলেন না। চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব নিজের মনেই বলতে লাগলেন—হাজার হোক, বেটারা তো আমাদের মতো নয়—গুণের কদর বোঝে—খাঁটি স্কচের বাচ্ছা—বললে—রায়-সাহেব, তোমাকে আমি রায়বাহাদুর করিয়ে দেব, তুমি এসো আমার এখানে—তোমার মতন লোক এখনও রায়বাহাদুর হয়নি! এটা খুব লজ্জার কথা—কিন্তু...

কিন্তু হঠাৎ কথা বলতে বলতে রায়সাহেব জে. ডি. ব্যানার্জির নজরে পড়লো তাঁর কথা কেউ শুনছে না। না মৃত্যুঞ্জয়, না মিলি। তারা কখন টেবিল থেকে উঠে গেছে তিনি টের পাননি। তিনি একলা।

তারপর একলা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিজের ঘরে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো এ-বাড়ির সিঁড়িগুলো আজ যেন বড় উঁচু ঠেকছে।

তলানি

নবেন্দু ঘোষ

ছেলেটা লুকোবার চেষ্টা করল। আপিস টাইমের ভিড়, কিন্তু তবু আমার সন্ধানী সতর্ক দৃষ্টি এড়াতে পারল না ছেলেটা। আজকাল ট্রাম-কোম্পানিতে একটু কড়াকড়ি শুরু হয়েছে, ইন্‌স্পেক্টাররাও বাধ্য হয়ে কড়া নজর রাখে। আর সেকেণ্ড ক্লাসগুলোতেই যত রাজ্যের ফাঁকিবাজ, চোর-জোচ্চোর আর বদমাশদের ভিড় হয়। ফলে আমরা যারা সেকেণ্ড ক্লাসে কন্‌ডাক্টারি করি তাদের পদে পদে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সইতে হয়, ঝগড়া করতে হয়, মারামারিও যে মাঝে মাঝে হয়, একথা অস্বীকার করতে পারব না। তাই দম ফেলতে পারি না, ইচ্ছে করলেও দয়া দেখাবার উপায় নেই। আপনি বাঁচলে বাবার নাম—বাপ্, যা দিনকাল পড়েছে।

ধরলাম ছেলেটাকে, "এই ছোঁড়া, তোর টিকিট?"

ছেলেটা ভয় পেল না, হাসল। কালো, রোগা চেহারা। পাঁচ-ছ বছর বয়েস। পরনে একটা কালো রঙের হাফপ্যাণ্ট, আধছেঁড়া, ময়লা চিটচিটে একটা শার্ট, গায়ের ওপর জমানো ময়লা কালো আভাস। আর উজ্জ্বল দুই চোখ, কুকুরের চোখের মতো। বন্য আর নির্ভয়। কোথায় যেন দেখেছি ছেলেটাকে!

"হাসছিস যে! টিকিট কই?"

"নেই।"

"কেন নেই?"

রাগ হল। এই ছোঁড়াগুলো ভারি জ্বালাতন করে। যুদ্ধের পর কোথা থেকে যে এদের আমদানি হচ্ছে। পিল্‌পিল্ করে যেন বেড়ে চলেছে শয়তানেরা।

কানটা ধরে একটু মনের ঝাল মেটাতে চাইলাম, "বল্ কেন নেই?"

আমার হাতের ওপর ধাঁ করে একটা চড় মেরে এক ঝটকায় কানটাকে মুক্ত করে নিয়ে ছেলেটা ফুঁসে উঠল, কুটিল চোখে বলল, "নেই।"

"নেই তো চড়েছিস কেন?"

"নেমে যাব।"

"নেমে যাব! বটে! তার আগে তোমাকে আমি পুলিসে দেব।"

যাত্রীরা ব্যাপারটা উপভোগ করছিল, কয়েকজন সহাস্যে সমর্থন করল আমাকে।

একজন বলল, "পুলিসেই দিন দাদা। এমনিভাবে ভেসে ভেসেই এরা কালে আমাদের পকেট মারবে, গলা কাটবে আর রিভলবার নিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকবে।"

আর একজন ছেলেটাকে প্রশ্ন করল, "হ্যাঁরে ছোঁড়া, তোর মা-বাপ নেই?"

ছেলেটার ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠল, দুচোখের তারায় আক্রোশ ঝিলিক দিয়ে গেল। সে জবাব দিল না। কোথায় যেন দেখেছি ছোঁড়াকে!

"আহা গোসা করছ কেন বাবা—বলো না—"

"ন্নেই", ধমকে জবাব দিল ছেলেটা। যেন কোণঠাসা কুকুরছানা দাঁত খিঁচলো।

জগুবাবুর বাজারে ট্রাম থামল।

আমি ছেলেটাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলাম, "যা ভাগ—"

ছেলেটা নেমে গেল, কয়েকহাত দূরে গিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "সা-লা।"

"অ্যাই!" ধমকে উঠলাম।

ছেলেটা নড়ল না, দুচোখ পাকিয়ে, একটা হাত তুলে শাসানির ভঙ্গিতে আবার বলল, "ইট মেরে তোর মাথা ভেঙে দেব—তোর মুখে হেগে দেব—"

হুড়মুড় করে যাত্রীরা উঠছিল। তাদের ভেতর দিয়েই চটেমটে নামবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় ফার্স্ট ক্লাসের ঘণ্টা বেজে উঠল। বাধ্য হয়ে থামলাম, আমিও ঘণ্টা বাজালাম। ট্রাম চলতে শুরু করল।

সমস্ত কোলাহলকে ভেদ করে ছেলেটার তীক্ষ্ণ গলা আবার ভেসে এল, "এই সালা—এই—এই সালা—"

ট্রামের পাশাপাশি কয়েক পা দৌড়ে এল সে, গালাগালি করতে করতে। শেষে এক-সময়ে থেমে গেল। আর সেই সময়েই ছেলেটাকে চিনতে পারলাম।

যাত্রীরা সহানুভূতি জানিয়ে বলল, "দেখেছেন মশাই দেখেছেন, সালার ছেলে যেন একেবারে বিচ্ছু—"

"হবে না, ব্যাটাদের মা-বাপের ঠিক নেই যে—"

হয়তো তাই। কিন্তু ঐ ছেলেটার মা-বাপ ছিল। আমি তাদের দেখেছি। অন্তত ওর মাকে আমি বহুদিন ধরেই চিনতাম। সে চেনা অবশ্য শুধু দেখার। কন্‌ডাকটরি করতে করতে ট্রামের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতাম ওর মাকে। সে কবেকার কথা। সেই যেবার আমি কন্‌ডাক্‌টর হয়ে কোম্পানিতে ঢুকলাম তার মাসকয়েক পর থেকেই—

এলগিন রোড পার হল ট্রামটা! তারপর থিয়েটার রোড। গতি বাড়ল ট্রামের। চাকায় চাকায় শব্দ উঠল। কর্মব্যস্ত জগতের ধ্রুপদের সঙ্গে যেন পাখোয়াজের বোল তুলে আমার ট্রাম এগোল। মাঝে মাঝে তারের গায়ে বিদ্যুতের তীব্র ঝলসানি যেন মাত্রা নির্দেশ করতে লাগল। দুলে দুলে ভিড় ঠেলে ঠেলে, টিকিট দিতে দিতে গলদঘর্ম হয়েও কিন্তু ছেলেটার মায়ের কথা এড়াতে পারলাম না। সব মনে পড়তে লাগল।

বিয়াল্লিশ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেই ট্রামের চাকরিটা পেলাম। বারকয়েক ফেল করার পর অতি কষ্টে পাশ করেছিলাম। তাছাড়া সামর্থ্যও আর ছিল না, আমাকে দেখলেই দাদা-বৌদির মুখ অন্ধকার হয়ে উঠত। তাই বাবু শ্রেণীতে টিঁকে থাকার করুণ চেষ্টা না করে একধাপ নিচেই নেমে গেলাম।

তখন বিয়াল্লিশের গোলমাল শুরু হয়েছে। কন্‌ডাক্টরি করতে করতে ক্রীতদাসত্বের জ্বালায় জ্বলি আবার ভয়ে ভয়েও থাকি। দেশের উত্তেজনা মাঝে মাঝে ট্রামের ওপর হিংস্রতায় ভেঙে পড়ে। সেই বিপ্লবের দিনেই আমার চাকরি-জীবনে হাতে-খড়ি। তারপর বিয়াল্লিশ সন গেল তেতাল্লিশ এল। পৃথিবীময় তখন যুদ্ধ চলেছে। ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেও যুদ্ধ-দানবের লোহার রথ এগিয়ে এল। দেশের মৃত্যু এল দুর্ভিক্ষের রূপ নিয়ে।

কত মৃত্যু দেখলাম তখন। দেখে দেখে মন তখন নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে। নিত্যদিন বিদ্যুৎ-যানের মধ্যে, ভিড়ে, গরমে, ঘামে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিকিট বেচে বেচে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু তবু প্রমোশন পেলাম না। সেকেণ্ড ক্লাসেই দিন কাটতে লাগল আমার।

সেই সময়। বোধ হয় সেটা শ্রাবণ কি ভাদ্র মাস। অশ্রান্ত বর্ষনের ফলে সেদিন সন্ধ্যের পর সবে রাস্তায় জল জমতে শুরু করেছে। বৃষ্টির জন্য ট্রামে ভিড় হয়নি। সেদিন আর দাঁড়িয়ে নেই আমি, বসে বিড়ি ধরিয়েছি।

ট্রামটা থামল পূর্ণ থিয়েটারের সামনে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই ছোট্ট একটি ছাতা মাথায় দিয়ে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়ে ট্রামে উঠে একপাশে বসল।

ট্রাম চলতে লাগল। অন্ধকার আর বৃষ্টিধারায় বাইরের রাস্তাবাড়ি সব ঝাপসা। গাড়ির কাচ নামানো। বাধ্য হয়ে ভেতরের যাত্রীদের দিকে তাকাতে তাকাতে মেয়েটির ওপর নজর পড়ল। মনে হল একে যেন কোথায় দেখেছি। একটু ভাবতেই চিনতে পারলাম। কদিন ধরেই মেয়েটিকে ঠিক সন্ধ্যের পর ট্রামে দেখি। এসপ্ল্যানেডে গিয়ে নামে রোজ। আর ফেরে সেই শেষ ট্রামে।

ভালো করে তাকালাম। অল্প বয়স কিন্তু অনুপাতে যে শ্রী থাকা দরকার তা নেই। রোগা, গালভাঙা, শুকনো। একটা রঙীন সস্তা সাড়িকে যথাসম্ভব গুছিয়ে আঁটসাট করে পরেছে। গলায় একটা পুঁথির মালা, হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথায় চুল আছে খুব, সেগুলো সযত্নে মস্ত বড় খোঁপায় বাঁধা। মুখের ওপর পাউডারের একটা ক্ষীণ আভাস আর অল্প-দামী এসেন্সে সুরভিত ছোট্ট একটা রুমাল হাতে। এতে আকৃষ্ট হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু সব মিলিয়ে মেয়েটির যে বসার ভঙ্গি, মুখের মধ্যে যে পাকা পাকা ভাব আর চোখের মধ্যে যে আশ্চর্য একটা জ্বালাময় দীপ্তি ছিল তা আমাকে আকৃষ্ট করতে বাধ্য করল। আমি তখন যুবক, বাইশের কোঠায় পা দিয়েছি, রক্তে আমার উগ্র পৌরুষের সঙ্গে লোভ-লালসার অনুচর। কিন্তু জীবন কি সেটা টের পেয়েছিলাম বলেই রাশ আমার হাতছাড়া হয়নি আর মানুষের মুখ দেখেই তার চরিত্র অনুমান করে

নেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা জন্মেছিল। সেই ক্ষমতাবলেই আবিষ্কার করলাম যে ঐ মেয়েটির চোখে গভীর পাঁকের বিষাক্ত ইতিহাস।

এসপ্ল্যানেড নয়, মিউজিয়ামের কাছাকাছি আসতেই মেয়েটি একবার এদিক ওদিক দেখে ছাতাটা খুলে নেমে গেল।

বুড়ো ইন্‌স্পেক্টর তারিণীদা ছিলেন তখন আমাদের ক্লাসে, মেয়েটি যেতেই বললেন, "ঐ গেল একটি—"

প্রশ্ন করলাম, "কী গেল তারিণীদা?"

তারিণীদা গাল দিলেন, "শালা ন্যাকা সাজছিস—বিদ্যেধরীদের তুমি দেখনি?"

"বিদ্যেধরী! ওইটুকু তো মেয়ে"—ইচ্ছে করেই বোকা সাজলাম। তারিণী-দাকে চটালে লাভই হয়।

"ওইটুকু!" তারিণীদা অনুকম্পার হাসি হেসেই আমাকে নস্যাৎ করার উপক্রম করলেন, "আরে এই কলিতে সবই সম্ভব। আর তোদের দেশে তো ওসব আকছার চলেছে। তোদের দেশের রাজা থেকেও রাজা নেই, তোরা দেশের লোক হয়েও মানুষ নস্ তো ওসব হবে না? তাছাড়া ইজ্জত বেচেও কিছু হয় না, তারপরেও তো ফুটপাথে মরেরে শালা। তোদের দেশে ওটুকুই মেয়েরাও রাতের আঁধারে এই ঝড়জলের রাতে ঘুরে বেড়ায় আর তোরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোস। ঘুমোবিই তো—তোরা কি মায়ের দুধ খেয়েছিস"—

বাধা দিয়ে বিনীতকণ্ঠে বললাম, "মায়ের দুধ তুমি খেয়েছ তো তারিণীদা?"

"আমি!" তারিণীদা মাথা নাড়লেন, "না। তাছাড়া আমি তো তোদের মতো ব্যাটা ছেলে নই, মেয়েছেলেও না। আমি তা জানি না, তা ভাববারও চেষ্টা করিনি—শুধু দিনরাত একটি কথাই মনে রেখেছি যে আমি মনেপ্রাণে ট্রাম কোম্পানির একজন টিকিট ইনস্পেক্টর—"

এসপ্ল্যানেড। কারো দিকে না তাকিয়েই তারিণীদা নেমে গেলেন।

তারিণীদার কথাগুলো ভাবলাম। কথার মধ্যে বুড়ো এমন একটি আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন যে অনেকক্ষণ ধরে ট্রামের তালে তালে তা আমার মাথায় হাতুড়ির মতো আঘাত করেছিল। অনেকক্ষণ ধরে তাঁর কথাগুলো আমাকে লজ্জা দিয়েছিল।

তারপরেও দু'তিনদিন আমি মেয়েটিকে লক্ষ্য করলাম। সেই একই রকম প্রসাধন তার। সন্ধ্যের পর সে ট্রামে ওঠে। নিঃশব্দে, ক্লান্ত, বিষণ্ণ ও করুণ ভঙ্গিতে এককোণে বসে থাকে। নড়ে না চড়ে না, কিন্তু তার জ্বলজ্বলে চোখের তারা দুটো কামরার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখে নেয়। যেন কী খোঁজে সে। কাজের ফাঁকে তার সেই সন্ধানী দৃষ্টির গতি লক্ষ্য করেছি আমি। আমাকেও রেহাই দেয়নি তা, লেহন করেছে আমার সর্বাঙ্গ!

এমনিভাবে কদিন কেটে গেল।

সেদিন বিকেলে আমার ডিউটি ছিল না। শ্যামবাজারে আমার মাসিমার ওখানে বেড়াতে গিয়ে ফিরতে প্রায় রাত দশটা হল। এসপ্ল্যানেডে এসে একটা টালীগঞ্জগামী ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এমনি সময়ে লক্ষ্য করলাম সেই মেয়েটাকে। ওয়েটিং-রুমের একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূর থেকেই চোখ রাখলাম তার ওপর। কি করে।

লোকজন আসছে, দাঁড়াচ্ছে, গল্প করছে। দু'একজন পায়চারি করছে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে তাদের মধ্যে একজন আধাবয়সী পশ্চিমা লোক পায়চারি করতে করতে মেয়েটিকে দেখল, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মেয়েটির দু'তিন হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল, পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল লোকটা। ধোঁয়ার কুণ্ডলী বাতাসে ছেড়ে দিয়ে মেয়েটার দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে কী যেন বলল। মেয়েটা আস্তে আস্তে তার দিকে মাথা ঘোরাল। লোকটা আবার কী যেন বলল। মেয়েটা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল কার্জন পার্কের দিকে। লোকটা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

বালিগঞ্জের একটা ট্রাম এল। একদল লোক আমার সামনে দিয়ে ছুটে গেল। দৃষ্টিপথ পরিষ্কার হতেই দেখলাম যে লোকটা সেখানে নেই।

কৌতূহল মেটাবার জন্যে পার্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। ঠিকই ধরেছি। আধো অন্ধকারেও প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে সেই মেয়েটিকে দেখতে পেলাম। তার পাশেই লোকটা। মাঠের নির্জনতা আর অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা।

নতুন করে তারিণীদার কথাগুলো মনের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল যে-বিদ্যুতে লোহার ট্রাম মাটি কাঁপিয়ে ছোটে সেই বিদ্যুতের মতোই একটা নাম-না-জানা ঢেউ আমার রক্তে দোলা দিল, বারবার আমার পেশীগুলোতে এসে মাথা খুঁড়তে লাগল। তবুও কিছু করতে পারলাম না।

কদিন পর। আবার বিকেলের দিকে ডিউটি। আবার মেয়েটাকে দেখলাম। দেখেই কেমন যেন রাগ হল। তারিণীদা'র কথা সত্য। কিন্তু দেশের অবস্থা তো একদিনেই বদলাতে পারব না আমরা। ততদিন কি এইভাবেই গোল্লায় যাবে সব ?

টিকিট চাইতে গিয়ে কড়া নজর মেলে তাকালাম মেয়েটার দিকে।

মেয়েটা একটা দু আনি দিয়ে আমার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, "এসপ্ল্যানেড"—তার পরেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

টিকিটটা পাঞ্চ করতে করতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাম কি বল তো ? তোমায় যেন চিনি।"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে, তার চোখের তারায় শানিত দীপ্তি। কিন্তু

মুখের কোথাও এতটুকু রেখাপাত হল না তার, স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "আপনি আমাকে চেনেন না"—

"নামটা কি বলোই না।"

"না টিকিট দিন।"

টিকিটটা দিয়ে বললাম, "রোজই রাতের বেলা বাড়ি থেকে বেরোও তুমি—কেন?"

"আপনার তাতে দরকার কি?" মেয়েটার গলাতে প্রচণ্ড ঝাঁজ।

"তোমার মা-বাবা নেই?"

"তাতেই বা দরকার কি আপনার? যান, টিকিট বেচুন গে—"

চটে আরো কড়া কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন যুবক যাত্রী হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, "অত জেরা করছেন কেন মশাই? আপনি কি দারোগা সাহেব?"

বললাম, "দেখছেন না এ কী?"

মেয়েটা সাপের মতো ফুঁসে উঠল, "শুনছেন? শুনছেন আপনারা? কি ছোটলোক!"

সেই যুবক যাত্রীটি আমায় ধমকে বলল, "খবরদার মশাই, ফের ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে ওভাবে কথা বললে আপনাকে এবার মার লাগাব—"

কামরার মধ্যে আরো কয়েকজন ওদের সমর্থন করল। শেষ পর্যন্ত সেই অপমান হজমই করলাম।

জগুবাবুর বাজারের কাছে এসে মেয়েটা উঠে দাঁড়াল। সেই যুবকটির দিকে চকিত একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নেমে গেল।

কয়েক সেকেণ্ড বাদে যুবকটিও নেমে গেল।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম শুধু।

কালিঘাট থেকে ড্যালহাউসি রুট। তারপরেও কতদিন দেখেছি মেয়েটিকে। সেই একই ভঙ্গি। নিঃশব্দ, করুণ, কিন্তু কুটিল চাউনি। দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিতাম আমি। ঘৃণায়।

হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম মেয়েটাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম আপদ গেছে।

তারপর তেতাল্লিশ সন শেষ হয়েছে। যুদ্ধ একইভাবে চলেছে পৃথিবীতে। দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা তখন আর রাস্তাঘাটে বেশি নজরে পড়ে না। যারা নিম্নবিত্ত, নিতান্ত দরিদ্র ছিল তারা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ তখন মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে, তার থালার অন্নের মাপ কমিয়েছে, তার নারীর লজ্জাবস্ত্রে দুঃশাসনের মতো আকর্ষণ করছে আর তাদের রক্তে এনেছে নতুন জীবনের প্রতিজ্ঞা। আমার বুকেও সে প্রতিজ্ঞা ধ্বনিত হয়েছে, গুমরে মরেছে, কিন্তু তবু আমি কিছু করতে পারিনি। ট্রাম চলেছে আমার—

বিদ্যুতের তারে নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে লোহার লাইনে লোহার চলার গান গেয়ে, পৃথিবীর মহৎ নতুনদের অশান্ত পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটি কাঁপিয়ে। আর সেকেণ্ড ক্লাসের কামরায় চামড়ার থলি থেকে টিকিট বের করে সবাইকে পাণ্ড করে দিয়েছি আমি, পয়সা গুনে নিয়েছি, ঝগড়া করেছি, বিনা টিকিটের যাত্রীদের নামিয়ে দিয়েছি। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি বজায় রাখার দুরন্ত প্রয়াসে কখনো দেখতেই পাইনি যে বসন্তের সন্ধ্যায় নিবে-আসা দিনের রাঙা আলোর তলায় ময়দানকে কেমন দেখায়, কিংবা শরতের দুপুরে।

শরৎ নয়, শীতকাল তখন। সেদিন বেশ কনকনে উত্তুরে বাতাস বইছিল। কোম্পানির গরম কোটেও যেন শীত আটকাচ্ছে না। এলগিন রোডের কাছে ঘ্যাঁচ্ করে ট্রামটা থেমে পড়ল। সামনেই একটা অ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে। হৈ হৈ শুরু হল। ঠায় পাঁচমিনিট বাদে ট্রামের মোটর আবার গোঁ গোঁ করে উঠল। আর ঠিক সেই সময়েই একজন যুবতী এসে ট্রামে বসে।

টিকিট চাইতে গিয়ে চমকে গেলাম। এ যে সেই মেয়েটা! আরে! চেহারাটা যে বেজায় পালটে গেছে! গায়ে গতরে মাংস জমেছে, গাল ভরেছে, ঠোঁটের ওপর হালকা লিপ্ষ্টিকের রক্তাভা। পরনে ভালো একটি রঙীন তাঁতের শাড়ি, হাতে ব্যাগ, পায়ে ভালো চটি।

"টিকিট"—

"পাঁচ পয়সা"—মেয়েটার গলা আগের চেয়ে অনেক সরস হয়েছে।

"কোথায় যাবেন?"

মেয়েটা তাকাল আমার দিকে। স্পষ্ট বুঝলাম যে আমাকে চিনতে পারল, কিন্তু মুখে চোখে তা ফুটে উঠল না। মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনি টিকিট দিন না, অত কথার দরকার কি?"

রাগ দমন করে টিকিট দিয়ে সরে গেলাম। ব্যবসা জমিয়েছে মেয়েটা। পাপের সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠেছে। চেহারাটা পালটেছে। আশ্চর্য, দেখতে ভালোই দেখাচ্ছে। পাপাচরণের ফলে দেহের ওপর একটা বিচিত্র ছাপ পড়েছে। চোখের তারায়, ঠোঁঠের বঙ্কিম রেখায়, বসবার ভঙ্গিতে, তাকাবার কায়দায়—এক বিচিত্র বার্তা। সে বার্তা পড়তে বা বুঝতে কারো ভুল হয় না।

একটা স্টপ পরেই নেমে গেল মেয়েটা। আমি মুখ বাড়িয়ে দেখলাম যে এগিয়ে গিয়ে ফার্স্ট ক্লাশে উঠে বসল। ওপরে উঠছে মেয়েটা তাই আমার সান্নিধ্য এড়িয়ে গেল। ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে সে আর চড়বে না।

সেকেণ্ড ক্লাসের কন্ডাকটর হওয়াটা সেদিন যেন কেমন খুব গৌরবের বলে মনে হল না।

মনের দুঃখটা বোধ হয় কেউ টের পেয়েছিল। কদিন বাদেই আমাকে

ওয়েলিংটন্-গড়িয়াহাটা রুটের ফার্স্ট ক্লাসে অস্থায়ীভাবে কাজ করতে দেওয়া হল।

নতুন রুটে ফার্স্ট ক্লাসে কাজ আরম্ভ হল। খুব মন দিয়ে কাজ শুরু করলাম নতুন উদ্যমে।

শীত গেল। বসন্ত এল।

হঠাৎ একদিন দুপুরে দেখতে পেলাম। রাতের ছায়াতে নয়, বসন্ত দুপুরের উজ্জ্বল আলোতে। কিন্তু এ রুটে এল কী করে? তাও কি জীবিকার জন্যে?

উন্নতি হয়েছে। ধাপেধাপে অনেক ওপরে উঠেছে মেয়েটা পরনে ক্রেপ্ সিল্কের রঙীন সাড়ি, গায়ের বর্ণ ঘষামাজাতে ফর্সা হয়েই উঠেছে। গায়ের গয়নাগুলো সবই সোনার। ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে দুলিয়ে খুট্ খুট্ করে সে ট্রামে উঠল, সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের একটি স্বাস্থ্যবান কৃষ্ণবর্ণ লোক। লোকটার চেহারা কর্কশ, রুক্ষ। ঘাড়ছাঁটা, দামী জামাকাপড়। উদ্ধত, দুর্বিনীত ভঙ্গি। কালোবাজার করে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। দেখেই বোঝা যায়।

"টিকিট"—মেয়েটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"আমি দেব," সেই লোকটা বলল।

"না, আমি", মেয়েটা বলল।

লোকটা হাসল, পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে টস করে বলল, "হেড না টেল?"

মেয়েটা বলল, "হেড।"

লোকটা হাত মেলে পরাজিতের মুখভঙ্গি করল, "আচ্ছা তুমিই দাও।

মেয়েটা নির্লজ্জের মতো হেসে উঠল। একগাড়ি লোক কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই তার। হাসতে হাসতে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে অনেকগুলো নোটের ভেতর থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে আমার দিকে তাকিয়েই হাসি থামাল। সে আমায় চিনতে পারল। আমি তার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের সাক্ষী।

"দুটো চৌরঙ্গী", গম্ভীর হয়ে বলল সে।

আমি নোটটা ফিরিয়ে দিলাম, "চেঞ্জ নেই।"

বিরক্তমুখে ভুরু কুঁচকে মেয়েটা বলল, "আমার কাছেও নেই।"

মনের ভেতরে বহুদিন ধরে একটা আক্রোশ জমা ছিল। এই মেয়েটার জন্য একদিন যে অপমানিত হয়েছিলাম সেকথা এখনো ভুলিনি।

বললাম, "তা আমি কী করব? চেঞ্জ নিয়ে বেরোতে পারেন না?"

মেয়েটার চোখেও শত্রুতা লক্ষ্য করলাম, সে বিষভরা গলায় বলল, "ছোট-লোকের মতো কথা বলছ কেন?"

আস্পর্ধা দেখে জ্ঞান হারালাম, বললাম, "মুখসামলে কথা বোলো, তোমায় আমি চিনি"—

মুহূর্তে সেই কৃষ্ণবর্ণ লোকটা আমার ওপর লাফিয়ে পড়ল, "শাট্ আপ ইউ ব্লাডি সোয়াইন—শালা—"

আচম্কা। সামলাবার আগেই একটা চড় এসে লাগল গালে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও লাফালাম। যাত্রীরা হৈ হৈ করে উঠল। ইনস্পেক্টর ইদ্রিস মিঞা এসে পড়ল মাঝখানে। সবাই আমাকে দোষী সাব্যস্ত করল, চাকরি বাঁচাবার জন্য সেই মেয়েটা আর সেই লোকটার কাছে মাপ চাইতেও হল। তবু আমার কথা বলতে পারলাম না। আর সেকথা বললেই বা কে বিশ্বাস করত? ঐশ্বর্য থাকলেই আজকের সমাজে সম্মান পাওয়া যায়। টাকা থাকলে চোর-লম্পটেরাও আজকের সমাজে সাধু এবং বিশ্বাসভাজন বলে নাম কেনে। ষাট টাকার চাকরি যার জীবন-ভোমরা তার কথায় কান দেবে কে?

ব্যাপারটা বেশিদূর গড়ায়নি। ইদ্রিস মিঞা রিপোর্ট করতে বাধ্য হয়েছিল, তবে বাঁচাবার চেষ্টাও করেছিল। অস্থায়ীভাবে আরো কিছুদিন কাজ চলবে কিন্তু হঠাৎ একদিন যে আবার সেকেণ্ড ক্লাসে ফিরে যেতে হবে তা বুঝতে পারলাম।

মনের ভেতর অপমান জমা হয়ে রইল। আক্রোশের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। একদিন কি সুযোগ পাব না? তারিণীদার কথা সব বাজে। এদের জন্য দরদ দেখানোর কোনো মানে হয় না।

বসন্তের পর গ্রীষ্ম এসেছে তখন। আবার দেখলাম ওদের। দুজনকেই।

একি! মেয়েটার কপালে সিঁদুর! না, ভুল দেখেছি। সিঁথিতে নেই শুধু কপালে। গৃহস্থ-বধূ সাজার চেষ্টা করেছে।

ওরা চিনল ঠিকই। কিন্তু আজ আর কোনো গণ্ডগোল হল না।

ওদের কথাবার্তা শোনার কৌতূহল হয়েছিল আমার। চেষ্টাও করেছিলাম। অতি সাধারণ কথাবার্তা। শাড়ি, সিনেমা, চাকরবাকরের গল্প, লোকটার নতুন কনট্র্যাকটের কথা।

আশ্চর্য হয়েছিলাম। মেয়েটা আজকাল তরতর করে বেশ কথা বলে।

ট্রাম থেকে ওদের নেমে যাবার সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। মেয়েটার সন্তান হবে। আশ্চর্য! আর কত দেখব!

তারপর অনেকদিন দেখিনি ওদের। আবার দেখলাম পঁয়তাল্লিশের গোড়ায়। তখন আমি টালিগঞ্জ থেকে ড্যালহাউসিতে কাজ করছি। আবার সেই সেকেণ্ড ক্লাসে। দেখলাম মেয়েটার কোলে একটা ছেলে। সঙ্গে লোকটা কিন্তু মেয়েটাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। লোকটাও কথা বলছে না বেশী, গম্ভীর হয়ে আছে। ওর বেশি সেকেণ্ড ক্লাস থেকে আর বোঝা গেল না।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি আমি। আবার সেকেণ্ড ক্লাসে ফিরে এলাম! ঐ

মেয়েটাকে একদিন অপমান করতে পারলাম না। অক্ষম পুরুষের মতো এই প্রতিশোধ-কামনার হাত থেকে আমি নিষ্কৃতি পাইনি।

যুদ্ধ শেষ হল। কনট্রাকটের বাজার মন্দা হয়ে এল। দেশে নিত্য নতুন বেকারের দল বাড়তে লাগল। উত্তেজনা। আন্দোলন। সে ঢেউ এসে ট্রামের গায়ে লাগে। ছেচল্লিশ সাল এল।

এরি মধ্যে দেখলাম মেয়েটাকে। দিনের বেলা। টালিগঞ্জের একটা স্টপে। এক বৎসরের ছেলেটাকে কোলে করে সে দাঁড়িয়ে। একবার ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে গিয়ে তারপর ফিরে এসে সেকেন্ড ক্লাসেই উঠল। সঙ্গে আজ লোকটি নেই।

"টিকিট"—

মেয়েটা তাকাল। আজ তার চোখে সেই আগুন দেখলাম না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বিষণ্ণ দুটি চোখে সে একবার তাকিয়েই হাতের ছোট্ট একটা মানি-ব্যাগ থেকে পয়সা বের করতে লাগল।

"ভবানীপুর একটা"—

"কেন? চৌরঙ্গী নয়?" খোঁচা দিয়ে ক্লেশতিক্তকণ্ঠে বললাম। আমার আক্রোশ এখনো যায়নি।

"না," মেয়েটা মুখ তুলল না।

"সেই লোকটা কোথায়?"

"কার কথা বলছেন?"

"আপনার সঙ্গেকার"—

"আমার স্বামী," মেয়েটা ক্লান্ত ভঙ্গিতে তাকাল একবার আমার দিকে। কিন্তু চোখে তার সেই আগুন নেই কেন? কী বিশ্রী চেহারা হয়েছে এখন! সোনার গয়নাও কমে গেছে দেখছি। শাড়িটাও সাধারণ তাঁতের। ব্যাপার কি?

হেসে বললাম, "স্বামী! ওহো—তা তিনি কোথায়?"

"কাজে।"

ব্যঙ্গভরা গলায় বললাম, "কাজে? না পালিয়েছে?"

মেয়েটা বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো তাকাল আমার দিকে, তারপর বলল, "আপনি কি চান যে আমি চেঁচাব?"

মুহূর্তের জন্য বোধ হয় মেয়েটার চোখে একটা বন্যভাব ঘনিয়ে এল। দেখে মনে মনে থমকে গেলাম, কিন্তু মুখে একটা বেপরোয়া হাসি ফুটিয়ে অন্য কোনে চলে গেলাম। থাক আর ঘাঁটাব না। তবে শিগগিরই অপমান করার সুযোগ পেয়ে যাব। ধাপে ধাপে যেমন উঠেছিল, তেমনি ধাপে ধাপেই আবার নামতে সুরু করেছে।

আবার সেই করুণ বিষণ্ণ ভঙ্গিটা ফিরে এসেছে মেয়েটির।

ক'দিন পরেই দাঙ্গা শুরু হল। ঝড়ের মতো এল শয়তান। কলকাতার রাস্তায় রক্তের হোলি খেলে হিন্দু মুসলমান। গুলি, অ্যাসিড, বোমা। আর আতঙ্কে শহর কাঁপে, দিনরাত কাঁপে। তার মধ্যে আমাদের ঘর্মঘট গেল। এমনিভাবে ছে'চল্লিশ গেল সাতচল্লিশ এল। দেশভাগের আয়োজন শুরু হল।

মনের মধ্যে আরো জ্বালা জমা হল। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছি। বয়স প্রায় ছাব্বিশ-সাতাশ হল কিন্তু বিয়ে করলাম না, এমন কি কোনো মেয়েকে ভালবাসার চেষ্টা করব সে-ভরসাও হল না। কী হবে তা করে? তাতে শুধু চিত্তে তাপই বাড়ে, দুঃখও বাড়ে। তার চেয়ে ভুলে যাওয়াই ভালো যে পুরুষের জীবনে নারীর দরকার আছে। ওসব আমাদের দরকার নেই। আমাদের মতো গরীবদের ত্যাগ এবং ব্রহ্মচর্যের পাঠ নিয়ে কামিনী-কাঞ্চনের ব্যাপারটা বড়-লোকদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। আমাদের বঞ্চনাকে ওরা হিসেব করে পুষিয়ে নেবে।

এমনি যখন মনের অবস্থা হয়ে উঠেছে তখন একদিন সন্ধ্যায় দেখলাম সেই মেয়েটিকে।

"টিকিট?"

"ছ পয়সা—এসপ্ল্যানেড"—

তাকালাম, "এসপ্ল্যানেড!"

ও মাথা নেড়ে বিষণ্ণভাবে হাসল।

দাঁতে দাঁত ঘষলাম। দাঁড়াও রাক্ষসী, তোমাকে অপমান করার দিন পাব।

কিন্তু কি বিশ্রী হয়ে গেছে মেয়েটা! কানের রিং দুটো ছাড়া যে আর সোনা নেই গায়ে! হাতে আবার চুড়ি ফিরে এসেছে, গলায় নকল মোতির মালা।

এসপ্ল্যানেডেই নেমে গেল ও।

তারপর অনেকদিন দেখিনি। অনেক দিন।

লোহার লাইনে শব্দের তরঙ্গ তুলে, আমার ট্রাম যখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে ময়দানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে তখন মাঝে মাঝে মেয়েটার কথা বিদ্যুৎ-চমকের মতোই মাথার মধ্যে খেলে গেছে। বোধহয় ময়দানকে দেখেই মনে পড়েছে। দিনের বেলা ময়দানের সবুজ, স্নিগ্ধ আলো-টলমল রূপটি দেখে আমার তার রাতের রূপের কথা মনে পড়েছে। নির্জন, অন্ধকার ময়দানে হয়তো ঐ মেয়েটা এখনো যায়। চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে বা চলতে চলতে কারো গায়ে পড়ে ভাব জমিয়ে হয়তো কোনো কুলি কিংবা কোনো গাড়োয়ানকে বগলদাবা করে ঐ ময়দানেরই কোথায় গিয়ে মাঝে মাঝে মেয়েটা বসে—তারপর—

"টিকিট করেছেন? আপনার টিকিট? টিকিট মশাই?"

ঢং ঢং—

আমার ট্রাম চলেছে। দিন গেছে, রাত গেছে। তবু আমার ট্রাম চলেছে। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে আমার প্রতিদিন শক্তি বেড়েছে। আমার লোহার রথের উদ্দাম গতি আর যৌবন চাঞ্চল্য আমাকে প্রতিদিনই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে লোহার মতো কঠিন না হলে, লৌহযানের মতো একরোখা না হলে কখনো জীবনকে বদলানো যাবে না।

দিন কেটেছে আর একটু একটু বদলেছি।

কিন্তু এর মধ্যে আর দেখিনি সেই মেয়েটাকে। মনে হয়েছে যে আমাকে এড়িয়ে সে গাড়িতে চড়ে তার নৈশ অভিযানে যায়। আমি তার উত্থান-পতনের সেই বিয়োগান্ত কাহিনীর আংশিক সাক্ষী—আমার সামনে দাঁড়াতে যে লজ্জা করে।

কিন্তু দেখা আবার হল। উনপঞ্চাশে। তখন বৈশাখ মাসের শেষ। রাতের বেলা ফিরছি বালিগঞ্জের দিকে। এসপ্ল্যানেড ছাড়তেই কাল বৈশাখী এল। রাস্তায় লোকজন কমে গেছে, রাত নিঃশব্দ হয়ে আসছে, মনের সুখে ঝড় উড়িয়ে হা হা করে ছুটল। কিন্তু কী যায় আসে তাতে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার ট্রাম ছুটল। ড্রাইভার রামবিরিজ দুবের মনেও ঝড়ের দোলা লাগল। ঝড়ের বুক চিরে ট্রাম ছুটল। কিন্তু যাদুঘরের কাছাকাছি স্টপে কে যেন হাত তুলল! থামল ট্রাম। একটি মেয়েলোক উঠল। আবার ট্রাম ছুটল।

"টিকিট"—

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "পয়সা নেই"—

খেঁকিয়ে উঠলাম, "নেই তো উঠলে কেন? নেমে যেতে হবে"—

মেয়েলোকটি আমার দিকে তাকাল। ঝড়ো হাওয়াকে চিরে আমার ট্রাম তখন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছিটিয়ে চলেছে, হাওয়া এসে চোখের ওপর চিলের মতো ঝাপটা মারছে, তবু চিনলাম। সেই মেয়েটি।

"তুমি!"

মেয়েটি বলল, "রাত হয়েছে, বাড়ি ফিরতেই হবে"—

অনেকদিনের আক্রোশ জমা ছিল, বললাম, "একদিন চড় মেরেছিল তোমার সেই দুদিনের নাগর মনে আছে?"

সে বলল, "মাপ করুন দাদা"—

দাদা! বুকের ভেতর যেন হাতুড়ি পড়ল একটা।

মেয়েটি বলে চলল, "আজ কিছুই পাইনি—ওদিকে ছেলেটির জ্বর, একা পড়ে আছে বাড়িতে"—

খুক্ খুক্ করে কাশতে শুরু করল সে। তাকালাম। কালো কুচ্ছিত হয়ে গেছে তার চেহারা, বুড়িয়ে গেছে। ছ বছর আগেকার সেই গালভাঙা, শীর্ণ চেহারা আবার ফিরে এসেছে কিন্তু সেদিন অল্প বয়সের ছাড়পত্র ছিল

দেহে, আজ কোনো সম্বলই নেই। সাধারণ মোটা একটা মিলের শাড়ি পরনে। নিরাভরণ।

"দাদা"—

বললাম, "বোসো।"

ঝড়ের শব্দ থেমে গেল আমার কানে। ট্রামের চাকার লৌহ-সংগীত যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। করুণ, বিষণ্ন সেই পুরনো ভঙ্গিতে বসে রইল মেয়ে। লোক উঠল, নামল, টিকিট দিলাম, পয়সা নিলাম আর তারি ফাঁকে ফাঁকে সেদিন মেয়েটির জীবনের টুকরো টুকরো খবর নিলাম। ছ-বছর ধরে দেখেছিই শুধু, অথচ ওর জীবনের কিছুই তো জানি না।

ওর নাম ছিল বাসনা। মা ছিল না, বাপ কোন ছুতোরের দোকানে কাজ করত। টাইফয়েডে বাপ মরল। ও এল ওর দিদির ওখানে ভবানীপুরে। ভগ্নীপতি কাজ করে কোন মোটর কোম্পানিতে। কিছুদিন বাদেই ভগ্নীপতি কলেরা হয়ে মরল। দুইবোন অন্ধকার দেখে। তিনটি বাচ্চা আছে আবার দিদির। শেষ পর্যন্ত দুইবোন রাস্তায় বেরলো। দুজন দুদিকে যেত! পাড়ার মধ্যে ওসব করলে ইজ্জত থাকবে না। এমনি ভাবে চলতে চলতে অবস্থা একটু ফিরল। হঠাৎ কালোবাজারের সওদাগরকে পাকড়াও করে বাসনা। মিথ্যা এক কাহিনীর জৌলসে সওদাগর তাকে আনকোরা ভেবে আলাদা এক ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলল। কিন্তু সওদাগরের ফুর্তির দিকেই ঝোঁক। বাচ্চাটা হতেই রস উড়ে গেল তার। তারপর একদিন নিরুদ্দেশ হল সে। আবার সব গেল। হতভাগী ঘর বাঁধতেই চেয়েছিল, ফলে মনের ওপর আঘাত পড়ল। একের পর একগয়না আর টাকা সব গেল। সেই সংগে স্বাস্থ্য গেল। দিদির সংগে তুমুল ঝগড়া করে অন্য বাসা করল সে। কিন্তু কঠিন ব্যাধি হল। তা স্বত্বেও আবার নতুন করে বেরোতে লাগল সে, কিন্তু আগের মতো আর জমল না। দেহে ঘুন ধরেছে—

খুক্ খুক্ কাশতে লাগল মেয়েটা। তার দুচোখ দিয়ে জল গড়ায়।

কালীঘাটের মোড় এল।

"যাই দাদা"—নেমে গেল সে। ধুলোয় ঘুর্ণির মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়ে আমার ট্রাম বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে গেল।

ট্রামের চাকায় চাকায় হঠাৎ যেন শব্দ উঠল—"দাদা-দাদা দাদা"—

তারপর আরো দুবার দেখা হয়েছিল।

প্রথমবার দিনের বেলা। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের কাছে সংগে তার ছেলে।

ছেলেটাকে সেই কবে দেখেছিলাম। এখন সে পাঁচ বছরের। রোগা খিটখিটে।

"চড়ব দাদা—জ্বর হয়েছে, আর হাঁটতে পারছি না।"

"ওঠ।"

উঠে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। সংকোচে।

বললাম, "বসো।"

বসল। সেই করুণ, বিষন্ন ভঙ্গিতে। চোখের দৃষ্টিতে আর সেই ধার নেই। ঘোলাটে, মৃত দৃষ্টি! খুক্ খুক্ করে কেশে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটা নাকিসুরে কাঁদিতে লাগল সারা রাস্তা, "খিদে পেয়েছে—কখন খেতে দিবি? বল্ না, কখন খেতে দিবি? এই রাককুসী"—

সমানে শুনে গেল মেয়েটা। নড়ল না, কথাটি বলল না। শেষ দেখা 'পূর্ণ'র সামনে। ফুটপাতে ছেলেটাকে নিয়ে বসে আছে। ছেলেটা ভিক্ষে চাইছিল, "ও বাবু—খিদেয় মরে যাচ্ছি, বাবু ও বাবু—"

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দেখেছিলাম। তারপর ট্রাম ছেড়ে দিয়েছিল। ফিরেও তাকাইনি। তাকালেই 'দাদা' ডাকটা মনে পড়ে। তার চেয়ে না তাকানোই ভালো।

এর পর মেয়েটাকে আর দেখিনি। কিন্তু ছেলেটাকে দেখেছিলাম মাস ছয় পরে। পঞ্চাশ সালে।

একজন কনেস্টবল ছেলেটাকে নিয়ে কালীঘাটের মোড়ে আমার ট্রামে উঠল।

যাত্রীরা প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার? চুরি করেছে?"

কনস্টেবল মাথা ঝাঁকল, "উহুঁ ওর মা মরেছে—"

"কেন? কি হয়েছিল?"

"ব্যামো। ঘরে মরে পড়ে ছিল—এই ছোঁড়া কাঁদছিল—যাচ্ছি থানায় নিয়ে রিপোর্ট দিতে।"

"তা এখন কি হবে ছেলেটার?"

"ওর কে এক মাসি আছে—সেখানে যাবে। সরকার এখন দেশশুদ্ধ অনাথের বোঝা বইবে নাকি?"

"তাতো নিশ্চয়ই সিপাইদাদা—তা কি করে বইবে।"

ছয়মাস আগে ছেলেটাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। আজ কিন্তু ছোঁড়া কাঁদল না।

কিন্তু আশ্চর্য। মেয়েটা মারা গেল। সেই কবে থেকে দেখে আসছিলাম। কত চেনা হয়ে গিয়েছি!

ট্রামের চাকায় যেন প্রতিধ্বনি উঠল, "দাদা—দাদা—দাদা—"

তবু কিছু করতে পারলাম না ছেলেটার দিক থেকে মুখটা শুধু ফিরিয়েই নিলাম।

সেই ছেলেটা একটু আগে জগুবাবুর বাজারে যে আমাকে গাল দিয়ে নেমে গেল কিন্তু ও থাকে কোথায়? মাসির ওখানে? নিশ্চয়ই না ও থাকে রাস্তায়, ফুটপাথে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির বারান্দায়। স্বাধীন কুকুর কিংবা ইঁদুরের মত।

ট্রামটা থামল। আমার ট্রাম এখন ড্যালহাউসি ছুঁয়ে আবার বালিগঞ্জে ফিরছে। ভিড় কম।

যাদুঘরের স্টপ থেকে একটি মেয়ে উঠল সেকেন্ড ক্লাশে।

"টিকিট।"

মেয়েটি তাকাল, বলল, "কালীঘাট।"

টিকিট দেবার সময় চিনতে পারলাম। সেই একই চোখের চাউনি।

বাসনারই মতো আর একটি মেয়ে। বাসনা মরলেও ওদের দল বাড়ছে। সবংশে।

মুখটা ফিরিয়ে নিলাম। ট্রামের চাকার লোহার গান শুনতে শুনতে দাঁতে দাঁতে ঘসলাম। আমার প্রতি নখের ডগা দিয়ে যেন বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ বেরোতে চাইল। কিন্তু তবু কিছুই করতে পারলাম না। শুধু একজন যাত্রীর কাছে গিয়ে হঠাৎ অকারণে চেঁচিয়ে উঠলাম, "টিকিট—টিকিট মশাই?"

কন্যা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ দত্ত তার চেম্বারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল। সিনিয়রের আদেশ নির্দেশের জন্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল ভবেশের তরুণ সহকারী সুরজিৎ সেন। খানিক-বাদে রোগীর দিকে তাকিয়ে বরাভয়ের হাসি হাসল ভবেশ, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই মিঃ লাহিড়ী। তবে চশমা আপনাকে নিতেই হবে।'

রোগী ক্ষীণ আপত্তি করল, 'না নিলে চলবে না?'

ভবেশ স্মিত মুখে মাথা নাড়ল, তারপর সহকারীর দিকে তাকাতেই সে রোগীকে বলল, 'মিঃ লাহিড়ী, আপনি আমার সঙ্গে এঘরে আসুন।'

একজন রোগীর জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেওয়ার জো নেই ভবেশের। বাইরের বসবার ঘরে আরও পেশেণ্ট অপেক্ষা করছে। কেসগুলি দেখে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে। হার্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ নাগের বাড়িতে পার্টি আছে। তাঁর মেয়ের আজ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সস্ত্রীক ভবেশের নিমন্ত্রণ। সেজেগুজে ডলি হয়ত এতক্ষণ ছটফট শুরু করেছে।

অ্যাসিস্টাণ্টের দিকে তাকিয়ে ভবেশ বলল, 'সুরজিৎ, প্রিন্সিপ্যাল সেনের রেকমেণ্ডশন নিয়ে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে ডাকো এবার। আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম। গুরুদক্ষিণা প্রতি বছরই কিছু কিছু দিতে হয়। তিনি যেসব পেশেণ্ট পাঠান, তা হয় অর্ধ মূল্যে না হয় বিনামূল্যে।'

ভবেশ একটু হাসল, সে হাসি দাক্ষিণ্যের নয়।

সুরজিৎ বলল, 'স্যার, নলিনী দেবী নামে একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তিনি আমাকে এরই মধ্যে কয়েকবার অনুরোধ করেছেন, তাঁর কেসটা একটু আগে দেখে দেওয়ার জন্যে। তিনি অনেক দূর—সেই দমদম থেকে এসেছেন।'

ভবেশ এবার কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল, 'খুব যে ওকালতি করছ, জানাশোনা আছে নাকি?'

সুরজিৎ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না স্যার।'

'তবে আর কি, একটু বিশ্রাম করুন না বসে। দমদমের বাস রাত বারটা পর্যন্ত চলে। এখনতো সবে ছটা। কারো চিঠিপত্র নিয়ে এসেছেন নাকি?'

সুরজিৎ বলল, 'সেকথা তো কিছু বলেন নি।'

ভবেশ বলল, 'তবে? তুমি এত সুপারিশ করছ কোন ভরসায়? দেখে-শুনে কি মনে হয়? ষোল টাকা ভিজিট দিতে পারবে না শেষে ধরাপড়া শুরু করবে?'

সুরজিৎ একথার কোন জবাব দিল না। সহকারীর কাছে এতখানি স্থূলতা প্রকাশ ক'রে নিজেই যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল ভবেশ। সুরজিতের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে পরিহাস তরল স্বরে বলল, 'আচ্ছা ডাকো, তোমার নলিনী দেবীকেই ডাকো।'

মিনিট খানেক বাদে নবাগতাকে সঙ্গে নিয়ে এল বেয়ারা। আর তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ ডাক্তার বলে উঠল, 'তুমি!'

তারপর সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা তুমি যাও সুরজিৎ। লাহিড়ীর কেসটা অ্যাটেন্ড করো গিয়ে। আমি এসে দেখছি।'

হাসি গোপন করে সুরজিৎ পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর একটু কাল চুপচাপ রইল দুজনে। একটু সময় নিল ভবেশ। ভারি রোগাটে হয়ে গেছে নলিনীর চেহারা। মুখে কিসের একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। হিসেবমত বয়স তো এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। কিন্তু দেখে মনে হয়, আরও বেশি। সেই রঙের জলুস রূপের ঔজ্জ্বল্য আর নেই নলিনীর। বেশবাসও খুব সাধারণ রকমের। কম দামী শাদা খোলের একখান তাঁতের শাড়ি পরনে, খয়েরী রঙের পাড়, আধখানা আঁচল মাথায় তুলে দিয়েছে। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি বেশ পুরু আর স্পষ্ট। গলায় একগাছি সরু হার আছে। আর হাতে দুগাছি চুড়ি। এছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

ভবেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।'

ঠিক সামনাসামনি বসল না নলিনী, পাশের গদি আঁটা বেঞ্চটার এক কোণে গিয়ে বসল। তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি।'

ভবেশ বলল, 'তা জানি। আমার কাছে অদরকারে কেউ আসে না। তোমার চোখে অসুখ হয়েছে? কি ট্রাবল বলো।'

নলিনী একটু হাসল। 'তুমি নিজে নিশ্চয়ই মনে মনে জানো চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।'

ভবেশ বলল, 'ও। কিন্তু অন্য কোন রোগের চিকিৎসা তো আমি আজকাল আর করিনে। তাতে আমার নিজের প্র্যাকটিস সাফার করে। তাছাড়া সময়ও হয় না।'

নলিনী এবার চোখ তুলে ভবেশের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার দামী সময় তাহলে আর নষ্ট করব না। আমার কথাটা বলি। গীতার সম্বন্ধ ঠিক করেছি।'

ভবেশ ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'গীতা! গীতা কে!'

এ প্রশ্নের জবাবে নলিনীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। চোখ নামিয়ে একটুকাল চুপ করে রইল নলিনী।

ভবেশের এবার মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার মুখে।

'ও তোমার সেই মেয়ে? বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছ? বেশ বেশ, তা আমি কি করতে পারি বলো। টাকার দরকার বুঝি, কত টাকা দিতে হবে বলো।'

কোটের পকেট থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক বইটা বের করে ফেলল ভবেশ।

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমি টাকার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।'

'তবে?'

নলিনী মৃদুস্বরে বলল, 'বিয়ের চিঠি এখনো ছাপতে দিইনি। তুমি যদি অনুমতি দাও, তোমার নামে চিঠিটা ছাপতে দিই।'

ভবেশ স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর আস্তে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'তুমি নিজেই জানো নলিনী কি অসঙগত অসম্ভব প্রস্তাব তুমি করছ। অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে উনিশ বছর আগেই তা করে ফেলতাম। তোমার বাবা-মা অনেক তখন চেষ্টা করে দেখেছিলেন। উৎপীড়ন অত্যাচারের কিছুই বাকি রাখেননি।'

'তাঁদের কথা আর কেন তুলছ। তাঁরা তো আর নেই।'

'কিন্তু তুমি তো আছ। তোমার তো কিছুই ভুলে যাওয়ার কথা নয়। তবু তুমি কোন সাহসে—'

নলিনী বলল, 'সাহসের জোরে আসিনি। ভেবেছিলাম মেয়েটার সুখশান্তির কথা ভেবে তোমার মনে যদি একটু দয়া হয়, তোমারও তো ছেলেমেয়ে হয়েছে।'

ভবেশ একটু হাসল, 'তা হয়েছে। কিন্তু এতো শুধু দয়ামায়ার কথা নয় নলিনী, এর সঙ্গে মানমর্যাদার প্রশ্নটাও জড়িয়ে রয়েছে যে। জানো তো এই কলকাতা শহরে আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা করে খেতে হয়—।'

নলিনী বলল, 'তা জানি। আমারই ভুল হয়েছিল। অনর্থক তোমাকে বিরক্ত করে গেলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো।'

মুহূর্তকাল দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনে হলো আশাভঙ্গে নলিনীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

ভবেশ বাধা দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যাও। কোথায় থাকো আজকাল?'

নলিনী বলল, 'তোমাদের বালীগঞ্জ থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক, রাস্তার নাম ঠিকানা বলো' নলিনীর ঠিকানাটা পকেট ডায়েরিতে লিখে নিল ভবেশ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি কর আজকাল? মাস্টারী?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'দমদমেরই একটা স্কুলে।'

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ ফের জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মেয়ের বিয়ে কবে?'

'দিন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম তো এই শ্রাবণ মাসের মধ্যেই, দেখি কি হয়।'

ভবেশ বলল, 'তাহলে তো এখনো দেরি আছে।'

'দেরি আর কই। সপ্তাহ দুই মাত্র বাকি। এখনোতো সবই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা যাই তোমার রোগীরা নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।'

ভবেশ বলল, 'রোগীদের ডাক্তার কি করছে তা বললে না।'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী বেরিয়ে গেল।

নলিনী চলে যাওয়ার পর কি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ভবেশ।

একবার ভাবল অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে দেয় তার মাথা ধরেছে। সব রোগীকে আজকের মত বিদায় করে দিক, কিন্তু তাকি ভবেশের মত একজন মর্যাদাবান ডাক্তারের পক্ষে শোভন হবে? তাই সে অশোভন কিছু করল না। যন্ত্রের মত কাজ করে গেল। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগী দেখল, সুরজিৎকে পরের দিনের কাজ সম্পর্কে যথারীতি উপদেশ নির্দেশ দিল, তারপর ধর্মতলার সেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটল বালীগঞ্জের দিকে। ড্রাইভ করতে গিয়ে মোটেই অন্যমনস্ক হয়ে অপটু হাতের পরিচয় দিল না ভবেশ। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনের মতই বাড়ি এসে পৌঁছল।

স্টেশন রোডের এই ছোট্ট শাদা দোতলা বাড়িটি ভবেশ সম্প্রতি তুলেছে। এ-বাড়িকে সাজিয়ে তুলবার ভার নিয়েছে ডলি নিজে। সামনে সারি সারি দেশী-বিদেশী ফুলের টব। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা। শোয়ার ঘরে শেডে ঢাকা নীলচে নরম আলো। বাড়িতো নয়, আর্টিস্টের আঁকা বাড়ির একখানি ছবি।

আর ছবির মতই সুন্দর ভবেশের স্ত্রী ডলি; বিলাত থেকে ফিরে এসে ভবেশ ওকে বছর দশেক হলো বিয়ে করেছে। স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, বয়স এখন সাতাশ আঠাশ হবে। দুটি ছেলে হয়েছে। কিন্তু ডলিকে দেখে কে বলবে তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। তা ভবেশকে দেখেও তার আসল বয়েস বুঝবার জো নেই। পুষ্টিকর খাদ্যে, বাঁধা নিয়মকানুনে নিজের স্বাস্থ্যকে সে অটুট রেখেছে। না রাখলে কি চলে। নিজের চেহারা ডাক্তারের পেশার পক্ষে একটা বড় বিজ্ঞাপন। তেতাল্লিশ পেরিয়ে গেলেও ভবেশকে দেখলে মনে হয় না যে, তার বয়স তেত্রিশ বছরের ওপরে।

স্বামীকে দেখে ডলি একটু অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'আজও তোমার সেই সাড়ে আটটা। পাঁচ মিনিট আগে ফিরতে পারলে না বুঝি। ডাঃ নাগের মেয়ের জন্মদিনে যেতে হবে না! দেরি দেখে তিনি কি ভাবছেন বলতো।'

ভবেশ হেসে বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। তিনি নিজেও তো ডাক্তার। তিনি জানেন আমাদের সময় আমাদের হাতে নয়, রোগীদের মুঠোয়।'

একবার অবশ্য ইচ্ছা হলো যে, ডলিকে বলে তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে। আজ আর সে নিমন্ত্রণে যাবে না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে লজ্জা হলো ভবেশের। তাছাড়া একবার যদি বলে ফেলে, তার শরীর ভালো নেই, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। ডলি হাজার প্রশ্ন তুলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর শরীর ভালো না থাকার তো কোন কারণ নেই। কেন এমন একটা দৌর্বল্যের প্রশ্রয় দেবে ভবেশ?

তাই ভবেশ গাড়িতে চড়ে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেল। সেখানকার সমশ্রেণী, সমবয়সী ও সমব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প ঠাট্টা তামাসা করল, তারপর ফিরে এল বাড়িতে। না, আজকের চেম্বারের সেই ছোট একটু ঘটনায় ভবেশ ডাক্তারের মনে কি আচরণে কোন বৈলক্ষণ্যই ঘটেনি, যদি ঘটত তাহলে ডলি অন্তত সে কথা উল্লেখ না করে ছাড়ত না, স্বামীর চালচলন আচার আচরণ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ, ডলি ভবেশের ব্যারোমিটার। বিছানায় শুয়ে স্ত্রী যখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তখন ভবেশেরও ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু বার বার ঘুমোবার চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না ভবেশ, উনিশ বছর আগেকার টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

নলিনীর সঙ্গে আজ যদি বেশি রূঢ় ব্যবহার করে থাকে ভবেশ তা মোটেই অন্যায় হয়নি। তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। উনিশ বছর আগে এই নলিনী ভবেশকে বড়ই প্রবঞ্চিত করেছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মুখ দেখাবার আর জো ছিল না ভবেশের। তখনকার সেই প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তের কথা আজও ভবেশের সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তাদের যশোহর শহরেরই প্রতিপত্তিশালী পসারওয়ালা উকিলের মেয়ে নলিনী, তার রূপের খ্যাতি শহর ভরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভবেশের বাবারও খ্যাতি প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না। শহরে ছ'খানা বাড়ি, গাঁয়ে তালুকদারী, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সম্মান ছিল অমূল্য দত্তের। ভবেশ তখন মেডিক্যাল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুধু যে কলেজেই তার খ্যাতি তা নয়, খেলার মাঠে, ক্লাবের বক্তৃতায় তার সমান নৈপুণ্য। তাই ভবেশের সঙ্গে যখন নলিনীর সম্বন্ধ এল সবাই বলল, এ একেবারে রাজজোটক, ভবেশের বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে এলেন, এসে বললেন, এমন সুলক্ষণা মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নি। শুধু রূপ নয় গুণ যোগ্যতাও যথেষ্ট। ধনীর মেয়ে হলে কি হবে রান্নাবান্না সেলাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সব কাজ সে জানে। লেখাপড়া অবশ্য ঘরেই করেছে। ইংরেজী বাংলা যতটুকু শিখেছে একেবারে

পাকা। হাতের অক্ষরগুলি একেবারে মুক্তোর মত। পণযৌতুকের যা ফর্দ পাওয়া গেছে তাতে অভিজাত পরিবারের মর্যাদা বজায় থাকবে।

ভবেশ অবশ্য মাথা নাড়ল, উঁহু সে পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করবে না। বিয়ে যদি আদৌ করে, ডাক্তারী পাশ করে প্র্যাকটিস জমিয়ে তার পরে।

নলিনীর বাবা জিতেন বোস বললেন, 'বেশ তো বিয়ে না হয় ক বছর পরেই হবে মেয়ে দেখে ভবেশের পছন্দ হয় কিনা সেইটাই বড় কথা।'

কিন্তু নলিনীকে দেখে আসবার পর ভবেশের মত বদলাতে আর দেরি হলো না। বন্ধুমহলকে জানিয়ে দিল শুধু পাঠ্যাবস্থায় কেন যে কোন অবস্থায় এ মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

ছেলের বাবা মেয়ের বাপ দুজনেই মুখ মুচকে হাসলেন। খুব ঘটা পটা আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হলো ভবেশের। শহরে প্রায় অর্ধেক লোক বিয়ের রাতে বউভাতে দু বাড়িতে পোলাও মাংস খেল।

ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিল ভবেশ, হেসে বলল, 'তুমি এত লাজুক কেন, মোটে কথাই বলছ না।' স্ত্রীর কাছ থেকে তবু কোন সাড়া না পেয়ে তার সুন্দর কোমল চিবুকটি তুলে ধরল ভবেশ। আর সংগে সংগে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল তার হাতে ঝরে পড়ল।

ভবেশ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'একি তুমি কাঁদছ! ছিঃ, আজকের দিনে কেউ কাঁদে নাকি। কি হয়েছে বলো, তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?' নলিনী মৃদু স্বরে বলল, 'না।'

শুধু না আর না, আর শুধু কান্না। কিন্তু রূপবতীর কান্নারও রূপ আছে। যার চোখ সুন্দর তার চোখের জলও সুন্দর। ভবেশ ভাবল হয়ত বাবা মা ভাই-বোনদের জন্যেই মন কেমন করছে নলিনীর। যদিও তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি সাত সমুদ্রের এপার ওপার না, নেহাতই এপাড়া থেকে ও-পাড়ায়; তবু আদুরে মেয়ের প্রথম প্রথম মন খারাপ হয়ে যাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বুকে টেনে নিল ভবেশ। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরে দিল। একটু নোনতা স্বাদ লাগল অবশ্য। কিন্তু ভবেশ তা গ্রাহ্য করল না। সে কি জানে সেই কটুস্বাদ শুধু প্রথম রাত্রের না, তা জীবনের সমস্ত দিন রাত্রির।

ধরা পড়ল এক মাস পরে। অবশ্য তারও কিছুদিন আগে থেকে ভবেশদের অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে ফিসফিস শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক পরে কলঙ্কের কথাটি একেবারে সশব্দে উচ্চারিত হলো, দু মাসের অন্তসত্ত্বা অবস্থায় নলিনীর বিয়ে হয়েছে।

ভবেশের বাবা মা সংগে সংগে বলে উঠলেন, এখনই ত্যাগ কর, এখনই ত্যাগ কর। ও আপদ দূর করে দাও বাড়ি থেকে। ভবেশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে

বলল, 'তোমার চোখের জলের মানে এতদিন পরে বুঝলুম। কিন্তু এত কলঙ্ক, এত কালি কি ওই দু এক ফোঁটা জলে ধুয়ে যায়!'

নলিনীর চোখে এখন আর জল নেই। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না তা যায় না।'

ভবেশ বলল, 'তা যদি জানো তবে আমাকে এমন করে ঠকালে কেন?' একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা! তোমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই নলিনী। যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে তাকেই কেন বিয়ে করলে না?'

নলিনী তেমনি মুখ নিচু করে বলল, 'আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে—'

এর পর নলিনী শুধু কাঁদতে লাগল। কাউকে আর কোন কথা সে বলল না, কি বলতে পারল না।

নলিনীর বাবা জিতেনবাবুকে খবর দেওয়া হলো, দোর এ'টে দুই বেয়াইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। বাইরে থেকে মাঝে মাঝে তর্জন গর্জন শোনা গেল। মনে হলো দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলছে। কিন্তু সে যুদ্ধ তখনকার মত বাকযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে নলিনীর বাবা বেরিয়ে এলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে চলে গেলেন মেয়েকে নিয়ে। যাওয়ার আগে নলিনী নাকি ভবেশের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভবেশের বাবা-মা তাতে রাজী হননি। ভবেশের নিজেরও কোন আগ্রহ ছিল না। লজ্জায় ধিক্কারে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তার মত চতুর আর বুদ্ধিমান ছেলেকে কেউ কোনদিন ঠকাতে পারেনি। বন্ধুর দল হাজার চেষ্টা ক'রেও তাকে কোন বছর এপ্রিল ফুল করতে পারেনি। আর সারা জীবনের মত তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে। হাজার শাস্তি দিলেও কি এই প্রবঞ্চনা, প্রতারণার শোধ যায়।

বাড়ির ঝি চাকরের কল্যাণে কথাটা মোটেই চাপা রইল না। সারা শহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল। ভবেশ যেখানেই যায় মনে হয় একটু আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, আধাপরিচিত ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়, সে মুখ টিপে হাসছে। ভবেশ অস্থির হয়ে উঠল। মানুষ জনের সঙ্গ সহ্য হয় না, নির্জনতাও অসহনীয়।

ওপক্ষ থেকে মিটমাটের নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, প্রথমে ওরা খুব অনুনয় বিনয় করেছিল, যা হয়ে গেছে তারতো আর চারা নেই। একটি মেয়ের সর্বনাশ ক'রে লাভ কি। ভবেশ দয়া করুক, ক্ষমা করুক, সে মেনে নিক। কিন্তু ভবেশ তাতে রাজি হয়নি। তার বাবা-মা আরো অরাজি ছিলেন।

তারপর শুরু হ'ল শত্রুভাবে ভজনার পালা। জিতেন বোস শাসালেন তিনি

মামলা করবেন। তাঁর মেয়ের নামে অযথা অপবাদ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী করবেন, খোরপোষের নালিশ আনবেন। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রাজদ্বারে আর গেলেন না। নিজেই রাজার ভূমিকা নিলেন। দত্তদের বাড়ির ছেলেরা খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে বোসেদের বাড়ির লোকজনের হাতে মার খেল। আর একদিন বাজারের ধার দিয়ে ফেরার সময় বোসেদের বাড়ির ছেলেদের মাথায় ইঁট পড়ল। এমনি চলল মাস দু'তিন। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর নদীর ধারের নির্জন পথ থেকে দুই ভোজপুরী দরোয়ান ভবেশকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে হাজির করে দিল।

জিতেন বোস তাঁর অন্দর মহলের এক নির্জন ঘরে নিয়ে জামাইকে অনেক বোঝালেন। একবার পিঠে হাত বুলালেন, আর একবার সশব্দে টেবিল চাপড়ালেন। ভাবখানা এই, কথা না শুনলে সে চাপড় ভবেশের গালেও পড়তে পারে। শাশুড়ী, পিস শাশুড়ীরা করলেন গুণজ্ঞানের চেষ্টা। চায়ের সঙ্গে কি একটা শিকড় বাটা যেন খাইয়ে ছিলেন তাঁরা। বার দুই বমি ক'রে ভবেশ সেই বশীকরণের উদ্যোগকে নিষ্ফল ক'রে দিল। ভয় পেয়ে জিতেনবাবুই শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ক'রে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জামাইকে। সেই সময় এক টুকরো চিঠি হাতে এসে পেঁছেছিল ভবেশের। 'ওঁদের কাণ্ড দেখে মরি। আমাকে ভুল বুঝো না। চিঠি লেখার ছলে স্পর্ধাকে ক্ষমা করো।'

কিন্তু শিকড় বাটা খেয়ে ভবেশের তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। সে ভাবল এও আর এক ধরনের মন্ত্রতন্ত্র। বশীকরণের রকমফের। সে চিঠি ভবেশ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

তারপরও দুই পরিবারের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। কিন্তু তার সাক্ষী হিসাবে ভবেশ আর যশোহরে উপস্থিত ছিল না। এম. বি. পাশ ক'রে সে বিলাত চলে যায়। তাই স্পেশালিস্ট হয়ে যখন ফিরে এল, তখন শহরের অদল বদল হয়েছে। বোসেদের সেই দাপট আর নেই। জিতেনবাবু মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী বেঁধেছে। দাদাদের সংসারে নলিনীর স্থান হয়নি। কোলের মেয়ে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে জীবিকার সন্ধানে।

আর সাফল্যের গৌরবে ভবেশের সেই প্রবঞ্চিত হওয়ার ইতিবৃত্ত চাপা পড়ে গেছে। বাড়ি গাড়ি যশ অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবই পেয়েছে ভবেশ। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছে। জীবনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই, আশ্চর্য তবু সারারাত ঘুম এল না ভবেশের। একখানি ম্লান মুখ তার বিনিদ্র চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল। আর বহুকাল আগের সেই একটি ফুলশয্যার রাত। শিশিরে ভেজা পদ্মের মত একখানি মুখ।

এতদিন পরে ভবেশের মনে হলো নলিনীর হয়ত তত অপরাধ ছিল না।

কিন্তু বাবা-মা তখন মাথার ওপর। সে অবস্থায় ভবেশ কিই বা করতে পারত। এখনো নলিনী যা বলছে তা করবার সাধ্য অবশ্য ভবেশের নেই। আগে ছিলেন বাবা-মা এখন নিজের মান-মর্যাদা। যে সমাজে সে বাস করে, তার রীতিনীতি আচার-আচরণ তাকে মানতেই হবে। যাতে ডলির আর বিশু যীশুর মুখ নীচু হয়, এমন কাজ সে কিছুতে করতে পারে না।

এই ঊনিশ বছরের মধ্যে নলিনীর সঙ্গে আরো বার দুই ভবেশের দেখা হয়েছিল। বউবাজারে এক আত্মীয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল ভবেশ। গিয়ে দেখে নলিনী সেখানে এসেছে। শুধু চোখের দেখা। তারপর নলিনী বোধ হয় লজ্জা পেয়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ভবেশও সরে পড়তে পারলে বাঁচে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি তখন সঙ্গে আছে। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ডলির কাছে অবশ্য ভবেশ কিছুই গোপন করেনি। প্রথম জীবনের লজ্জাকর সেই ঘটনার কথা স্ত্রীকে সে বলেছিল। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছিল নিজের জীবন কাহিনী থেকে সে অধ্যায়টি ভবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে।

ডলি জবাব দিয়েছিল, 'মুছে ফেলাই তো উচিত। তাছাড়া তুমি আর কি করতে পারতে।'

তারপর আরো একবার আকস্মিকভাবে কলেজ হাসপাতালের আউট ডোরে ভবেশের দেখা হয়েছিল নলিনীর সঙ্গে। ঠিক দেখা হওয়া নয়, নলিনী দূরে থেকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ভবেশ ডাঃ সান্যালের করিডরে দাঁড়িয়ে একটি পেশেন্টের কেস নিয়ে আলোচনা করছিল। সান্যালই ভবেশকে ইশারা করে বলল, 'ওহে দত্ত, ভদ্রমহিলা বোধ হয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

চোখ ফেরাতেই ভবেশ দেখল, নলিনী দাঁড়িয়ে আছে। সান্যাল চলে যাওয়ার পর ভবেশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি এখানে।'

নলিনী বলল, 'থ্রোট ডিপার্টমেন্টে এসেছিলাম।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার গলায়?'

নলিনী একটু হেসেছিল, 'আমার গলায় আবার কি হবে। আমার একটি ছাত্রীর টনসিলিটিস, অপারেশন কেস। তাকে ভর্তি করাতে এসেছিলাম।'

'ভর্তি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ভবেশ আর জিজ্ঞেস করেনি ই টি এন ছেড়ে আই ডিপার্টমেন্টের এদিকে নলিনী কোন কাজে এসেছিল।

একটু বাদে নলিনীই নিজে থেকে বিদায় নিল। 'যাই এবার। ভালো আছো? ছেলে দু'টি ভালো তো?'

ভবেশ বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কুশল প্রশ্নের বিনিময়ে আর কোন কুশল প্রশ্নের কথা ভবেশের মনে হয়নি। জিজ্ঞেস করেনি কোথায় আছে, কি করছে নলিনী। বরং ভবেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল পাছে এই দেখা সাক্ষাৎ আর কারো চোখে পড়ে যায়। পাছে কোন বন্ধুর কৌতূহল মেটাতে হয়। অনেক সহকর্মীরই তো যাতায়াত আছে ভবেশের বাড়িতে। পাছে তারা কেউ গিয়ে ডলির কাছে এই সাক্ষাৎকারের গল্প করে।

ভবেশের দুর্বলতার কথা নলিনী কি টের পেয়েছিল? কে জানে?

ভোরে উঠে ডলি বলল, 'ব্যাপার কি, তোমার কি কাল ভালো ক'রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লালচে হয়েছে যে।'

ভবেশ অনিদ্রার কথাটা জোর ক'রে অস্বীকার ক'রে বলল, 'না, না কাল তো খুব ঘুমিয়েছি ডলি। এতো ঘুম শিগগির ঘুমোইনি।'

তারপর হাসপাতালের আউট ডোর ডিউটিতে বেরোবার আগে ছেলে দুটিকে ডেকে আদর করল ভবেশ। বড়টিকে গাল টিপে দিল। ছোটটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেল কপালে। ভারি সুন্দর হয়েছে ওরা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ফুটফুটে রঙ। রঙীন প্যান্ট আর হাফ সার্টে চমৎকার মানিয়েছে।

ডলি হেসে বলল, 'কি ব্যাপার আজ যে বাৎসল্যের বন্যা বইছে একেবারে। কি ভাগ্য ওদের। আজ ওরা কার মুখ দেখে উঠেছিল।'

ভবেশ হেসে বলল, 'যার সুন্দর মুখ দেখে রোজ ওঠে।'

হাসপাতালে চেম্বারে রোগীদের চিকিৎসায় আর বাড়িতে ফিরে স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশে স্ত্রীর সঙ্গে অবসর যাপনে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে দিল ভবেশ। কিন্তু ঠিক আগের মত নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে কাটল না। দয়া ভিখারিণী একটি নারীর বিষাদ করুণ অস্পষ্ট একখানি মুখ ভবেশের মনের পটে বারবার ফুটে উঠতে লাগল।

নলিনীর মেয়ের বিয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। তা আসুক। ভবেশ অমন অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজী হ'তে পারে না। নিজের মানসম্মানের কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে পারিবারিক সুখ শান্তির কথা। অমন একটা অসমীচীন মিথ্যাচারে ভবেশ কি ক'রে রাজি হ'তে পারে? তা পারে না। তবে টাকা দিয়ে সাহায্য করা তার পক্ষে অসম্ভব নয়। আর সেই সাহায্যই সব চেয়ে বড় সাহায্য। মেয়ের বিয়েতে ভবেশের নামের চেয়ে তার টাকার দাম নিশ্চয়ই নলিনীর কাছে অনেক বেশি। নলিনী নিজেও হয়ত সে কথা জানে। শুধু লজ্জায় স্বীকার করতে পারেনি।

ভবেশ প্রথমে ভাবল, শ' পাঁচেক টাকার একটা চেক ডাকে পাঠিয়ে দেয় নলিনীকে।

বহু দুঃস্থ আত্মীয় বন্ধুর কন্যা দায়ে, এমন দান খয়রাত ভবেশকে মাঝে

মাঝে করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে টাকার অঙ্কটা একটু বেশি হয়ে যাবে। তা না হয় হলোই। বিয়ের আগে নলিনী যদি এমন একটা কান্ড বাঁধিয়ে না আসত তাহলে তো সেই সমস্ত কিছুর অধিকারিণী হোত।

কিন্তু চেক কাটতে গিয়ে ভবেশের মনে হলো চেকটা ডাকে না পাঠিয়ে একেবারে ওর হাতে দিয়ে এলে কেমন হয়। নলিনী অবাক হবে, নলিনী খুশি হবে। ওর মুখে হাসি কোনদিন দেখেনি ভবেশ। ভারি সাধ হলো আজ একবার দেখবে। আশঙ্কায় ভয়ে চোখ ভরা জল নিয়ে যে মেয়ে বাসরঘরে এসেছিল, এই যৌবন-সীমান্তে তার মুখে এক ফোঁটা হাসি কেমন মানাবে ভাবতে চেষ্টা করল ভবেশ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন ধর্মতলার চেম্বারে না গিয়ে লিন্ডসে স্ট্রীটের এক পরিচিত অভিজাত ড্রাগিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানে ঢুকে সহকারী সুরজিৎকে ভবেশ ফোন ক'রে দিল। ভবেশ আজ জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। তাই চেম্বারে যেতে পারবে না। সুরজিৎই যেন রোগীদের অ্যাটেন্ড করে।

তারপর উত্তরমুখে ছুটে চলল ভবেশের স্টুডিবেকার। বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে, ছুটি পেয়েছে শহরের কর্মব্যস্ত ভবেশ ডাক্তার। এমন অহেতুক নিরুদ্দেশ যাত্রার আনন্দ যেন তার ভাগ্যে শিগগির জোটেনি।

মোটরযানের পক্ষে সুগম নয় এমন অনেক আঁকা বাঁকা সঙ্কীর্ণ-সর্পিল পথ পেরিয়ে ভবেশের গাড়ি পুরোনো একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

আশে পাশে শহরের চেয়ে গ্রামের পরিবেশই বেশি। রাস্তার ওপারে খানিকটা পোড়ো জমি। তার লাগা ছোট পানাপুকুরটিতে গুটি দুয়েক সাপলা জলের ওপর মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। একটি ফুটেছে আর একটি ফোটেনি। আরো পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি নতুন বাড়ি উঠছে। মজুরের দল কাজ করে চলেছে। আকাশে আজ মেঘ নেই। আছে রক্তিম গোধূলির রঙ।

গাড়ি থেকে নেমে একটু ইতস্তত ক'রে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল খুলে আঠার-ঊনিশ বছরের একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণা, তন্বী সুঠাম চেহারা। নলিনীর মতই টানা নাক, কালো বড় বড় চোখ। সেই চোখ অভিজাত ভবেশ ডাক্তারের বিস্মিত কৌতূহলের উদ্রেক করেছে। কি জিজ্ঞাসা করবে ওকে, একটু যেন ভাবতে হলো ভবেশকে! সন্তানের বয়সী এই মেয়েটির সামনে নিজের পরিত্যক্তা স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকতে কেমন একটু লজ্জা বোধ করলে ভবেশ, তারপর সঙ্কোচের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'নলিনী আছে।'

মেয়েটি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'না। মা তো এখনো স্কুল থেকে ফেরেননি। আপনি আসুন ঘরে বসুন এসে। তাঁর ফিরতে বেশি দেরি হবে না।'

ভবেশ ভিতরে এসে ঢুকল। পরিপাটি ক'রে গুছানো ছোট্ট সুন্দর একখানি ঘর। পুরোন জীর্ণতার ওপর পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছে। জানালায় নীল-রঙের পর্দা। এমব্রয়ডারি করা সাদা ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি টেবিল। তার ওপর কিছু দর্শন ইতিহাসের পাঠ্য বই। দু'খানি চেয়ার। একখানা সামনে একখানা পাশে। দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তাপোশ, মাথার কাছে বইয়ে ভরতি একটি শেলফ, তার ওপর ছোট একটি সবুজ রঙের ফুলদানী, তাতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা।

প্রসন্নতায় মন ভরে উঠল ভবেশের। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামই বুঝি গীতা?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি স্মিতমুখে জবাব দিল।

'আমার নাম ভবেশচন্দ্র দত্ত।'

'বাবা!'

অস্ফুটস্বরে কথাটি বলে নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল মেয়েটি। তারপর অপলকে একটুকাল ভবেশের দিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময় কৌতূহল অভিযোগ, অভিমানে মেশা সে এক অপরূপ দৃষ্টি, তারপর কি তার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভবেশের জুতো ছুঁয়ে প্রণাম করল গীতা।

ভবেশ একটু যেন বিমূঢ় হ'য়ে রইল। তারপর আস্তে আলগোছে গীতার মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক থাক।'

নিজের ছেলেদের মুখে এ সম্বোধন তো ভবেশ রোজ শোনে। কিন্তু গীতার মুখের এই লজ্জিত অস্ফুট শব্দটি ভারি অশ্রুতপূর্ব মনে হলো ভবেশের। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠল। ভবেশ ভাবল এমন পরম মিথ্যা একটি সম্বোধন হঠাৎ এত বড় সত্য হয়ে উঠল কি ক'রে। কই গীতাকে দেখে, ওর মুখের ডাক শুনে তো মোটেই মনে হচ্ছে না তার সঙ্গে ভবেশের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, বরং পরম আত্মীয় বলেই তো মনে হ'চ্ছে ওকে। তবে সত্যিকারের আত্মীয়তা মানুষের রক্তের মধ্যে নয়, আসল সম্পর্ক মানুষের ভাবের মধ্যে, অনুভবের মধ্যে!

'আপনি ঘামছেন। ঘরটা বড় গরম।' বলে গীতা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করল।

ভবেশ এবার আর বাধা দিল না। মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ডাক্তার হিসেবে এই বয়সী কত তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যেই না এর আগে এসেছে ভবেশ। কিন্তু কই এমন বাৎসল্যের ভাব তো কাউকে দেখে এর আগে জাগেনি। মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে ফেলল ভবেশ। নলিনীর সব প্রার্থনাই আজ সে পূরণ করবে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মন এক পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই স্নিগ্ধ সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি পিতৃ পরিচয় পেয়ে

সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক, একটি ভদ্র পরিবারে মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক। তার জন্যে যত অসুবিধে অশান্তি ভোগ করতে হয় ভবেশ করবে।

সামাজিক মান সম্মান তুচ্ছ করবার নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় মানুষের হৃদয়। নিজের মধ্যে এক পরম উদার হৃদয়বান পুরুষের অস্তিত্বের সাড়া পেয়ে ভবেশ গৌরব বোধ করল। তারপর খুঁটে খুঁটে মা আর মেয়ের জীবন সংগ্রামের অনেক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করল ভবেশ। বহু কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই মেয়েকে মানুষ করেছে নলিনী। এখনো দুটো টুইশন ক'রে গীতাকে নিজের পড়ার খরচ চালাতে হয়। শুধু নলিনীর রোজগারে এ সব ব্যয়ের সঙ্কুলান হয় না। খানিক শুনে এবং অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ভবেশের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে গীতাকে যদি বড় করে তুলত ভবেশ ডাঃ নাগের মেয়ে রুচিরা ওর কাছে দাঁড়াতে পারত নাকি। গীতার হাতে গলায় কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। ধানী রঙের সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। তাতেই কি চমৎকার মানিয়েছে। কি অপূর্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছে এই নিরাভরণা মেয়েটিকে।

দোরের কাছে জুতোর শব্দ হলো। সিঁড়িতে পা রেখে নলিনী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি!'

নলিনীর পরনে সেই খয়েরী পাড়ের সাদা খোলের শাড়ি, হাতে একটি পুরোন ছাতা, আর এক হাতে কতগুলি খাতা।

ভবেশ একটু হেসে বলল, 'ভাবতে পারনি যে খুঁজে বের করব? মেয়ের বিয়েটা চুপি চুপি একা একাই সেরে ফেলবে ভেবেছিলে বুঝি?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী মেয়ের দিকে তাকাল, 'গীতু, তুমি একবার ও ঘরে যাও তো মা। চা ক'রে নিয়ে এসো।'

আরক্ত হয়ে উঠল গীতার মুখ, মৃদু হাসি গোপন করতে করতে দ্রুতপায়ে সে পাশের ঘরে চলে গেল।

মৃদু হেসে প্রথম তারুণ্যের সেই মধুর লজ্জা উপভোগ করল ভবেশ। তারপর নলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়েকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে কেন। আমি কি কোন বেফাঁস কথা বলেছি?'

নলিনী বলল, 'না।'

'তবে?'

নলিনী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার নিজের কিছু কথা আছে।'

ভবেশের সঙ্গে নলিনীর নিজের কথা! কি কথা বলবে নলিনী! এই ঊনিশ বছর ধরে যত কথা জমেছে তার কতটুকুই বা বলে প্রকাশ করতে পারবে?

ভবেশ নলিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'কি বলবে বল।'

নলিনী বলল, 'নির্মলকে আজ সবই বলে এলাম।'

ভবেশ বলল, 'নির্মল কে?'

নলিনী একটু হাসল, 'অমন করে তোমাকে ভ্রূ কোঁচকাতে হবে না। নির্মল আমার ছেলের মত। গীতা যে কলেজে পড়ে সেখানকার লেকচারার। ওর সঙ্গেই গীতার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।'

ভবেশ বলল, 'তাই বল। আগে থেকেই ওদের মধ্যে জানা শোনা হয়েছিল নাকি!'

নলিনী বলল, 'তা হয়েছিল। মাইনে শ' খানেক টাকার বেশি পায় না। তবে প্রাইভেট টিউশনি করে, নোট লিখে কোন রকমে পুষিয়ে নেয়। বেশ ভালো চরিত্রবান ছেলে।' তারপর নলিনী একটু থেমে বলল, 'তোমার চেম্বার থেকে ফিরে এসে এই সাতদিন ধরে আমার ভাবনার আর সীমা ছিল না। মাথা ঠিক করে ক্লাস করতে পারতাম না। তাদের খাতা দেখতে পারতাম না, ঘরের কাজকর্মে পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। জীবন ভরে এত দুঃখ এত কষ্ট গেছে, কই আমার মন এমন অস্থির তো কোনদিন হয়নি।'

ভবেশ বলল, 'থামলে কেন নলিনী বল।'

নলিনী বলতে লাগল, 'কিন্তু অস্থির হলে তো চলবে না আমার। আমাকে যে কর্তব্য ঠিক করে ফেলতেই হবে। ওদের বিয়ের দিন যে এগিয়ে আসছে। একবার ভাবলাম গীতাকেই আগে বলি। ও সব খুলে বলবে নির্মলকে। কিন্তু পরে মনে হলো ও কি পারবে? আমার গীতুর তো কোন অপরাধ নেই। এমন একটা শক্ত কাজের ভার কেন ওর মাথার ওপর তুলে দেব? তাই নিজের লজ্জার কথা নিজের মুখেই বললাম। সব খুলে বললাম নির্মলকে।'

ভবেশ চমকে উঠে বলল, 'তুমি কি বলেছ নলিনী, কি বলেছ তাকে?'

নলিনী বলল, 'যা সত্যি তাই বলেছি। বললাম নির্মল, তোমরা এতদিন যা জানতে তা মিথ্যে, গীতা ডাঃ দত্তের মেয়ে নয়। ও আমার।'

ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসছিল গীতা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা।'

নলিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল, 'এসো গীতু ঘরে এসো। সবাইকে চা দাও।'

কিন্তু গীতা দুজনের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে চায়ের ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ফের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারো বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে গীতা। কিন্তু তখনকার লজ্জা আর এখনকার লজ্জায় তফাৎ অনেক।

ভবেশ আবেগভরা গলায় বলে উঠল, 'কেন এমন সর্বনাশ করলে নলিনী। আমি যে, আমি যে—।'

নলিনী বলল, 'আমি জানি তুমি কি জন্যে এসেছিলে। কিন্তু সত্য গোপন করে অল্পবয়সে নিজের যে সর্বনাশ করেছি কোন লোভেই গীতার তেমন

সর্বনাশ যেন না করি। নির্মল দু'একদিন সময় নিয়েছে। জানিনে মেয়ের ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু যাই থাক, ওর ঘর-সংসারের ভিত চোরাবালি দিয়ে কোনদিন গেঁথে তুলতে দেব না।'

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কিন্তু কেউ উঠে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালবার প্রয়োজন বোধ করল না, ভবেশ বাইরের দিকে তাকাল। পুকুরের জলের সেই একজোড়া ফুল কোথায় মিলিয়ে গেছে। নারকেল গাছ-গুলির আড়ালে সেই অসম্পূর্ণ নতুন বাড়িটাকে এখন মনে হচ্ছে কদাকার একটা ভূতের মত।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল ভবেশ। বেরোতে বেরোতে বলল, 'যাই নলিনী।'

নলিনী যন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, 'আর একদিন এসো।'

ভবেশ নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল, যদি কাজ কামাই করে সে ফের আর একদিন এদিকে আসেই, আর নলিনী বাড়িতে না থাকে গীতা কি আজকের মত ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে তারপর পাশে বসে হাত-পাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকবে?

তা বোধ হয় কখনো আর করবে না। ওর মুখের পিতৃ সম্বোধন দ্বিতীয়বার ভবেশের আর শোনা হবে না।

শুভক্ষণ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আমার এই চিঠিটা পেয়ে তুমি চমকে উঠবে সে-কথা আমি জানি। ঠিক কালকের মতোই। কোর্ট থেকে মুচলেখা দিয়ে যখন তুমি বেরিয়ে এলে তখন তোমার ছাইয়ের মতো মুখ আমাকে দেখে আরো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। আমিও তক্ষুনি ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে গিয়েছিলুম। তুমি ভেবেছিলে, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি। কিন্তু তুমি জানতে না, খবরের কাগজে নামটা দেখেই আমার কেমন একটা অদ্ভুত সন্দেহ হয়েছিল। আমি জানতুম এ অসম্ভব—এমন হতেই পারে না। তবু একটা অলস কৌতূহলের টানে যখন আদালতের ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম—তখন দেখলুম অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমিই তো!

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না—চশমা খুলে ফেললুম। ফলে সব কুয়াশার মতো ঝাপসা হয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারলুম না। সোজা বেরিয়ে এসে একটা চায়ের দোকানে ঢুকলুম।

বৈশাখী রোদে বাইরে আগুনের ঢেউ খেলছিল। আদালতের বুড়ো অশথ্‌গাছটার ঝরে-যাওয়া লাল পাতাগুলো ঘূর্ণি-হাওয়ায় নেচে বেড়াচ্ছিল পথের উপর। ভাঙা গলায় একটা কাক ডাকছিল থেকে থেকে। এক পেয়ালা অসম্ভব গরম চা সামনে নিয়ে চুপ করে আমি বসে রইলুম। মনে পড়ল তোমাকে যেদিন আমি প্রথম দেখেছিলুম।

বন্ধুর বিয়েতে গেছি তোমাদের গ্রামে। তুমি পাশের বাড়ীর মেয়ে। সেদিনের গায়ে-হলুদের রঙ তুমিও মেখেছিলে তোমার গালে মুখে, কালো-পাড় শাড়ীতে। আমি অবাক হয়ে ভেবেছিলুম, কাঁচা সোনার উপর কি আর হলুদের রঙ খোলে? সোনাই যে মলিন হয়ে যায়।

বন্ধুর সঙ্গে তোমার কী যেন ঠাট্টার সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া যে-ভাবে ওর মুখে তুমি হলুদ ঘষে দিয়েছিলে, তাতে খানিকটা রাগও করে থাকবে হয়তো। আমার চোখ লক্ষ্য করে আর তোমার দিকে একবার তাকিয়ে ফস করেই বলে ফেলল ঃ বাঃ, তোরই তো গায়ে-হলুদ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই তো নিশীথ রয়েছে, ভারী সুপাত্র, লাগিয়ে দেওয়া যাক—কী বলিস্‌?

বন্ধুর পিঠে আমি এমন একটা চড় কষালুম যে, উঃ করে উঠল। আর লজ্জায় একবার কেঁপে উঠেই তুমি তক্ষুনি ছুটে পালালে।

বন্ধুকে বললুম, ইডিয়ট্! রসিকতার একটা মাত্রা রাখতে নেই!

বন্ধু হাসল ঃ কিন্তু অন্যায় বলিনি। মেয়েটা সত্যিই ভালো রে! বিয়ে করলে ঠকবি না।

কথাটা ভুলতে পারলুম না। আর ভুলতে পারলুম না সোনার উপর হলুদের ছাপ, লজ্জায় রাঙা হয়ে যাওয়া তোমার মুখ।

সেই একটুখানি দেখাই আমার মাথার ভেতর নেশার মতো জমাট বেঁধে রইল। সেই নেশাটাকে ঘন করে তোলবার আয়োজনই তো ছিল চারদিকে। বিয়ের বাসরে শানাই বাজছিল, শাঁখের শব্দ উঠছিল ঘন ঘন, চেলি-চন্দনে অপরূপ দেখাচ্ছিল কনেকে, নিতান্তই সাধারণ চেহারার কালো লম্বা বন্ধুটিকে দেখাচ্ছিল ঠিক রাজপুত্র। মালা-বদলের সময় হঠাৎ মনে হল, সেই হলুদ-মাখা লজ্জা-রাঙানো তোমার মুখখানাই কনের মুখে গিয়ে পড়েছে, কাঁপা হাতে আমার গলাতেই তুমি মালা পরিয়ে দিচ্ছ যেন।

একমাস পরে আবার বন্ধুর বাড়ীতে ঘুরে এলুম। তারপর—

তোমরা বেশি পয়সা-কড়ি দিতে পারবে না জেনে বাবার আপত্তি হয়েছিল একটু। কিন্তু আমি একমাত্র সন্তান। তার উপর তোমাদের বংশ ভালো, তোমার আশ্চর্য রূপ। কথা পাকা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত।

যেদিন তোমাকে বিয়ে করবার জন্যে নৌকোয় উঠলুম—সেদিন আকাশ আলো ক'রে দ্বাদশীর চাঁদ। খাল বেয়ে নৌকো চলেছে, দু পাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চাঁদও এগিয়ে চলেছে সঙ্গে। জলটা কখনো দুধের মতো ধবধব করছে, কখনা বা হিজলপাতার ভিতর দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোটা চিংড়ি-ধরা জালের মতো জলের উপর দোল খাচ্ছে। দু পাশের বেতবনের মধ্যে লগির ঘায়ে চমকে লাফিয়ে উঠছে ঘুমভাঙা মাছ—নলখুরি ফুলেরা পাপড়ি গুটিয়ে এলিয়ে পড়েছিল—তারাও শিউরে শিউরে উঠছে থেকে থেকে।

পর পর দুখানা নৌকোয় এগিয়ে চলেছি আমরা। সামনের নৌকোয় বাবা রয়েছেন, পুরুতঠাকুর আছেন, পুবের ভিটের জ্যাঠামশাই রয়েছেন। নৌকোর উপরে বসেছে তোমাদেরই দু'জন লোক—আমাদের মাঝিরা অত দূরের খাল চেনে না, ওরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমারই নৌকোয় বরযাত্রী বন্ধু-বান্ধবের ভিড়, হাসছে, গল্প করছে, সিগারেট খাচ্ছে, হার্মোনিয়াম বাজিয়ে সুরে-বেসুরে গান গাইছে।

কিন্তু আমার মন কিছুতেই ছিল না। বালিশে কনুই রেখে আমি বাইরের দিকে চোখ মেলে দিয়েছিলুম। কখনো গাছের আড়ালে ডুব দিচ্ছে চাঁদ, কখনো ঠিক আমার মুখের উপরেই উঁকি মারছে এসে। মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবীটাই আজকে গায়ে হলুদ মেখে বসে আছে—চাঁদ থেকেও চুঁইয়ে চুঁইয়ে হলুদ ঝরে পড়ছে চারদিকে। নৌকোর ছল-ছল উলুধ্বনি দিচ্ছে, পাতায় পাতায় খস্ খস্

করে বেজে উঠছে নতুন ঢোলির শব্দ, খালের ধারে নরম কাদা একরাশ শ্বেত-চন্দন হয়ে গেছে, বাঁশের বনে রাত্রির হাওয়ায় শানাইয়ের সুর বাজছে।

কত রাত পর্যন্ত সবাই হল্লা করেছিল জানিনা। এক সময় খেয়াল হতে দেখলুম, যে যেখানে পারে ঘুমিয়ে পড়েছে এলোমেলো ভাবে। সামনের নৌকোতেও কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। শুধু মাঝিরা ক্লান্তভাবে লগি ঠেলে চলেছে।

তখন আমি ভাবছিলুম তোমাদের বাড়ীর কথা। সেখানে কি কারো চোখে ঘুম আছে আজকে? বড় বড় পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলেছে, সামিয়ানা খাটানো হচ্ছে, রাত জেগে কাজ করছে মেয়েরা, আল্‌পনা দেওয়া চলছে। তোমাকে হয়তো তাড়াতাড়ি খাইয়ে-দাইয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কাল সারাদিন উপোস দিতে হবে—অনেক ধকল যাবে শরীরের উপর দিয়ে। তোমার পিসিমা হয়তো এসে বলেছেন ঃ 'আহা, আজ আর মেয়েটাকে তোরা জ্বালাসনি—একটুখানি জিরোতে দে।'

কিন্তু তুমি কি ঘুমুতে পারছ? তোমার শোওয়ার ঘর আমি দেখেছি—তোমার মাথার কাছের জানলাটাও আমার মনে আছে। ঠিক জানলার বাইরেই তো একটা বাতাবী লেবুর গাছ। এখন তো বাতাবী লেবুর ফুল ফোটবার সময়, নিশ্চয় তার মিষ্টি গন্ধে তোমার ঘরখানা ভরে গেছে। আমার মতো চাঁদের আলো তোমারও মুখের উপর ঝরে পড়েছে, তুমিও ঘুমুতে পারছ না কিছুতেই। আধবোজা চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছ প্রতিটি মুহূর্তে আমার নৌকো এগিয়ে আসছে তোমাদের ঘাটের দিকে। লজ্জায় ভয়ে তোমার বুক কাঁপছে। হয়তো এরই মধ্যে মৃদু নিঃশ্বাসও পড়ছে কয়েকবার। কালকে থেকে তুমি আর এ-বাড়ীর কেউ নও। তোমার এই ছোট্ট শোবার ঘরটি, দেওয়ালে এই যে বসুধারার দাগ, তোমার টেবিলটির উপর বই খাতা চুলের ফিতে, আল্‌নায় এই যে ড়ুরে শাড়ী—এদের সকলের সঙ্গে কাল্‌ থেকে তোমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। ওই বাতাবী লেবুর গাছটা, জানলার ফাঁকে ওই চেনা আকাশটুকু—সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোন্‌ অজানার মধ্যে যে তুমি ঝাঁপ দেবে!

কিন্তু ভয় পেতে গিয়েও তুমি ভয় পাচ্ছনা। আমার মুখ তোমার মনে পড়ছে। আমাকে দেখেছ, আমাকে বিশ্বাসও করেছ তুমি। সেই অজানার মধ্যেও আমি আছি তোমার পাশটিতে। তোমাকে রক্ষা করব, আশ্রয় দেব, যদি কখনো দুঃখ পাও, চোখের জল মুছিয়ে দেব। আমাকে তুমি বিশ্বাস করেছ।

তোমার ভাবনার কথা ভাবতে ভাবতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। মিষ্টি গন্ধের ঝলকের মতো টুকরো টুকরো স্বপ্ন ভেসে যেতে লাগল চোখে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল বেসুরো চেঁচামেচিতে। বাবাই চিৎকার করছেন।

—কী হবে এখন? কেমন করে লগ্নের মধ্যে গিয়ে আমরা পেঁছুব? ছিঃ ছিঃ—আমার মান গেল—ভদ্রলোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে—এখন কী উপায় করি আমি?

বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ির ঘা পড়ল।

সেদিন যা ঘটেছিল, পরে হয়তো সবই তুমি জেনেছ। পথ দেখাবার দায় নিয়ে তোমাদের ওখান থেকে যারা এসেছিল, সন্ধ্যার পরে বেশ করে সিদ্ধি খেয়েছিল তারা। সেই সিদ্ধির নেশায় সারা রাত ভুল পথ দেখিয়েছে। ভোরে যখন চটকা ভেঙেছে, তখন তারা দেখেছে নৌকো এসে পেঁছেছে ঝা-পুরের স্টিমার-ঘাটে। তোমাদের গ্রাম এখান থেকে কম করেও এখন পুরো দেড়দিনের পথ। যত চেষ্টাই করা যাক—রাত বারোটার আগে সেখানে পেঁছোনো সম্ভব নয়। অথচ সন্ধ্যার পরে আর দ্বিতীয় লগ্ন নেই।

আমার সামনেই ঝা-পুরের নদী। যতদূর চোখ চলে ঢেউয়ের পর ঢেউ। কাল সমস্ত রাত চাঁদের সঙ্গে, খালের জলের সঙ্গে, স্বপ্নের সঙ্গে তুমি আমার কাছে ছিলে। আজ এই সকালে সামনের রাক্ষসী নদীটার একেবারে ওপারে চলে গেছ তুমি, দূর-দূরান্তে কয়েকটা ঝাপসা গাছপালা ছাড়া আর কিছুই নজরে আসে না!

বাবা বলছিলেন, যত টাকা বকশিস্ চাস দেব, যেমন করে হোক সন্ধ্যের মধ্যে পেঁছে দেওয়া চাই।

মাঝিরা বললে, বাবু, আমরা মানুষ—কলের জাহাজ নই। তবু চেষ্টা করে দেখব। এখন কেবল আল্লার মেহেরবাণী।

নাওয়া-খাওয়া বিশ্রাম পড়ে রইল—নৌকো ছুটল পাগলের মতো। জোয়ারের মুখে দাঁড় টেনে, বৈঠা ফেলে, লগি ঠেলে বাইচের দৌড়ের মতো চলল নৌকো। বরযাত্রীদের মুখে কথা নেই। বাবা কেবল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর বলছেন, আরো—আরো তাড়াতাড়ি—

গা দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে মাঝিদের। মুখ দিয়ে ফেনা। আর আমি? আমার কথা কি বলবার দরকার আছে কিছু?

পথ-দেখানোর লোক দুটো গণ্ডগোল বুঝে ঝা-পুর ঘাটে নেমেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। রাস্তা জিজ্ঞেস করতে করতে আর অসুরের মতো বাইতে বাইতে মাঝিরা প্রায় অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলল। কিন্তু তবুও শেষরক্ষা হল না।

তোমাদের ঘাটে যখন নৌকো পেঁছল, তখনও আধঘণ্টার মতো লগ্ন আছে। বাবা বললেন, ভগবান আমাদের মুখ রেখেছেন।

কিন্তু তোমরা অপেক্ষা করোনি। বেলা ন'টায় যাদের আসবার কথা, তারা এসে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পেঁছলেও পেঁছতে পারে—এ আশা তোমরা কী করে রাখবে? পাড়াগাঁয়ের সমাজ। লগ্নভ্রষ্ট হলে জাত যাবে—অন্যপূর্বাকে কেউ ঘরে নিতে চাইবে না—তোমার অত রূপের জন্যেও না।

আমাদের আর তোমাদের বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছতে হল না। তার আগেই খবর এল, নিরুপায় হয়ে তোমার বাবা গ্রামের একটি অকর্মা ছেলেকে একটু আগেই এনে পিঁড়িতে বসিয়েছেন। বিয়ে আরম্ভ হয়ে গেছে।

বাবার সমস্ত মুখ কালো হয়ে গেল।

বললেন, গাঁয়ে কারো অরক্ষণীয়া মেয়ে নেই? শুধু শাঁখা-সিঁদুর হলেই চলবে। দশ মিনিটের মধ্যে জোগাড় করো। ছেলের বিয়ে না দিয়ে, বৌ না নিয়ে আমি ফিরব না।

এইবার আমি বাধা দিলুম, সে হয় না, বাবা। তার দরকার নেই।

বাবা বললেন. দরকার আছে। এ অপমান নিয়ে আমি গ্রামে ফিরতে পারব না।

বললুম, আমার পক্ষে এ অবস্থায় বিয়ে করা সম্ভব নয়, বাবা। আমাকে ক্ষমা করো। তা ছাড়া কেবল আজই নয়। আমি আর বিয়েই করব না।

বাবা কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। নৌকো মধুগঞ্জের বাজারে নিয়ে চলো। আজ রাতটা সেখানে বিশ্রাম ক'রে ভোরে আমরা ফিরে যাব।

বরের টোপরটা এক ফাঁকে আমি খালের জলে ভাসিয়ে দিলুম—কেউ টের পেল না। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলুম আজ আর চাঁদ নেই—খানিকটা মেঘ উঠে এসে তাকে আড়াল করে রেখেছে। খালের জল কালির মতো কালো। দু'ধারের বেতবনে বাতাসের শব্দ কর্কশ হাসির মতো শোনা যাচ্ছে।

নৌকো যখন তোমাদের ঘাট থেকে ক্রমশ দূরে সরে আসছে. তখন ভাগ্যের একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ আর উলুধ্বনি ভেসে এল। হয়তো সম্প্রদান আরম্ভ হয়েছে। বাবা একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন সবেমাত্র. সেটাকে তখুনি ছুড়ে ফেলে দিলেন জলের মধ্যে—আমি তার মধ্যে আমার আকাঙ্ক্ষার পরিণামটা দেখতে পেলুম। একটুকরো লাল আগুন হাওয়ার মধ্যে চার পাঁচ সেকেন্ড ছুটে গিয়ে সেই কালির মতো কালো জলের ভিতর চিরকালের মতো হারিয়ে গেল। ও আর কোনোদিন জ্বলবে না।

শুধু আমার বুকের ভিতর একটা পোড়ার যন্ত্রণা সমানে জ্বলে যেতে লাগল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম আমি। চন্দ্রহীন আকাশে চলন্ত মেঘগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমার শুভক্ষণটিও ভেসে চলে গেল।

গ্রামের স্কুলের মাস্টারি করছিলুম—দুদিন পরেই সে-চাকরি ছেড়ে দিলুম। কলকাতায় চলে এলুম ছোটমামার মেসে। যুদ্ধের তখন শেষমুখ। সিভিল-সাপ্লাইয়ে একটা চাকরিও জুটে গেল।

কিন্তু তোমাকে ভুলতে পারলুম না। টিউশন করে মেসে ফিরে আসি রাত ক'রে। ঢাকা-দেওয়া ঠান্ডা ভাতটা খেয়ে নিই। তারপর ঘরের বাকী দুজন ঘুমিয়ে পড়লে জ্বালিয়ে নিই মোমবাতি, একখানা 'সঞ্চয়িতা' কিনেছি.

পড়ি রবীন্দ্রনাথের কবিতা : "ঘরেতে এলোনা সে তো, মনে তার নিত্য যাওয়া-আসা, পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর..."

আর ভাবি, তুমি কেমন আছো। সুখী হয়েছ নিশ্চয়ই। ঘর-সংসার, স্বামী, শিশু—

দিনের পর দিন কেটে গেল। যুদ্ধ থামল, এল পার্টিশন। সিভিল-সাপ্লাইয়ের চাকরি ছেড়ে আমি ভবানীপুরের একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছি। বাবা মারা গেছেন—মাকে এনেছি নিজের কাছে। কেটুয়াখুটি রোডে আদি-গঙ্গার ধারে ছোট ছোট দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছি সস্তায়। আমার দিন-রাত্রি বাঁধা পড়ে গেছে। সকাল-সন্ধে টিউশন—দুপুরে স্কুল। বাড়ী ফিরলে আমার দিনযাত্রার মতো সামনে আদিগঙ্গার স্রোত—আমার ভবিষ্যতের মুখে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে গঙ্গার ওপারে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের লাল প্রাচীর।

মা কতবার বলেছেন, বিয়ে কর্।

আমি রাজী হইনি।

—না মা, ও-কথা আমায় আর বোলো না।

তারপর গতবছর মা-ও ছেড়ে গেলেন। মরবার আগের দিন হাসপাতালে আমার হাত ধরে বললেন—বাবা, চল্লিশ তো পেরিয়ে গেলি। এমন ভাবে বিবাগী হয়েই তুই কাটাবি? আমি চলে গেলে কে তোকে দেখবে, কে দুটি তোকে খেতে দেবে? আমাকে কথা দে, যত শীগ্গির হয় তুই বিয়ে করবি—নইলে মরেও আমি শান্তি পাব না।

মা-র চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। এই শেষসময়ে মা-কে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছে করছিল না। মা-র চোখ মুছিয়ে দিয়ে আমি বললুম, তাই হবে, মা—বিয়ে আমি করব।

কিন্তু সেই শুভক্ষণটি যে আমার এত কাছে এসে পড়েছে সে কি আমি জানতুম?

খবরের কাগজের ওই জায়গাটাতে চোখ হঠাৎই পড়ল বলতে হবে। ও-সব খবর আমি পড়ি না। তবু কী করে ওখানেই আট্‌কে গেল দৃষ্টিটা। পূর্ব-কলকাতার কোন্ এক হোটেলে পাপ-ব্যবসা চালাবার অভিযোগে পুলিশ হোটেলের মালিক এবং সেই সঙ্গে তিনটি মেয়েকে গ্রেপ্তার করেছে। সেইখানেই দেখলুম একটি নাম। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত ধরনের পদবী—তোমার স্বামীর পদবী আমার মনে ছিল।

কাজ আছে বলে মামলার দিন ছুটি নিলুম স্কুল থেকে। এলুম কোর্টে।

ভেবেছিলুম এ অসম্ভব—এমন হতেই পারে না। এ শুধু অলস কৌতূহল ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু দেখলুম, তুমিই তো। তুমি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না। তোমার চেহারায় এখন অনেক বছর তার ছাপ ফেলে গেছে, তোমার কাঁচা সোনার মতো রঙ মলিন হয়ে গেছে। পারুলফুলের মতো মুখখানি থেকে

পাপড়ি ঝরে গেছে অনেকগুলো। চোখের কোণে কোণে কালি। সেই এলিয়ে দেওয়া মাজা-ছাপানো চুলের রাশ আর নেই—এখন তা ফাঁপানো, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। তোমার নখে রঙের চিহ্ন, তোমার ঠোঁটে রঙের আভাস। তবু তুমি—তুমিই।

চোখে ভুল দেখছি মনে করে চশমা খুলে ফেললুম। সব যেন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল। বাইরে ছুটে এলুম। ঢুকে পড়লুম একটা চায়ের দোকানে—এক পেয়ালা অসম্ভব গরম চা নিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলুম তোমার কথা। বাইরে অশথের পাতা নিয়ে দুপুরের বাতাস ঘূর্ণির তালে নাচতে লাগল, একটা কাক ভাঙা গলায় ডেকে উঠতে লাগল থেকে থেকে।

প্রায় একঘণ্টা পরে চায়ের দোকানের বেয়ারা এসে বললে, কই বাবু, চা খেলেন না তো? ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে।

পয়সা দিয়ে আমি পথে নেমে এলুম। দুপুরের রোদ তখন আমার মাথার মধ্যেই জ্বলছে। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে ঘূর্ণি-হাওয়া। জানি, পাকিস্তান হওয়ার পর সব অন্যরকম হয়েছে। চোখের সামনে এখন অনেক কিছুই তো দিনের পর দিন দেখছি যা কোনোদিন কল্পনাও করা যেত না।

কিন্তু তুমি—তুমিই। কেমন করে ভুলব সেই গায়ে-হলুদের রঙ, সেই নারকেল-বনের ছায়া, সেই বাতাবী-নেবুর গন্ধ?

আবার এলুম কোর্টে। তোমাদের মামলার দিন।

দলে দলে লোক হাজির হয়েছে আদালতে। বোধ হয় এসব মামলায় এম্‌নি করেই আসে ওরা। সহানুভূতির চাইতেও নগ্ন কৌতূহল আর নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের ভিড়। তাদেরই মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

দু চোখের জল ছেড়ে দিয়ে তুমি জবানবন্দী দিলে।

পার্টিশনের পর স্বামী নিয়ে এসেছিল কলকাতায়। তারপর স্রোতের শ্যাওলা। এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে। দুটো বাচ্চা ক্যাম্পে কলেরায় মরে গেল। শেষকালে যদি কলোনির খড়ের ছাউনিতে মাথা গোঁজবার ঠাঁই হল তো পেটের খাওয়া জোটে না।

তোমার স্বামী সামান্যই লেখাপড়া জানত। দেশে অল্প-স্বল্প যা ছিল তাই নাড়াচাড়া করে খেত, বাকী সময় কাটাত বখামো করে। কলকাতায় এসে কিছু কাজ জোটাতে পারল না—কিন্তু শয়তানের দলে জুটে গেল ঠিক।

তারপর একদিন কালীঘাটে নিয়ে যাওয়ার নাম করে তোমাকে একখানা বড় নীলরঙের মোটরে তুলে দিলে। সেইদিন তুমি দেখলে তোমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে—মাথার উপর থেকে মুছে গেছে আকাশ।

পাতালের সিঁড়ির নিয়ম আছে। এক ধাপে পা দিয়েই আর পরিত্রাণ নেই। একটু একটু করে একেবারেই তলায় নামিয়ে নেবে। আলো আর মাটির জীবন

থেকে বিদায় নিলে তুমি। দু বার আত্মহত্যার চেষ্টা করেও পারোনি—ভাগ্যকেই মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত।

আর স্বামী? যাদবপুরের ওদিকে কোথায় একটা ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে তিন বছর জেল খাটছে।

সব খুলে বলেছিলে—একটা কথাও গোপন করোনি। আদালত থমথম করতে লাগল। যে চোখগুলোতে নগ্ন নিষ্ঠুর কৌতুক আর কৌতূহল ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছিল, কখন নিভে গেল সে-সব। আমার আশেপাশেই কয়েকটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম।

হাকিমও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কী আর বলবার ছিল?

আইনের মুখ চেয়ে শাস্তি দিলেন, টিল দি রাইজিং অব্‌ দি কোর্ট। ভদ্রভাবে ভবিষ্যতে থাকবার মুচ্‌লেকা।

ছাইয়ের মতো মুখ নিয়ে তুমি বেরিয়ে এলে। পথের ভিড়ের মধ্যে চকিতে দেখতে পেলে আমাকে। ভয়ানক ভাবে চমকে উঠলে একবার, তারপর মনে করলে আমি নিতান্তই একজন পথ-চল্‌তি লোক—তোমাকে দেখেও চিনতে পারিনি। আর আমিও তৎক্ষণাৎ তোমার সামনে থেকে সরে এলুম। কিন্তু তখুনি বুঝতে পারলুম কী আমাকে করতে হবে।

তারপর কাল সারা রাত আমি ভেবেছি। সমস্ত রাত নিজের সঙ্গে আমার লড়াই চলেছে। তাকিয়ে দেখেছি, বুকের ভিতরে যে জায়গাটা পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিল, সেটা এখন একটুকরো হীরের মতো জ্বলছে। যা আগুন ছিল, তা আলো হয়ে উঠেছে। সে আলোয় জ্বালা নেই—জ্যোতি হয়ে আমার বুকখানাকে উদ্ভাসিত করে রেখেছে।

আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম।

দুপুরে আবার গেলুম কোর্টে। অনেক চেষ্টায় তোমাদের মামলার উকিলকে খুঁজে পেলুম। আরো অনেক চেষ্টায় পেলুম তোমার ঠিকানা। আমি স্কুল-মাষ্টার বলেই ঠিকানাটা দিলেন—নইলে কিছুতেই দিতেন না।

আমি ঠিক করেই নিয়েছি। জীবনে একবার শুভক্ষণকে আমি হারিয়েছিলুম, সেদিন আমার কোনো হাত ছিল না। আজ সেই শুভলগ্ন আবার এসে পড়েছে। এবার আর ভাগ্যের উপর বরাত দেব না—এই শুভ মুহূর্তটিকে নিজের জোরেই আমি জয় করে নেব। মা-র কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করব আমি।

তোমার স্বামী? আমি জানি, সে কেউ নয়। তোমার আমার মাঝখানে সে হঠাৎ এসে পড়েছিল—আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না তার। আর এতদিন ধরে সে কী দিয়েছে তোমাকে? দিয়েছে দুঃখ, দিয়েছে অকথ্য অপমান। দুটি বীরের বাহু বাড়িয়ে তোমাকে রক্ষা করা দূরে থাক—নিজের হাতে অন্ধকারের পথে তোমাকে ঠেলে দিয়েছে।

তোমাকে আমি উদ্ধার করব। আইন আমাকে সাহায্য করবে।

আর সময় নেই। আর আমার দেরি করা চলবে না। একজন হোটেলের মালিক জেল খাটছে, কিন্তু তার মতো আরো অনেকের তো অভাব নেই। এক্ষুনি আমাকে তৈরি হতে হবে। তাদের কেউ তোমার জীবনে এসে পড়বার আগেই।

আমি জানি, কেটুয়াখুটি রোডের এই টিনের ঘরেই তোমার আসল জায়গা। আমার মনে পড়ছে সেই গায়েহলুদের রঙ—সেই নেবুফুলের গন্ধ। চিঠি লিখতে লিখতে চোখ তুলে দেখছি আদিগঙ্গার জলে দুধবরণ জ্যোৎস্না ঢেউ খেলছে, জেলখানার প্রাচীরটা চাঁদের আলোয় আবছা হয়ে গেছে। এখন আর কোনো বাধাই নেই।

কাল সন্ধ্যায় আমি তোমাকে আনতে যাব। তুমি আসবে আমি জানি। এমন শুভক্ষণকে তুমিও মিথ্যে হতে দেবেনা।

লণ্ঠনের তেল ফুরিয়েছে—একটু পরেই নিভে যাবে। তা যাক। বাইরে চাঁদ উঠেছে। আর সেই হীরেটা ধক ধক করে জ্বলছে আমার বুকের ভিতর।

অধর মাঝি

সুশীল জানা

খুদে গাঁউলি অফিসারের দল তল্পি গুটিয়ে চলে গেল ওপারে। মোটরে উঠে হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল। একজন মনের কথা আর চেপে রাখতে না পেরেই বলে উঠল, "বাপ্‌স্‌, আচ্ছা এক জংলী দেশ। এই শুখা—এই বান।"

মোটরটা স্টার্ট দিল গর্জন করে—তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল মহকুমা শহরমুখো। কয়েক মুহূর্তের কৃত্রিম শব্দতরঙ্গটা একটা অনাবশ্যক ব্যাপারের মত বৃষ্টিভেজা পুবালী হাওয়ার দমকায় মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। তারপর ঘোর হয়ে এল আবার এখানকার সেই আদ্যিকালের প্রকৃতি—নির্মম সত্যের মত, অন্ধ ভাগ্যের মত। যতদূর চোখ যায়—আকাশ মাঠ-প্রান্তর নদী-নালা জুড়ে সেই প্রকৃতি—গভীর আর নিথর। আর খেয়া নৌকোর ওপরে দাঁড়িয়ে রইল একটা বলিষ্ঠ কাঠামোর বুড়ো লোক—সঙ্গীহীন, চিন্তামগ্ন, পরিত্যক্ত। সে অধর মাঝি।

"তোর শালা—যা যা যা যা।" হালে একটা ঝাঁকি দিয়ে অধর মাঝি খিস্তি করে উঠল অনড় নৌকোটাকে। ফিরে চলল ওপারে। নৌকো কিছুটা উজিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে ঢল-নামা স্রোতের মুখে—নৌকোর মাথাটা শুধু একটু তেরছা করে রাখল ওপার-মুখো। জলের দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কি বিশ্রী থক্‌থকে গেরুয়া রং—গা ঘিন ঘিন করে। এ যেন ধাতে সয় না পলি-মাটির দেশে। এ রং মেলে না তার স্নিগ্ধ মাটির সঙ্গে, এ রং মেলে না তার শান্ত সবুজশ্রীর সঙ্গে। এ কোন পাহাড় ধোয়া ঢল নেমেছে দুকূল ছাপিয়ে। ওর সঙ্গে মেশা অধর মাঝির ঘৃণা আর শঙ্কা।

এ পারের খেয়াঘাটের কাছে এসে একটা সরু খালের মধ্যে নৌকোটা ঢুকিয়ে দিয়ে নোঙর ফেললে অধর মাঝি। তারপর নালা খানা ডিঙিয়ে, জলা ভেঙে ভেঙে ফিরে চলল সে অনেক দূরের গ্রামে।

আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টি সমানে পড়ছেই। নদীচরের জলা জংলা দেশ! যতদূর চোখ যায়—শুধু ধানবন আর ধানবন। উঁচু গাছপালার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সে অনেক দূরে দূরে গ্রামের কাছে দেখা যায় শুধু কয়েকটা বাবলা গাছের মাথা। অঝোর বৃষ্টির ধারায় তাও ঝাপসা হয়ে গেছে।

বিকেল হতে না হতেই যেন সন্ধ্যে। কাছের লোকই আবছা। অধর নিজের ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই রামদাসের মেয়ে বললে, "কে?"

অধর বললে, "আমি বৌমা।"

মেয়েটা লজ্জায় জিভ কেটে মাথায় ঘোমটা তুলে ওই জলের মধ্যে দিয়েই অধরের পাশ দিয়ে সুড়ুৎ করে ছুটে পালাল। যতই চেনাশোনা পড়শীর মেয়ে হোক, সামনে যে হবু শ্বশুর! কুসুম লজ্জায় মরে গেল।

তার পড়ি-মরি করে ছোটা দেখে অধর সস্নেহে বললে, "আস্তে বৌমা— আস্তে যাও। পড়ে যাবে।"

মেয়েটা ততক্ষণে এক ছুটে ঘর।

মেয়ের মুখে খবর পেয়ে খানিক বাদে তামাক খেতে খেতে তার বাপ এসে হাজির। চাষ-আবাদের কাজ শেষ রামদাসের, মাঠে ধানগাছগুলো বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। চাষীর ঘরে অনন্ত আশা আর কয়েক দিনের বিশ্রাম। সেই আশা আর বিশ্রামের আমেজ রামদাসের চোখে মুখে। রামদাস হেসে হেসে বললে, "বেয়াই, চলে এলে যে! বর্ষা-বাদলার দিনে বেয়ানের কথা মনে পড়ে গেল বুঝি।"

হবু সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকি ঠাট্টা মস্করা ওদের মধ্যে চলছে বহুদিন ধরে।

কিন্তু অধর মাঝির মুখ আজ নোংরা আকাশের মত। সেখানে ঠাট্টা মস্করা আজ আর বেরুল না। থম্‌থমে গলায় বললে, "না বেয়াই, খেয়া বন্দ। গাঙে রাঙা জল দেখা দিয়েছে। জল বাড়ছে শাঁ শাঁ করে। তার ওপরে এই পুবালী হাওয়ার দম্‌কা আর শেষ বর্ষার এই অঝোর ধারা। গতিক মোর ভাল লাগছে না বেয়াই। তাই চলে এলাম।"

রামদাসের আমেজ ভাঙার নয়—বহু পরিশ্রম, বহু কষ্টের শেষে একটা আশা ও স্বপ্ন জমাট বেঁধে আছে তার চোখে মুখে। সে মুখ স্বপ্নাতুর চাষীর মুখ।

রামদাস বললে, "ওসব অলক্ষুণে কথা আর ভেব না ভাই। ভালয় ভালয় কটা মাস কেটে যেতে দাও। মাঠের লক্ষ্মী ঘরে এলে আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে তোমার ঘরে হাজির করে দিই এই অঘ্রাণে। তারপর আমি নিশ্চিন্তি।"

"সে কি আমিও চাই না বেয়াই।" অধর মাঝি বললে, "কিন্তু গাঙের গতিক ভাল নয়—এ তোমাকে আমি বলে দিলাম। আমি গাঙের মানুষ—গাঙকে চিনি বেয়াই।"

রামদাস ওর ভয়কে আমল দিলে না। বললে, "যতো হোক না—শুখার গাঙ বেয়াই। অত বড় বাঁধ আছে—ডাকুক না কত বান ডাকবে।"

"কিন্তু গাঙ যে ঢিপি হে—চড়ায় চড়ায় বুক চিতিয়ে আছে। জল টানবে কোথা দিয়ে?" অধরের চোখে মুখে কথায় মরা নদীর তিক্ত অভিজ্ঞতা—একটা অনাগত ভয়।

কিন্তু তবু স্বপ্ন বুনে চলে রামদাস, চাষীর স্বপ্ন।...মাঠে ধানগাছগুলি বাড়ছে,—হিল হিল—খিল খিল করছে উদ্ভিন্নযৌবনা এক পাল কিশোরীর মত। রামদাস বললে, "বেটি মোর পা তুলে বসে আছে তোমার ঘরে আসবার জন্যে।

তুমি পড়ে থাক খেয়া ঘাটে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন।—তুমি তো জান না, দিনের মধ্যে কতবার যে ছুটে ছুটে আসছে তোমার ঘরে।"

এমন সময় উঠোনে এসে দাঁড়াল অধর মাঝির বড় ছেলে গগন—রামদাসের হবু জামাই। কাদা মেখে ভূত—ফিরে এল মাঠ থেকে। কোঁড়া জোয়ান ছোকরা, মাথায় বাবরি ছাঁটা চুল। বাপের মত লম্বা চওড়া চেহারা—চওড়া কপাল, চওড়া চিবুক। চেহারার মধ্যে যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা স্থির হয়ে আছে। গগন দাওয়ায় উঠে বসল।

রামদাস জিজ্ঞেস করলে, "আর কত বাকী তোমার আবাদ শেষ হতে গো?"

"আজ শেষ করে এলাম।" গগন বললে।

"বাস্।" হবু জামাইয়ের জন্য মস্ত বড় একটা দুর্ভাবনা যেন ঘুচে গেল রামদাসের। বললে, "ভাল ধান হবে এবার। আজ দেখি তোমার টিকেবাড়ির পাঁচ কাঠায় ধানগাছ এরি মধ্যে হাব্‌সে উঠেছে। ওখানে কোন না পাবে দু'মণ। তারপর জলার মাঠ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বিশ মণ। তারপর বৌমারির মাঠে সাত আট মণ।"

ধান ধান ধান।...

রামদাস উছলে পড়ে শতধারে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট মণের একটা হিসেব খাড়া করে আঙুলে টুস্‌কি দিয়ে বললে, "বাস, আর কি চাই বেয়াই?"

"না, আর কি চাই।" অধর মাঝি কোথায় হারিয়ে গেল অনাগত সেই সোনার ধানের স্বপ্নের মধ্যে। বললে, "ওরা সুখে থাক—মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসুক, সুখে ঘরকন্না করুক। ছেলেপুলে হোক—বংশ বাড়ুক। আর কি চাই!"

কথায় কথায় অধর মাঝি ভুলে যায় যেন নদীর সে সর্বনাশী চেহারার কথা—ভুলে যায় সে বিশ্রী রাঙা জলের কথা। গল্পগুজব করে সন্ধ্যের পরে রামদাস চলে গেল। যাওয়ার সময় তার আশা আর স্বপ্নগুলো যেন চাপিয়ে দিয়ে গেল অধর মাঝির ওপরে। ছোট্ট একটু কুঁড়ে ঘরের কোণে, কিছুটা ভাবনামুক্ত উষ্ণ আশ্রয়ে সেইগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বিছানায় রাতের অন্ধকারে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহের কাছে ঘন হয়ে আসে দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুমতি, কর্কশ হাতটায় ছোঁয়া লাগে দ্বিতীয় পক্ষের যমজ দুই সন্তান কালা আর ভোলার নরম মসৃণ গা, মনে ঘুর-ঘুর করে প্রথম পক্ষের বড় ছেলে গগনের কথা—আর একটি লজ্জাচকিত কিশোরীর কথা। এই সামান্য লোকটার মন বলে, আর কি চাই—আর কি চাই!...

রাত করে বৃষ্টিটা যেন আরও জোরে নামল। সঙ্গে তেমনি পুবের হাওয়া। চালা থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রান্ত ধারায় জলের কল কল শব্দ। এ ঘনঘোর বর্ষায় আর কিছু শোনা যায় না—আর কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যে নদীচরের ছোট্ট গ্রামটুকু ঘুমে ঘোর।

হঠাৎ সেই ঘুমন্ত অন্ধকারে চাষীদের গোয়ালে গোয়ালে গোরুর ডাক শোনা যায়—খোঁয়াড়ে ছাগল ভেড়ার আর্তনাদ। ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল অধর মাঝি। কানে এসে লাগে অশ্রান্ত জলধারার শব্দ। বাইরে বেরিয়ে এল। উঠোন ভেসে তখন জল ছুঁই-ছুঁই করছে দাওয়ায়। বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। ডাক পাড়ল গগনকে।

গগন ঘুম চোখে বলল, "কি!"

অধর মাঝি বললে, "উঠোন জলে ভরে গেছে। আলো জেবলে দেখ দিকি—কিসের জল। বিষ্টির জল কি-না"—

গগন আলো জবালল। ঝুঁকে দেখল। বললে, "বুঝতে পারছি না।"

অধর এক আঁজলা জল তুলে নিলে চোখের সামনে। হাত কেঁপে উঠল তার। বলে উঠল, "এ যে সেই রাক্ষসী রাঙা জল রে!"—

"বান!"

"গোরুবাছুরগুলো ভয় পেয়ে ডাকছে, খুলে দে—খুলে দে আগে। ওরে ডাক পাড় সবাইকে। বাঁধ ভেঙে গেছে। হেই মা গঙ্গা!"—

গগন ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ। উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে থাকে প্রাণপণে পড়শীদের নাম ধরে।

দশ পনের ঘর প্রজার ছোট একটা গাঁ—অতর্কিত একটা আর্তনাদের মাঝখানে অন্ধকারে জেগে উঠল মানুষগুলো। গোরু ছাগলের ডাক, কাচ্চা-বাচ্চার ঘুমভাঙা কান্না—আর জোয়ান মানুষের ঘুমভাঙা ভয়-পাওয়া হাঁকডাক আদিম বৃষ্টিভেজা অন্ধকারটাকে যেন এক মুহূর্তে একটা ভয়াবহ নরক করে তোলে। তারপর আর্তনাদের মহাপিণ্ডটা কোথায় মিলিয়ে যায় দিগন্তবিসারী হা-হা করা জলার মধ্যে।

গগন কোমরের কাপড় কষে উঠোনে নামতে যাচ্ছিল—অধর মাঝি তার হাত চেপে ধরলে, "কোথায় যাবি?"

"চল পালাই।"

"এই জলে? মরবি!" একজন পুরোনো অভিজ্ঞ মাঝির সতর্কতা অধরের চোখে। বললে, "এই জল ভেঙে—এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে পালাবি তুই? পেছনে রাক্ষসী, এর মধ্যে যে ছুটবে—সেই মরবে।"

"তবে?"

সুমতি গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে স্বামীর—চোখে অসহায়তা। যমজ দুটো ছেলেকে চেপে ধরেছে বুকে। বছর তিনেক বয়স হবে বাচ্চা দুটোর—ভয়ে আঁকড়ে ধরে আছে মাকে। অধর একজনকে তুলে দিলে গগনের কাঁধে—নিজে তুলে নিলে আর একজনকে। সুমতির হাত ধরে বললে, "উঠোনে নেমে দাঁড়া সবাই চালা ধরে। ঘরের দেয়াল ধসে পড়ে চালা এখুনি বসে যাবে।"

উঠোনে নামল সবাই। জল তখন হাঁটুর ওপরে। চালা ধরে দাঁড়াল ওরা

অধরের কথা মত। চালাটা কড় কড় করছে। জল বাড়ছে একটু একটু করে হাঁটুর ওপরে। স্রোতের বেগ দ্রুত।

সেই জল ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল রামদাসের বেটি।

অধর বললে, "কে!"

মেয়েটা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, "বাবা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে গেল কোথায়—দেখতে পেলাম না! আমি দেখতে পেলাম না!"

"মরেছে!" অধর বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে, "দাঁড়িয়ে থাক মোর পাশে, চালা ধরে থাক।"

দেখতে দেখতে মাটির দেয়াল ধসে পড়ল চারদিক থেকে—চালাটা বসে গেল জলের ওপরে।

অধর সতর্ক গলায় বললে, "এবার উঠে পড় সবাই চালার ওপরে। একদিকে সবাই চেপে বসিসনি—ছড়িয়ে বস চারদিকে।"

কালা আর ভোলাকে বসিয়ে দিলে তার মায়ের দুপাশে। বললে, "কপাল তোদের! শক্ত করে চেপে ধরে বসে থাক।"

সকলকে বসিয়ে দিয়ে অধর উঠল এক পাশে। উঠে বসে বললে, "চালা এমনি বসে থাকলে রইলম এই চরে—না হলে কোথায় যেয়ে মরব জানি না। হে মা গঙ্গা!"

চারিদিকের অথৈ অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না। আর্তনাদের সেই মহাপিণ্ডটা যেন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে কোথায়। অনেক দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে ভেসে আসে দু' একটা ডাক—এক-আধটুকু আর্তনাদ। মৃত্যু কণ্টকিত এ অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তোলে। তারই মধ্যে রামদাসের স্বপ্ন বিছানো ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় উচ্ছ্বসিত রাঙা জলের সর্বনাশ।

বর্ষার ঠাণ্ডায় আর ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে কালা আর ভোলা, কাঁপছে সুমতি আর কুসুম।

অধর মাঝি আবার হুঁশিয়ারী দিলে, "চালা খবর্দার ছাড়বি না। ভয় নাই। চেপে বসে থাক।"

গগন বলে উঠল, "চালা যেন নড়ছে বাবা!"

অধর বুঝতে পেরেছে আগেই। বুকটা তার আগেই ধক্ করে কেঁপে উঠেছে। মুখে কোন কথা এল না। বোবার মত শুধু সে চেয়ে রইল অন্ধকারে সীমাহীন—অন্তহীন জলরাশির দিকে। এ চালা এবার ভাসবে দুর্ভাগ্যের কোন দুর্জ্ঞেয় পথে কে জানে।

গগন ভয় পেয়ে আবার বলে উঠল, "চালা ভেসে উঠেছে বাবা!"

অধর মাঝি শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "চল বাপ এবার কপাল নিয়ে। রইল পড়ে এ ভিটা—রইল পড়ে এ চর।"

সুমতি চালায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

"চুপ কর বৌ—চুপ কর।" অধরের গলায় সান্ত্বনা, "মাঝির বৌয়ের এখন সাহস চাই।"

ভয়ে চোখ মেলে চেয়ে আছে রামদাসের বেটি, চেয়ে আছে কালা আর ভোলা। খরবেগ স্রোতধারায় চালাটা ভেসে চলেছে কোন নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকারে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, মেঘলা আকাশে চিহ্ন নেই একটি তারারও।

গগন বললে, "কোথায় কোন দিকে যাচ্ছি বলত? বুঝতে পারছি না কিছু যে।"

অধর বললে, "দক্ষিণে—বাহার গাঙ।"

"হায় কপাল! সে যে সাগর!" গলা কেঁপে উঠল গগনের।

"কে জানে কপাল কোন দিকে নিয়ে যায় বাপ!" অধর বলল, "তবে চালা এখনও যাচ্ছে গাঙের ধারে ধারে চরের ওপর দিয়ে—গাঙের টানে এখনও পড়েনি।"

"কি করে বুঝলে?"

"এই গাঙের জল ঘেঁটে বুড়া হয়ে গেলাম বাপ। গাঙের আসল টানায় পড়লে চালা আরও জোরে ছুটত।"

তাই বটে। চালাটা চলেছে এঁকেবেঁকে—ঘুরে ঘুরে। চরের ওপরে উচ্ছ্বসিত জলস্রোত পাক খাচ্ছে—ঢেউ তুলছে, বাঁক নিচ্ছে। নদীর এ একটানা খরস্রোত নয়। তবু নদী যে কত দূরে আছে—তাই বা কে জানে! শুধু চালার ওপর থেকে এ কটি প্রাণী চেয়ে আছে অগাধ অন্ধকারে। সব কথা—সব প্রশ্ন আস্তে আস্তে থেমে এল ওদের। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্য আর দুরন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে জড়ের মত বসে রইল ওরা।

প্রথমে গেল ভোলা। চালা থেকে খসে পড়ে গেল জলে। সামান্য এক পলকের একটু আর্তনাদ। তারপর সব চুপ।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, ভোলা পড়ে গেল যে!"

"খবরদার, চালা থেকে নামবি না।" অধর ঠাণ্ডা গলায় হুঁসিয়ারী দিলে, "কি করবি তুই, ওর কপাল।"

সুমতি ফুঁপিয়ে উঠল।

কালা চেয়ে আছে। একটু শব্দ নেই বাচ্চাটার মুখে। শুধু বিস্ফারিত দুটো চোখ—মাছের চোখের মত। ভেতরে ভেতরে ও যেন মরে শেষ হয়ে গেছে। কচি মুঠো দুটোতে চেপে আছে চালার খড়—সে দুটো কালিয়ে শক্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কখন আস্তে আস্তে খড় সরে এল তারও মুঠো থেকে। ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে সারা দেহ। নেমে গেল—সর সর করে সেও নেমে গেল চালা থেকে।

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, "বাবা, কালা পড়ে গেল!"

"থাক। ওর কপাল বাপ্!"

সুমতি মাথা ঠুকে পড়ল চালায়। সামান্য একটা ফোঁপানীর শব্দও শোনা গেল না তার।

চালাটা চলেছে।...

কচি কচি চারটে হাতে কালা আর ভোলা আজ সন্ধ্যে বেলায় তাকে জড়িয়ে ধরে কি বলতে চেয়েছিল যেন...কিসের কি কথা! নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না অধর মাঝির। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শুধু সে সামনের অন্ধকারে। একটা ঢিপি নেই—একটা বড় গাছ নেই, শুধু অঢেল অনির্দিষ্ট অন্ধকারের স্রোত। মাঝে মাঝে কখনও বা এক আধটা কাঠির মত বাবলা গাছ—তাও নাগালের বাইরে। শুধু বোঝা যায়—এখনও চালাটা ভেসে চলেছে জলস্ফীত চরের ওপর দিয়ে।

তার মুখোমুখি সামনের চালায় তেমনি মাথা ঠুকে পড়ে আছে সুমতি। অনড়—অসাড়। অধর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। ডাকতে ইচ্ছে হল—ডাকল না। আহা, তার যমজ ছেলের মা! কি বলেছিল যেন গাঁয়ের সবাই? ভারী পয়মন্ত!...হুঁ, পয়মন্ত! কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অধরের।

এই তো সেদিনের কথা—আকাশে একটু মেঘের চিহ্ন নেই—চলে গেল আষাঢ় মাস, শ্রাবণ মাস। হাত গুটিয়ে বসে আছে চাষী, গোরুগুলো ছিঁড়ে খাচ্ছে তামার পাতের মত মরা ধানগাছের পাতা। ইন্দ্রের পূজা হল, ধ্বজা উড়ানো হল। তবু জল নেই। শেষে হল ব্যাঙের বিয়ে। ডোবা থেকে দুটো ব্যাঙ ধরে এনে বিয়ে দিল সবাই। বিয়ের পর সবাই বললে, "এ ব্যাঙ জলে ছাড়বে কে?"

পয়মন্ত লোক চাই—যার হাতের ছোঁয়া লেগে মাঠ ভরে হবে ফসল। ব্যাঙ ডাকবে, মেঘ গলে জল হবে—ভরে উঠবে শুখা মাঠের জলা। কে সে এমন পয়মন্ত আছে এ চরে?

সবাই বললে, "অধর মাঝির বউ সুমতি।"

রামদাস বলেছিল, "বেয়ান ভারী পয়মন্ত—নতুন বউ এসেই দুই যমজ ব্যাটা বিইয়ে দিয়েছে গো! ও'র জুড়ি কেউ নাই এ চরে।"

তারপর...

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, "গেল গেল—পড়ে গেল। বাবা!"

সুমতির সেই মাথা ঠোকা অনড় মূর্চ্ছিত দেহটা গড়িয়ে পড়ল চালা থেকে।

অধর শুধু বললে, "যার যেমন কপাল বাপ্!" তারপর বিড়বিড় করে কি বললে শোনা গেল না। অন্ধকারে বসে রইল সে এক ভাবে চালা চেপে। অভিজ্ঞতায়, স্বার্থে, জীবনের মায়ায় অটল একটা মূর্তির মত।

গগনের অসহ্য লাগছে এই নীরবতা—এই নির্মম নিরুদ্দিষ্ট ভেসে চলা। সে কথা বলতে চায়। বলে উঠল, "কোথায় চলেছি?"

কেউ উত্তর দিল না। অধর বসে আছে একভাবে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে হঠাৎ লোকটা যেন দুর্জ্ঞেয় আর স্বার্থপর হয়ে উঠেছে।

গগন অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "কুসুম, ভাল করে চালা ধরে রাখিস।"

কুসুম বললে, "ধরে আছি তো।"

"ভয় করছে?"

কি বলবে—মেয়েটা যেন ভেবে পেল না।

গগন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "বাবা, চালাটা খুলে যাচ্ছে!"

অধর তার সেই সতর্ক নিথর চোখ তুলে তাকাল। জলের তীব্র স্রোতে আর কতক্ষণ টিকে থাকবে চাষীর কুঁড়ে ঘরের চালা। দড়িগুলো আলগা আলগা হয়ে ফেঁসে যাচ্ছে—খসে যাচ্ছে খড়, টুকরো টুকরো বাতা বাখারি। দেখতে দেখতে ওটা চার টুকরো হয়ে গেল।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, "আলাদা হয়ে গেল। বাবা!"

"যে যার কপাল নিয়ে যাও বাপ!" অধরের সেই ঠাণ্ডা স্বার্থপরের কথা।

কিন্তু কোথায় যাবে!—এই অন্ধকারে—একা! কুসুম তার বিচ্ছিন্ন চালাটা থেকে আর্তনাদ করে উঠল—অধর মাঝির চালা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল জলে। ধরে ফেললে। ঝাঁকিতে খুলে গেল কয়েকটা বাঁশ বাখারি।

"ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—ডুবে যাবে।" অধর পা দিয়ে ঠেলতে লাগল মেয়েটার শক্ত মুঠো-করা হাত।

"যাব—আমি যাব মাঝি। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"গেল গেল! কোথায় যাবি চুলোয়। ছাড় ছাড়।" অধর তার শক্ত বলিষ্ঠ পা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইল মেয়েটার শক্ত মুঠো। এক পা—তারপর দুই পা।

কুসুম শুধু বলতে লাগল, "আমি যাব—আমি যাব, মাঝি..."

দুই পায়ের চাপে ডুবে গেল মেয়েটা, ছিঁড়ে নিয়ে গেল অধরের খানিকটা চালা। বিমূঢ়ের মত চেয়েছিল গগন—চেঁচিয়ে উঠল, "কুসুম!"

কোন সাড়া নেই।

"সে কোথায় গেল বাবা?"

"জানি না।" অধরের সেই নিষ্ঠুর গলা।

"বুড়ো শয়তান! বাঁচ—বাঁচ তুমি একলা।" গগন ঝাঁপ দিল কোন দিকে যেন। অতল অন্ধকারে বিধাতার বিদ্রোহের মত শোনা গেল তার বলিষ্ঠ বাহুর জলক্ষেপ! দূরে—ক্রমশ দূরে। অধরের চালাটা তখনও ভেসে চলেছে তার দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের অন্ধকারে। আর তার চালা থেকে ছেঁড়া ছোট্ট অংশটুকু কোথায় ভেসে ভেসে হারিয়ে গেল কে জানে। বসে আছে সে একভাবে দয়াহীন মায়াহীন সতর্ক আরণ্যক আদিম একটা জীবের মত। কোথায় তলিয়ে গেছে তার স্বপ্ন, কোথায় তলিয়ে গেছে তার সহস্র জীবনকথা, তার ঘর জমি চর—একটা গোটা মানুষের জীবন!

এক জায়গায় এসে চালাটা যেন ঠেকল। আর চলছে না। ভাঙা চালার তলা দিয়ে শাঁ শাঁ করে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে জল, অন্ধকারে সে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে দেখল। কিছুই দেখা যায় না। একভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ। অত্যন্ত সাবধানে একটা পা নামালো চালা থেকে। মাত্র হাঁটু জল। পায়ে ঠেকল মাটি।

মাটি তো নয় জীবন! কোটি জন্মের সাধনার ধন—স্বপ্নের কামনা।...

এক লহমায় সমস্ত মানবসত্তা ফিরে এল যেন ওর মধ্যে। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের কাছে এতক্ষণ আত্মসমর্পণ করা জড়পিণ্ডের মত দেহটায় ফিরে এল বাঁচবার কামনা। চালা ছেড়ে দিয়ে দু'পায়ে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এগোলো এক পা এক পা করে। জল কমছে। কমতে কমতে জল শেষ হয়ে গেল পায়ের তলা থেকে। মনে হলো—সে যেন ঢালু গা বেয়ে উঁচুতে উঠছে। একটা ঢিপির মত। পায়ে ঠেকল দুটো কি তিনটে গাদাগাদি মানুষ।

কথা বলতে গেল, গলা দিয়ে প্রথমটায় স্বর বেরুল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে হাবা একটা জানোয়ারের মত। খানিক বাদে গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলে। কথা বলল।

"কে!"

সাড়া নেই।

"বেঁচে আছ?"

কেউ সাড়া দিলে না।

চুপ করে বসে রইল সে সেইখানে।

ক্রমশ জল নেমে যাচ্ছে ঢিপির তলা থেকে, দূরে সরে যাচ্ছে জলকল্লোলের শব্দ। বসে রইল সে ভোরের অপেক্ষায়। কোনটা কোন দিক—তাও সে বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু তার মনে আছে—সে দক্ষিণে ভেসে এসেছে। লোকটা বসে রইল পাথরের মূর্তির মত।

তারপর ভোর হলো। চারদিকে রাঙা জলের সমুদ্র।

ভোরের আলোয় তাকাল সে দুটো মৃত দেহের দিকে।—একটা পুরুষ—একটা মেয়ে। পুরুষটির বলিষ্ঠ একটা বাহু জড়িয়ে আছে মেয়েটার কোমর। কে জানে কোথা থেকে ভেসে আসা। মুখ থুবড়ে মরেছে আশ্রয়ের শেষ সীমায় এসে। দু' জোড়া হাত খামচে ধরেছে ঢিপির মাটি—মানুষের জন্মগত অধিকারের মত। দেহ দুটো সে উল্টে চিৎ করে ফেললে। বড় বড় চোখ বের করে তাকাল বিহ্বলের মত। কুসুম না! গগন না! তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসল অধর মাঝি। লোকটার স্থির পশুর মত চোখে এতক্ষণে নামল মানুষের অশ্রু। ভাঙা গলায় গুমরে গুমরে বললে :

"ওরে তোদের আমি বিয়ে দেবো বলেছিলাম—বিয়ে দেবো বলেছিলাম।"...

স্বাক্ষর

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

সভা শেষ করে নামবার মুখেই বাধা পেলাম। সামনে অটোগ্রাফের খাতা খুলে একজন দাঁড়িয়ে। সভা শুরু হওয়ার আগে এক দফা সই করার পালা শেষ হয়েছে। মনে ভেবেছিলাম হাঙ্গামা বুঝি চুকে গেল।

অটোগ্রাফ-খাতাখানি হাতে নিয়ে চোখ তুলে চাইলাম, তারপর অনেকক্ষণ আর চোখ নামাতে পারলাম না।

কৈশোর যৌবন দুঁহু মিলে যাওয়ার বর্ণনা মৈথিলী কবিদের রচনায় পেয়েছি, কিন্তু যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের এমন সঙ্গম এর আগে আর চোখে পড়েনি। চুলের ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা রুপালী ইশারা, কপালে বাড়তি কয়েকটা আঁচড়, এ ছাড়া সময় আর কোথাও স্পর্শ করতে পারেনি। কটাক্ষ আর ওষ্ঠাধরের বিন্যাসে আজও মুনিদের তপোভঙ্গের উপাদান।

একটু আশ্চর্য হলাম। এ-বয়সে নামের মোহ কাটিয়ে বাংলা দেশের মেয়েরা নামাবলীর দিকে হাত বাড়ায়।

"শুধু সই নয়, কিছু একটা লিখে দিন দয়া করে।" গলার স্বরে কিশোরীর কমনীয়তা।

"দেখি কার কার সই যোগাড় করেছেন?" অটোগ্রাফ-খাতাটা হাতে নিয়ে ওল্টাতে লাগলাম। পরের সই দেখা অবশ্য আসল উদ্দেশ্য নয়, মনে মনে জুতসই দু-একটা লাইন ভাবতে লাগলাম কিংবা কোন মহাজনের মনভোলানো বাণী।

মহাজন থেকে দীনজন, কেউ আর বাদ নেই। গদ্য, পদ্য, গান সব আছে। গীতিকথার মাঝে মাঝে নীতিকথার ছিটে।

একটা পাতায় এসে থেমে পড়লাম। মহিলার দিক চেয়ে বললাম, "একি?"

মহিলা একটু বুঝি বিব্রত বোধ করলেন। মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বললেন, "সই, কবি তাপস সেনের সই।"

"তাপস সেনের সই?" বিস্মিত হলাম।

তাপস সেনকে চিনতাম। এক সময়ে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এক সঙ্গে এক কাগজে লেখা শুরু করেছিলাম। তাপস কবিতা, আমি গল্প।

একে কবিতা, তার উপর প্রকাশকদের মনোরঞ্জন করার মতন কিছু লিখতে তাপস নারাজ, কাজেই দু-একটা অভিজাত পত্রিকা আর নিকটতম বন্ধুবান্ধবদের

গণ্ডী ছাড়িয়ে তার কবিতা জনগণের নাগাল পেল না। কিন্তু গোটা কয়েক কবিতা যা তাপস লিখেছিল, সত্যিকারের কাব্যরসিক মহলে বেশ হৈ-চৈ পড়েছিল সেগুলো নিয়ে। দু-একজন অধ্যাপক পিঠ চাপড়েছিলেন তাপসের, সহপাঠীরা কিছু স্বীকৃতি কিছু ঈর্ষা-মেশানো চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। ওই পর্যন্ত।

সেই তাপস সেনের নাম মহিলার মুখে শুনে তাই খটকা লাগল।

"কিন্তু একি সই?" মহিলার দিকে চোখ ফেরালাম।

"এ ছাড়া আর কিছু দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ওইটুকুই জোগাড় করতে পেরেছিলাম।"

তাপস সেনের কথা সবই আমার জানা।

ছিপছিপে চেহারার ফর্সা ছোকরা। বয়সের চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ দেখাত তাকে। বুড়ো বাপ, পঙ্গু মা, বিয়ের বয়স পার হয়ে যাওয়া দুটি বোন আর আরও দুটি অসহায় ভাই। সংসারের টলমলে পানসি ঠাসবোঝাই। ঐ-সবই খরচের খাতায়, জমার মধ্যে সম্বল তাপসের বি.এ. পাশের মামুলী সার্টিফিকেট আর কবিতা লেখার কলম।

অফিসের দরজায় দরজায় ঠোক্কর খেয়ে অতলে তলিয়ে যাবার মুখে তাপস টিউশনির কুটো আঁকড়ে ধরল। সকালে গোটা দুয়েক, দুপুরে একটা, রাত্রে আরও গোটা দুই। কিন্তু এ-সব চোরাবালির বেশী কিছু নয়। শক্ত মাটির আভাস নেই এতে। এর উপর নির্ভর করে কায়ক্লেশে দিনান্তের উপবাস বাঁচান যায়, কিন্তু সংসার বাঁচান যায় না।

ওরই মধ্যে সংসার একটু হাল্কা হল। বাপ বোধ হয় ছেলের মুখ চেয়েই ইহলোক ত্যাগ করলেন, একটি বোন রাতের অন্ধকারে ঘর ছাড়ল, কিন্তু তাতে সমস্যা মিটল না। ইতিমধ্যে ভাইরা আরও বড় হয়ে উঠেছে, তাদের খাওয়া-পরার প্রশ্ন আরও জটিল, মার পঙ্গুত্বও বেশ কায়েমী। শুধু মেঘের উপর মেঘই নয়, ঝড়ের ঝাপটাও প্রবল হয়ে উঠল। দুটো টিউশনি খতম, চেষ্টা করেও তাপস নতুন কিছু জোটাতে পারল না।

সেই সময়টা, আমরা, তার সাহিত্যিক সতীর্থরা তাকে এড়িয়ে যেতে লাগলাম। আগে ডেকে-ডেকে তার কবিতা শুনতাম, কিন্তু এখন দুঃখের কাঁদুনি শোনার ভয়ে, পাশ কাটাতে শুরু করলাম। পাছে কিছু সাহায্য চেয়ে বসে, সেই ভয়ে।

এর পরের কিছুদিনের খবর রাখি না। শুনেছিলাম মরীয়া হয়ে তাপস মধ্যভারতের কোন এক অখ্যাত শহরে চলে গিয়েছে। কোন কাঠের গুদামে হিসাব লেখার কাজ নিয়ে।

সেই সময় গোটা দুই কবিতা এদিক ওদিক লিখেছিল। নিস্তেজ কবিতা। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পিছিয়ে যাচ্ছে, কবিতার প্রতি ছত্রে এমন পশ্চাদ-পসরণের আভাস।

তারপরের খবরও কানে এসেছে। তাপস হাসপাতালে। অসুখের বিবরণ জানতাম না, অবশ্য জানার চেষ্টা করিনি। তখন আমার গোটা দুই উপন্যাস রুপালী পর্দায় প্রতিফলিত হবে, তারই তোড়জোড়ে ব্যস্ত ছিলাম। ছবিগুলো দাঁড়িয়ে গেলে, আমিও দাঁড়াব। ডিরেক্টরকে খুশী করার জন্য সংলাপ থেকে সঙ্গীত সবই রচনা করছি, তারই ফাঁকে হঠাৎ নজরে পড়ল।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই কেউ বোধ হয় পত্রিকাটা দেখাল। তাপসের কবিতা। সারা কবিতা জুড়ে তীব্র জ্বালা। মানুষের পৃথিবীকে অভিসম্পাত, সমাজ-ব্যবস্থার উপর দারুণ কশাঘাত। কিন্তু আশ্চর্য কান্ড, এসব সত্ত্বেও নিটোল কবিতা হয়েছে।

পর পর মাস ছয়েক চলল। গোটা ছ সাত কবিতা প্রগতিশীল পত্রিকায়। প্রত্যেকটি কবিতা মুক্তাবিন্দুর মতন সম্পূর্ণ, তেমনি পবিত্র। বোঝা গেল তাপস সেন জীবনের নতুন একটা দিকের সন্ধান পেয়েছে। শুধু লেখনীর স্পর্শে এমন কবিতা সম্ভব নয়, হৃদয়ের স্পর্শেরও প্রয়োজন।

সেই সময় কবিযশঃপ্রার্থী কয়েকজন তাপসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা পেয়েছিল কিনা জানি না, কারণ কিছু পরে তার মৃত্যু-সংবাদ দেখেছিলাম। কোন দৈনিকে নয়, বোধ হয় কোন ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্রিকায়।

তারপর তাপস সেনের কাব্য-সংকলন বের করার একটা প্রচেষ্টা চলেছিল। এজন্য চাঁদা সংগ্রহও শুরু হয়েছিল, বোধ হয় নিজেও কিছু দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন কাব্য-সঙ্কলন প্রকাশিত হয়নি। বইয়ের বাজারে ঘোরাঘুরি করতে হয়, সংকলন বের হলে নিশ্চয় চোখে পড়ত।

"তাপস সেনের নাগাল পেলেন কী করে?" মহিলাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম।

মহিলা হাসলেন। ম্লান, বিবর্ণ হাসি। আস্তে আস্তে বললেন, "উনি যখন আকোলার হাসপাতালে, তখন বাবার কাজের জন্য আমরাও সেখানে। সেই সময় লেখাপড়া ছাড়া আমার একমাত্র নেশা সই যোগাড় করা। নামকরা কোন লোককে হাতের কাছে পেলেই অটোগ্রাফখাতা এগিয়ে দিই। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, কাউকে বাদ দিই না। এক ডাক্তারের মারফত খবর পেলাম তাপস সেন ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। তখন বয়স কম, কিন্তু সাহস অনেক বেশী। এখন যে-কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হই, মনে মনে হাজারবার চিন্তা করি, তখন তাতে সঙ্কোচের বালাই ছিল না। অটোগ্রাফ-খাতা হাতে নিয়ে হাস-পাতালের আনাচে-কানাচে ঘুরি। ডাক্তারদের অনুরোধ জানাই, নার্সদের খোসামোদ, কিন্তু তাঁরা সবাই বারণ করেন। সই দেবার মতন অবস্থা নয় তাপস সেনের। এখন তাঁকে একটুও ডিসটার্ব করা উচিত নয়।

"আমি হাল ছাড়িনি! রোজই তাপস সেনের খবর নিই। একটু ভাল হয়ে উঠলেই অটোগ্রাফ-খাতা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াব। এই ভরসায়।

"কিন্তু কিছুতেই আর সুবিধা হয় না। ক্রমে তাপস সেনের অবস্থা মন্দের দিকে, অথচ এত কাছে এসে এত বড় কবি আমার খাতায় নিজের স্বাক্ষর রেখে যাবেন না, তা কি হতে পারে।

"তখন সে-বয়সে সব কবিতা ভাল লাগার মন নিয়ে তাপস সেনের কবিতা পড়েছিলাম। নতুনতর লেগেছিল। চাঁদ, তারা আর হাল্কা মেঘের যুগে এমন করে বজ্র-বিদ্যুতের কথা আর কেউ বলেননি। এমন করে লেখেননি ভেঙেপড়া মানুষের কাহিনী, ব্যথা, বেদনা আর দীর্ঘশ্বাসের কথা।

"একদিন সুযোগ জুটে গেল।

"অন্য কোন ঘরে বোধ হয় কোন রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে থাকবে। মফঃস্বলের ছোট হাসপাতাল। ডাক্তার আর নার্সের সংখ্যাও পরিমিত। সকলেই সেদিকে ছুটেছে। সেই ফাঁকে পা টিপে টিপে আমি তাপস সেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

"দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে ছিলেন, বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, 'দেখুন, অটোগ্রাফ দেবেন একটা।'

"তাপস সেন অতি কষ্টে পাশ ফিরলেন। চেহারা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মানুষ নয়, মানুষের কঙ্কাল। চোয়ালওঠা বিবর্ণ মুখ, নিষ্প্রভ কোটরগত দুটি চোখ; কপালে, গালে নীল শিরার জট।

"অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলেন। একবার আমার দিকে আর একবার আমার প্রসারিত হাতে ধরে থাকা অটোগ্রাফ-খাতাটার দিকে।

"বিড় বিড় করে বললেন, 'সই, আমার সই।'

"বললাম, 'হ্যাঁ, আপনার সই, সেই সঙ্গে আপনার দু লাইন কবিতা।'

"তবু যেন তাপস সেনের চেতনা নেই। এক দৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন। দৃষ্টিতে কৌতূহল আর বিস্ময়ের মিশেল।

"আমি ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে দেখে নিলাম। বলা যায় না, এখনি হয়ত নার্স কিংবা ডাক্তার এসে পড়বে, তারপর একটুও না দেরি করে আমাকে বের করে দেবে খাতাসুদ্ধ। সব মেহনত খতম। তাই বললাম, 'একটু তাড়াতাড়ি নিন, আমার সময় খুব কম।' তাপস সেন হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে কলমটা টেনে নিলেন, খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'সময় কি আর আমারই ছাই বেশী আছে।' কলমটা আঁকড়ে ধরে শুয়ে শুয়েই অটোগ্রাফ-খাতাখানার উপর ঝুঁকে পড়লেন।

"তারপরই কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল। তাপস সেনের শীর্ণ কাঠামোটা থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। হাতের কলম ছিটকে পড়ল মাটিতে। দু হাতে বিছানার চাদরটা মুঠো করে ধরলেন।

"আশ্চর্য হয়ে দেখলাম। এত রক্ত কোথায় ছিল ওই পাণ্ডুর দেহে। বিছানার চাদর, বালিশ, মাথার কাছে টিপয়ের উপর রাখা টেম্পারেচার চার্ট, রক্তে লাল

হয়ে গেল। আমার অটোগ্রাফ-খাতাটাও বাদ গেল না। রক্তের ছিটে এসে লাগল খোলা পাতার ওপর।

"ভয়ে খাতাখানা নিয়ে বাইরে পালিয়ে এলাম। তারপর যতবার পাতাটা ছি'ড়ে ফেলতে গিয়েছি, কিছুতেই পারি নি। ভেবেছি তা হলে কবি তাপস সেনের কোন চিহ্নই যে থাকে না আমার অটোগ্রাফ-খাতায়।"

মহিলা থামলেন। তাঁর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আবার খাতার দিকে দেখলাম।

বিবর্ণ রক্তিম ছোপ। সারা পাতা জুড়ে। কবি তাপস সেনের স্বাক্ষর।

তারপরই কথাটা মনে পড়ল। এর চেয়ে ভাল স্বাক্ষর তাপস আর কীভাবেই বা দিতে পারত! হাতের কয়েকটা আঁচড়ে এত কথা লিখতে পারত না। এ-ভাবে ফোটাতেও পারত না তার কবিতার মর্মবেদনা।

শোক

সন্তোষকুমার ঘোষ

ওরা সবাই হঠাৎ একসঙ্গে এভাবে নেমে গেল কেন। আমি কিছু বুঝতে পারছি না যে। বুকের ভিতরটা কেমন করছে।

এ ঘরে তাসের তুমুল আড্ডা বসেছিল; ও-ঘরে গানের আসর। হঠাৎ কে যেন এসে দাঁড়াল। চৌকাটে দাঁড়িয়ে কী বলল; চাপা গলা, শুনতে পাইনি। ফিসফিস করে ওরা কী বলাবলি করল। তারপর নিঃশব্দে, ব্যস্তভাবে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

আর আমি, নতুন আচারের লোভে ভাঁড়ারে ঢুকে কাঁচের বয়মটা ছুঁয়ে কাঁপতে থাকলাম। কিছু বুঝলাম না, কিছু শুনলাম না, ওরা আমাকে কেন কিছু বলে গেল না, কেন একলা এত বড় বাসাটায় আমাকে ফেলে গেল। আমি যে ভাবব, আমি যে ভয় পাব।

এই বে-মেরামতী বাড়িটার জং-ধরা কব্জাগুলো খিটখিটে, জানালা-কবাট সব ভীতু, হাওয়ার সাড়া পেলেই খুলে যায়, সরে দাঁড়ায়, ঠকঠক করে কাঁপে। এখন যদি হাওয়া হানা দেয় আমি কী করব। অসহায় পেয়ে সব ধুলো ত আমারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, দু'হাতে মুখ ঢেকে আত্মরক্ষা কি করতে পারব? হয়ত মরেই যাব। ঝড়ের ঝাপটে নয়, ভয়ে। ডাক্তার বলেছে, আমার কল্‌জে বড় ধুকপুকে, স্নায়ু ঝিমোনো। বলেছে কথায় কথায় ভয় পেতে নেই।

তার চেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের কাছে যেতে চেষ্টা করি না কেন। হাত বাড়িয়ে জানালার পাল্লা দুটো ঠেসে দিই, ছিটকিনি হাতে যদি না পড়ে তবে জানালায় পিঠ ঠেকিয়ে ত দাঁড়াতে পারব!

তা-ও যদি না পারি, তবে অন্তত বসবার ঘরের ওই বুককেস্‌টার আড়ালে লুকোব। ওটা মজবুত আছে, সহজে নড়ে না। তারপর, খানিক দাপাদাপি করে হামলাদার হাওয়া যখন পালিয়ে যাবে, তখন আবার হামাগুড়ি দিয়ে ওই অন্ধকার কোণ থেকেই বেরিয়ে আসব। হেলান চেয়ারটা তখনও হয়ত ধুলোয় ছেয়ে থাকবে, তা থাকুক।

চেয়ারে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বুঁজব। হাঁপাব। জিভটাকে চোয়ালের ভিতরের দেয়ালে বুলিয়ে বুলিয়ে কিংবা ঠোঁট চেটে চেটেই পিপাসা মেটাব। পিপাসা যাবে, আমার ভয় যাবে। ভয় যখন যাবে, আমি তখন ভাবব।

(সু. ৫—৯) সন্তোষকুমার ঘোষ

আর কিছু ত পারি না, চলতে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতে না, পড়তে না, খেতে না, বলতে না, কিন্তু ভাবতে এখনও পারি। সুখের কথা, দুঃখের কথা। পুরনো সুখের কথা ভেবে ভেবে দুঃখ পাই, দুঃখের কথা ভেবে সুখ। একটা জায়গায় পৌঁছে দুটোই এক হয়ে যায়। আলাদা করে চেনা যায় না। যেন যুগ্ম স্বরধ্বনি।

কতদিন ভেবেছি, দুঃখ পাবার ক্ষমতাটুকুও যেদিন থাকবেনা, তার আগেই যেন আমার মরণ ঘটে। অথবা ঘটবার প্রয়োজনও বুঝি হবে না, কারণ ওই ক্ষমতাটুকু খোয়ানোরই আরেক নাম মৃত্যু।

মৃত্যু আসলে আলাদা কোন ঘটনাই নয়। সলতে ফুরিয়ে আলো এক সময়ে নেবে। কিন্তু ঠিক তখনই কি নেবে? যে মুহূর্তে জ্বলেছিল, সেই মুহূর্ত থেকেই তো নিবেও আসছিল। সলতেটা যখন জ্বলছিল, তখনই পুড়ছিল, একটু একটু করে নিবছিলও। আমরা যেমন এক একটি মুহূর্তের মধ্যে একটু-একটু করে বাঁচি, সেই সঙ্গে তেমনই একটু-একটু করে মরিও। আস্তে আস্তে করে ফুরোনর পালাও এক দিন ফুরোয়। সেই শূন্যতাকেই আমরা বলি শব। সব-শেষকে, সব বিয়োগের যোগফলকে ঢেকে দিই সাদা চাদরে; সমারোহে সমাধি দিই।

মৃত্যুর কথা থাক। দুঃখের কথা বলছিলুম, তাই বলি।

অনেক দিন ভেবেছি, শিশু মাটিতে পড়েই কাঁদে কেন। তার দুঃখ কী। কেউ জানে না, বড় হয়ে সে কথা কারুর মনে পড়ে না। বিজ্ঞানীরা নানা রকম ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এটা তো ঠিক, সৃষ্টির আদিতে যেমন অন্ধকার, অনুভূতির আদিতে তেমন দুঃখ। বোধ হয় অন্তেও।

আজ আমার এই চেয়ারে শুয়ে শুয়ে, যখন ঝড় থেমে গেছে, আমার মনের ভয় কেটেছে, তখন আদি, মধ্য, অন্ত্য সব পর্বের কথাই ভাবা যেত। কিন্তু এখন আমাকে ভাবতে হবে—ওরা গেল কোথায়।

*

ওরা লুকোতে চেয়েছিল। কিন্তু পারল না ত।

জানতে আমার কিছু কি বাকি রইল।

বড় বউমা ফিরে এসেছিল সবার আগে। ভেবেছিল আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। আস্তে কবাট ঠেলে ঘরে ঢুকতে যাবে, আমি একেবারে সামনে পথ জুড়ে দাঁড়ালুম।

"মা!" অস্বস্তিতে, ভয়ে ও যেন চেঁচিয়ে ওঠল।—"আপনি এখনও ঘুমোননি?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে বললুম, "এত রাত্রে কোথায় গিয়েছিলে বউমা?"

কিছুদিন থেকেই কথা জড়িয়ে যায়, নিজের গলা নিজেকেই যেন ভেংচি

কাটে, তবু যথাসাধ্য স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলুম।—"কোথায় গিয়েছিলে, বউমা। সুনীল, অনিল, এরাই বা সব কোথায় গেল।"

"সিতেশ কাকার বাড়ি।"

"সেখানে? হঠাৎ? এত রাত্রে?"

বউমা এবার আমার চোখের দিকে সোজাসুজি চাইল। চোখ নামিয়েও নিল সঙ্গে সঙ্গে। বুঝলুম, ইতস্তত করছে। আস্তে আস্তে বলল, "কাকার অসুখ।"

"কী অসুখ বউমা?"

"এমন কিছু নয়। মাথা ঘুরে পড়ে গেছলেন।"

বুঝলুম, মিছে কথা বলছে। মিছে কথার মুশকিলই ওই, কেমন যেন টের পাওয়া যায়। অন্তত আমি টের পাই। অনেক বয়স হল ত, এখন আমি খুনখুনে বুড়ি। অনেক কথা সারা জীবন ধরে শুনেছি, কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা মিথ্যে চট করে ধরে ফেলি। বলার ভঙ্গি, স্বরের তারতম্য থেকেই টের পাই।

আমার কথায় কোথা থেকে এত জোর এল জানি না, বলে উঠলুম, "বউমা, আমিও যাব।"

ও অবাক হয়ে চাইল। আমার পা দুটি তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। ও বলল, "মা আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না, আপনি যাবেন অতদূর?"

জেদ করে বললুম, "যাবই।"

"বেশ, আপনার ছেলে আসুক, তাকে বলবেন।"

ওর গলা রূঢ় শোনাল। রাগ করেছে।

আমি সেই থেকে ঘুমোইনি, অপেক্ষা করেছি, ওরা কখন ফেরে, অনিল আর সুনীল। মাঝে মাঝে চোখ জড়িয়ে এল, তবু জেগে রইলুম। ওরা ফিরল একেবারে শেষ রাত্রে।

বউমাই দরজা খুলে দিয়ে থাকবে। আমি নিজেকে টেনে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেলুম। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে।

"এখানেই একটু আগুন জ্বাল। এক টুকরো লোহাও ছুঁইয়ে দাও... কাপড়ও ত ভিজে...মাকে এখনই কিছু ব'লনা, কষ্ট পাবেন।"

বউমাকে চাপা গলায় বলতে শুনলুম, "মা কিন্তু আমার ফিরে আসা অবধি জেগে ছিলেন। বার বার জিজ্ঞাসা করছিলেন। ওখানে যেতেও চেয়েছিলেন।"

সবই ত জানতুম।

কী ভাবে, কখন বিছানায় ফিরে এসেছি, জানি না। চোখের পাতা অল্প অল্প করে বুজছিল, তবু, কী আশ্চর্য, ঘুমিয়ে পড়লুম। কম বয়সে, শখ করে মাঝে মাঝে নাইতে নেমে জলের নীচে ডুব দিয়ে থাকতুম। যতক্ষণ পারা

যায়। এই ঘুমও তেমনই। ভোরে ভাঙল না, রোদ উঠলেও না, ধড়মড় করে যখন উঠে বসলুম, তখন বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে।

বউমাকে বললুম, "এতখানি বেলা হয়েছে আমাকে ডেকে দাওনি?"

"আপনি যে ঘুমোচ্ছিলেন।"

"খোকা কোথায়? ডেকে দাও।"

অনিল এসে পায়ের কাছে বসল। ওর দুটি চোখই লাল। ও-ও কি কেঁদেছে? এ-বয়সের ছেলেরা কি কাঁদে। ওদের ত শুধু হাসাহাসি করতেই দেখি। বোধ হয় কাঁদেনি—লাল চোখ দুটিতে শ্মশানে রাত-জাগার চিহ্ন।

বললুম, "খোকা লুকোসনে। আমি সব বুঝেছি। কী হয়েছিল বল ত। সিতেশ ঠাকুরপো কী রোগে—"

"রোগ তেমন কিছু নয় ত। ক'দিন থেকেই বলছিলেন, দুর্বল লাগছে। আমাদের এখানেও আসা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।"

মৃদু গলায় বললুম, "হাঁ। ওঁকে অন্তত চার দিন দেখিনি।"

"হঠাৎ মাথা ঘুরে কলতলায় পড়ে গেলেন। ধরাধরি করে ওরা শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ডাক্তার এল কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ।"

"সব শেষ?" আমার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা গেল হয়ত, খোকা এগিয়ে এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

"রোগটা আসলে কিছু না। এ-বয়সে, মা, বয়সটাই রোগ। শরীর-মনের জোর ত থাকে না, সামান্য কিছু হলেই লোকে ভেঙে পড়ে। অসুখটা উপলক্ষ। তা ছাড়া সিতেশ কাকুর সময়ও হয়েছিল—একাত্তর বছরে পড়েছিলেন।"

একাত্তর? চমকে উঠলুম। আস্তে আস্তে বললুম, "এই আশ্বিনে আমারও সত্তর বছর পূর্ণ হবে, খোকা।"

খোকা কিছু বলল না। পিঠে হাত বুলিয়েই দিতে থাকল।

হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললুম, "খোকা, আমাকে একবার নিয়ে যাবি?"

"তুমি? তুমি কী করে যাবে। গিয়েই বা কী হবে।"

"নইলে, নইলে আমি যে শান্তি পাব না।"

খোকা বলল, "ছি, মা, ছি। অতটা ব্যাকুল হতে নেই।"

এতক্ষণ সব আবেগ চাপা ছিল, এবার হাহাকার করে বলে উঠলুম, "তোরা জানিস না। সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে আমার কত দিনের চেনা।"

মাথা নীচু করে খোকা বলল, "জানি মা, সব জানি।"

সব জানে? ও-কথা কেন বলল খোকা। কী জানে, কতটুকুই বা জানা ওদের সম্ভব। কিছু না। হয়ত মনগড়া কয়েকটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। একটু আগেও বলেছে—ছি, মা, ছি। ছি বলতে গেল কেন। অন্যায় আমি কী করেছি।

অনেক কথাই মনে পড়ছে।

কবে থেকে চিনতুম সিতেশ ঠাকুরপোকে। বছরের হিসেব ত নেই—সেই তের বছর বয়স থেকেই, যখন আমার বিয়ে হয়েছিল, যখন নাকে নোলক পরতুম। শুধু আমি না, আমার বয়সী সবাই পরত।

সেই সেকালে মনটা একটু তরল, একটু বায়বীয় পদার্থ ছিল, অদ্ভুত সব কিছুতে বিশ্বাস করত। তখন জানতুম, অনেক কালো বেড়াল একসঙ্গে কড়ায় তেলে চুবিয়ে জ্বাল দিয়ে বিধাতা অমাবস্যার অন্ধকার তৈরি করেন। পুতুলকে তখন প্রাণহীন মনে করতে শিখিনি, তা সে খেলার পুতুলই হ'ক, কি পুজোর পুতুল হ'ক।

বিয়ের পরে শিবপুজো আর করিনি। স্বামীকে পেলুম। শুনলুম, তিনিই আমার শিব। খেলার পুতুলেরা পরে কোলে এল।

আর এলেন সিতেশ ঠাকুরপো। আমার স্বামীর বন্ধু—কিন্তু বয়সে অনেক ছোট। প্রায় আমার সমবয়সী। বলতে ভুলেছি, আমার স্বামী বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বাঙলার বাইরে ছোট একটা শহরে চাকরি করতেন— বিয়ের পর প্রথম কয়েক বছর তাঁকে দেখিইনি।

কিন্তু সিতেশ ঠাকুরপো আসতেন। স্কুল থেকে জলপানি পেয়ে পাস দিলেন, কলেজে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে গল্প করতুম, খেলতুম, শাশুড়ির কাছে ধমক খেয়েও ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে একতলা অবধি ছুটোছুটি ছাড়িনি। শাড়িটা যদি খসে যায়-যায় হয়েছে, লজ্জা পাইনি, আঁচলটা কষে কোমরে বেঁধেছি। কখনও শাড়িটার পাড় পায়ে জড়িয়ে গেলে হোঁচট খেয়েছি।

শুধু খেলাই না। সিতেশ ঠাকুরপোর পড়ার বইও লুকিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিলুম। ওর সঙ্গে কত যে ঝগড়া হত, তর্ক হত। বই পড়তুম, কিছু বুঝতুম, কিছুটা বুঝতুম না। মানে জেনে নিয়ে·ফের পড়তুম। শেষে একদিন ওর কলেজের ক্লাসের বইও পড়তে আরম্ভ করে ওকে প্রায় ধরে ফেললুম।

এরই ফাঁকে ফাঁকে স্বামী যখন আসতেন, অবাক হতেন। "তুমি এত সব শিখলে কোথায়?"

"সিতু ঠাকুরপোর কাছে।" নিঃসঙ্কোচে বলতুম।

স্বামী বললেন, "ও।"

একটিমাত্র অক্ষর, তবু মনে হত একটু যেন আহত স্বর, একটু-বা গম্ভীর। তখন সঙ্কোচ হত।

কখনও কখনও উনি দেখেছেন, মাথায় খোলা চুল, ঘোমটা নেই, সিতেশ ঠাকুরপোর সঙ্গে সিঁড়িতে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করছি। উনি দেখতেন, থমকে দাঁড়াতেন, মনে হত কী বুঝি বলবেন, বলতেন না, নিজের ঘরে ঢুকতেন।

একদিন দেখি, বাক্স গোছাচ্ছেন। ওঁকে সেদিন কাজের জায়গায় ফিরে যেতে হবে। বললুম, "আবার কবে আসবে।"

বললেন, "আর আসব না।"

"কেন?"

"তুমি খুশি হও না বলে।"

বলে উঠলুম, "মিছে কথা। খুব খুশি হই।"

বিরস গলায় উনি বললেন, "তার চিহ্ন ত দেখিনে।"

ছেলেমানুষ ছিলুম ত, রোখ চাপলে তখন চুপ করে যেতে পারতুম না। "কে এলে আমি খুশি হই, তোমার মনে হয়?"

উনি শান্ত স্বরে বললেন, "নামটা নেহাতই কি আমার মুখে শুনতে হবে? সে কি তুমি নিজেও জান না?"

চলে যাবার আগে উনি কাছে এগিয়ে এলেন, আমার চিবুক তুলে ধরে বললেন, "তুমি জান না, বুঝতে পার না, আমি কত দুঃখ পাই।"

দুঃখ! এই কথাটার নতুন অর্থ তখন সবে জানতে শিখেছি। আগেও দুঃখ ছিল—গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাওয়া যেদিন বারণ হয়েছিল, সেদিন দুঃখ পেয়েছি, পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছি। এই সেদিনও ত দুঃখ হত মনের মত শাড়ি পরতে না পেলে। সে-ও দুঃখ—কিন্তু অর্থের পোশাক বদলে আজ ফিরে এসেছে। সকালের রোদ আর দুপুরের জ্বালা যেমন এক হয়েও আলাদা।

সেদিন উনি চলে যাবার পর অনেকক্ষণ কেঁদেছি। আগে কাঁদতুম পায়ে কাঁটা ফুটলে। এখনও কাঁটা ফুটলে কাঁদি, কিন্তু সে-কাঁটা পায়ে ফোটে না, শরীরের কোথাও না।

সুখেরও স্বাদ বদলে গিয়েছিল, যাচ্ছিল। নরম বালিশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়াই সেরা সুখ, অল্প বয়সে তাই জানতুম। কিংবা বৃষ্টিতে উঠোনে দৌড়োদৌড়ি করে শিল কুড়নো। কিন্তু দীর্ঘ রাত জুড়ে বিছানায় জেগে থেকে ছটফট করা, অথবা কোন একজনের কথা অহর্নিশি ভাবাও যে এক ধরনের সুখ, সেটা অনুভূতির পর্দায় সবে একটু একটু দোলা দিতে শুরু করেছে। সেই সুখ প্রিয়জন কেউ এলে থেকে থেকে বুকে কাঁপে। তার আসন আধেক বুঁজে আসা চোখের পাতায়।

আমার স্বামী কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের দুঃখের সঙ্গে সহজেই সন্ধি করে নিতে পেরেছিলেন। কিছুদিন পরে কলকাতাতেই একটা কাজ নিয়ে ফিরে এলেন। কোলে খোকা এল। সিতেশ ঠাকুরপো একটা কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন, বিয়ে করেননি, রোজ বিকেলে আসতেন। কিন্তু ওঁকে কোনদিন আর অনুযোগ করতে শুনিনি।

কেননা, আমাদের সম্পর্কটা তিনি তখন ধরতে পেরেছিলেন। দুটি সমবয়সীর সখ্য; রুচির মিল। হয়ত তারই উপরে আবেগের হালকা রঙের প্রলেপ। তার বেশি কিছু না।

উনি বুঝতেন। আমরা যখন গল্প করছি, এসে বসতেন। ইচ্ছে হলে আমাদের কথায় যোগ দিতেন। আবার উঠেও যেতেন।

কিন্তু ছেলেরা বোঝেনি। অনিল না, সুনীলও না। আজ যে-গলায় অনিল বলেছে 'ছি, মা, ছি', সেই তিরস্কারের ভঙ্গিটি কত দিন ওদের চোখে ফুটে উঠতে দেখেছি। ওরা যখন কিশোর তখন থেকেই।

হয়ত পাড়ার লোক কিছু বলত। বন্ধুরা ঠাট্টা করত। অনিল এক এক দিন হিংস্র গলায় বলেছে, "সিতেশ কাকা রোজ-রোজ কেন আসে মা, কেন আসে?"

"বা-রে, কাকা হন যে তোমার, আসবেন না?"

"কাকা না আরও কিছু। আমি সব বুঝি, সব জানি।"

মনে পাপ নেই, তবু আমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। উনি আড়ালে কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এসে ঠাস-ঠাস করে ছেলেকে কয়েকটা চড় মেরেছিলেন। আমি ত মা, ছাড়িয়ে দিতে গিয়েছি, অনিল আমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল, তবু আমার কাছে এল না, ওকে ছুঁতে দিল না।

সবই আজ মনে পড়ছে।

সিতেশ ঠাকুরপো ঘরের একজনের মতোই হয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাঁকে ওরা সহজ ভাবে মেনে নিতে পারেনি।

ওঁর মৃত্যুর পর সিতেশ ঠাকুরপো একদিন বলেছিলেন, "আমি আর আসব না।"

"কেন?"

"ছেলেরা হয়ত পছন্দ করছে না।"

দৃঢ় স্বরে বলেছি, "বাড়ি ছেলেদের একার নয়। তোমাকে আসতেই হবে, ঠাকুরপো।"

উনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। পরে ধীর গলায় বললেন, "আচ্ছা।"

রোজই আসতেন। থান কাপড় প'রে, পুজো সেরে ওঁর কাছে গিয়ে বসতুম। তখন আলোচনার বিষয়ও বদলে গিয়েছে। আগে বেশির ভাগ কথাই হত শিল্পকলা বা সাহিত্য নিয়ে, এখন জানিনা কী করে বা কোথা থেকে ধর্মের প্রসঙ্গও এসে পড়তে লাগল। যা নিয়ে কখনও ভাবিনি, সেই মরজীবনের পর-জীবন নিয়েও কত দিন কত কথা হত। আত্মার কথা আলোচনা করেছি আমরা, ভক্তির কথা, মুক্তির কথা।

বয়স অলক্ষ্য মাস্টারও। আমাদের রুচিও বদলে দেয়। আমরা বেড়াতেও যেতুম দক্ষিণেশ্বরে, বেলুড়ে। মন্দিরে গিয়ে কথকতা শুনতুম।

ছেলেরা হাসত। বউমা বিচিত্র দৃষ্টিতে চাইত।

ওরা ত হাসবেই। ঠাট্টা করবেই। ওরা তরুণ যে। যৌবনটা অহঙ্কারের

কাল। দেহবলে বলীয়ান। সেই বলটা মদের মতো। চেতনা, বুদ্ধি, সব আচ্ছন্ন করে রাখে। পৃথিবী যেন একা তারই, আর কারও না। শিশুর না, প্রৌঢ়ের না, জরাগ্রস্তের না। আপনবয়সী ছাড়া আর সকলকেই কৃপা বা করুণা করে। কী ধৃষ্টতা, এখন ত বুঝেছি। গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে যৌবন যাদের আসেনি বা গিয়েছে, তারাই ত দলে ভারী। শুধু দলে নয়, নানা বিষয়ে। শ্রেষ্ঠ, স্থায়ী শিল্প-কীর্তির, জ্ঞানান্বেষণের কতটুকুতে যৌবনের দাবী। প্রৌঢ় আর প্রাজ্ঞরাই চিন্তার ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। শুধু মাত্র জৈব-সৃষ্টির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও তো যৌবনের অনন্য নৈপুণ্য দেখিনে।

এ-সব কথা সিতেশবাবু আমাকে বলতেন, বোঝাতেন। ওরা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনত, হাসত। এমন দিন আসবে, আসছে, যখন ওরা বলবে, ওদের ছেলেরা হাসবে।

বয়স বেড়েছে, সিতেশবাবু লাঠি ধরেছেন, আমি চশমা। ঝুঁকে পড়ে বই পড়ি, আর ভাবি। ভাবনার জালে অজানা কত কী এসে রোজ ধরা দেয়।

তার কোনটা পাখি, কোনটা প্রজাপতি। তাদের সন্তর্পণে তুলে ধরি, পরখ করি। তারা আমার জানার সীমানাটা একটু একটু করে বাড়িয়ে দেয়।

খানিক আগে সুখ-দুঃখের কথা বলেছি। টের পাচ্ছিলুম, আমার সুখ-দুঃখের স্বাদ আবার ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে; ফিরে যাচ্ছে আবার সেই শৈশবে বা কৈশোরে, যখন আচার খেতে ভাল লাগত। এখন এই বয়সে আবার লুকিয়ে টক কুল খেতে শিখেছি। সেই আমার সুখ। এ-সুখ বুকে কাঁপে না, জিভ দিয়ে লালা হয়ে ঝরে। সেই কৈশোরে যেমন ঝরত। পুরনোই নতুন হয়ে ফিরে এসেছে। একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে আদি বিন্দুতে এসে ঠেকেছি।

কিংবা ঠেকিনি, ঠেকব। আমার মৃত্যুর মুহূর্তে জন্মক্ষণটিকে ফিরে পাব।

পঞ্চাশের কোঠা পেরিয়ে ষাটে পড়ল, ষাট গড়িয়ে গড়িয়ে ঢলে পড়েছে সত্তরে। সিতেশবাবু প্রতিদিনই এসেছেন। আগে লাঠি ভর করে, শেষের দিকে লাঠিতেও হত না, একটি রিক্সার সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছিলেন। তবু রোজ আসা চাই।

এসে বসতেন বাইরের ঘরে। লাঠিটা এক কোণে রেখে ঘাম মুছতেন। আমিও এসে বসতুম। তখন আর কথা হত না, বেশি না। উনি একটু হাসতেন, আমিও। দুটি হাসি মাঝপথে মিলে কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকত। এমন কত দিন হয়েছে। এক ঘণ্টার উপরে আমরা একই ঘরে বসে থেকেছি, কিন্তু একটিও কথা হয়নি, আমাদের শুধু দেখা হয়েছে।

সেই দিনান্তের দেখাটুকুও এক দিন শেষ হল। ওঁর হার্টের অসুখ হল, উপরে উঠতে পারেন না। আমি বাতে বিছানা নিয়েছি, নীচে নামি না।

তখনও আসতেন। দোতলায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সময়ে বাইরের রকে লাঠির

ঠকঠক কখন শোনা যাবে, তার অপেক্ষা করতুম। সেই ঠকঠক আর কিছু না, শুধু জানান, উনি আছেন, এখনও আছেন। শুধু জেনে নিতে আসা, আমি আছি কি না।

দেহে ত সাড়া নেই, সমস্ত মন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠত, আছি, আমিও আছি। সেই সাড়া কোন ধ্বনিকে ভর করে ওঁর কাছে যেত না, কিন্তু পেঁছত ঠিক। উনি বুঝতেন। রকে বসেই খানিক জিরিয়ে লাঠি ঠকঠক করে ফিরে যেতেন।

সেই আসা-যাওয়াটুকুও শেষ হয়ে গেল।

আমি ভয় পেয়েছি, আকুল হয়েছি। আমি কাঁদছি।

সময় পূর্ণ হলে যারা যায়, সংসার থেকে অপ্রয়োজনীয় বলে খারিজের খাতায় যাদের নাম ওঠে, তাদের মৃত্যুতে কি কেউ কাঁদে?

কাঁদে। বুড়োর শোকে বুড়িরাই কাঁদে।

সে কান্না শুধু বিচ্ছেদের নয়। প্রতিটি সমবয়সীর মরণ তাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদেরও যাবার দিন এল বলে।

আমিও যাব। তাই কাঁদছি। আমি মরলে কেউ ত কাঁদবে না, তাই নিজের মরণের কান্না নিজেই কেঁদে রাখছি।

আমার ছেলে, ছেলের বউ ভুল বুঝেছে। ভাবছে আমি কাঁদছি সিতেশ ঠাকুরপোর শোকে। তা ত নয়, আমি কাঁদছি আমার নিজেরই মৃত্যু-শোকে।

ঈর্ষা

রমাপদ চৌধুরী

এক সময় শান্তনুকে আমরা উপহাস করতাম। উপহাস করবার মতই একটা কাজ করে বসেছে তখন শান্তনু। বি. এ. পাস করার আগেই বিয়ে করে বসেছে। তাও একেবারে ডল-পুতুলের মত একটা গ্রাম্য মেয়েকে। গ্রাম্য, অশিক্ষিত, তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে গলা অবধি ঘোমটা টেনে যেদিন সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন না হেসে পারিনি। মনে হয়েছিল, নাকে মুক্তোর নাকছাবি না থেকে নথ থাকলেই যেন বেশী মানাত।

সহপাঠীদের সকলকে অবশ্য বরযাত্রী যাবার জন্যে বলেনি শান্তনু। খবরটা সকলের জানবার কথাও নয়। কিন্তু দেখা গেল সারা কলেজে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছে, শান্তনু বিয়ে করছে।

গোলগাল ফরসা নাদুসনুদুস চেহারার শান্তনুর মুখে-চোখে এমনিতেই কেমন একটা বোকা-বোকা ভাব ছিল। দুলে দুলে ঘাড় কাত করে হাঁটত সে, দুলে দুলে ঘাড় কাত করে ক্লাসে ঢুকত। আর তা দেখে মেয়েরা, যারা আড়াআড়ি করে পাতা কয়েকটা বেঞ্চিতে আমাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে বসত, তারা পরস্পরের সঙ্গে চোখের ইশারায় কী যেন বলাবলি করে ঠোঁট টিপে টিপে হাসত।

তাদের সেই চাপা হাসিটা কিন্তু সশব্দে খিলখিল করে উঠল শান্তনু যেদিন হলদে চিঠির তাড়া নিয়ে নিমন্ত্রণ জানাতে এল।

অন্য কেউ হলে হয়ত চেপে যেত। কিন্তু শান্তনু বলে ফেলল, বউ তার গ্রামের মেয়ে, ইস্কুলে ফিফ্‌থ্‌ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। বয়েস তেরো কি চোদ্দ। আর সব শেষে বললে, "মা বলেছে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর।"

খবরটা আমার কাছ থেকে শুনল নীলিমা, নীলিমার কাছ থেকে সমস্ত মেয়ে-মহল। হাসির হুল্লোড় উঠল তাদের মধ্যে।

ওঠবারই কথা। কারণ এ-কলেজের কোন ছাত্র তখন পর্যন্ত বিয়ের কথা কল্পনাও করেনি। ছাত্রীদের মধ্যে দু-দশজনের সিঁথিতে যদিবা সিঁদুর উঠেছিল, তবু তারা সিঁথির পাশের চুলগুলো ফাঁপিয়ে কীভাবে যেন সিঁদুরের রেখাটুকু ঢাকবার চেষ্টা করত। অর্থাৎ তখন কি ছাত্র কি ছাত্রী, আমাদের সকলের মনেই একটা রঙিন না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁয়া স্বপ্ন কুয়াশার মত জমে আছে। চোখে চোখে কত কী কল্পনা! হৃদয়ে অনেক রোমাঞ্চ!

নাকে নথ পরলে যাকে ভাল মানাত, শান্তনুর সেই জড় পদার্থের মত বউটিকে দেখে মনে মনে আমি গর্বিত না হয়ে পারিনি। কারণ নীলিমার মত মেয়ে আমাদের কলেজে আর-একটিও ছিল কিনা সন্দেহ। নীলিমার চেহারায় এমন একটা কিছু ছিল যার জন্যে সকলের চোখ গিয়ে পড়ত তারই উপর। রূপসী ছিল না নীলিমা, কিন্তু রূপে তার শ্রী ছিল। তার চেয়েও বেশী ছিল মুখেচোখে সপ্রতিভ ভাব। মুখের পেশীতে কোন কুঞ্চন না ফেলেও শুধু চোখ-জোড়া তার এত মধুর ভাবে হাসত, এত স্নিগ্ধ ছিল তার গলার স্বর যে তার সঙ্গে শুধু কথা বলার জন্যে অনেকেই লুব্ধ ছিল।

সেদিনই ক্লাস পালিয়ে প্রতিদিনের মত নিরুদ্দেশভাবে এ-গলি সে-গলি বেড়াতে বেড়াতে এক সময় নীলিমা হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল।— "রসগোল্লার বউকে দেখে এলেন?"

শান্তনুর গোলগাল চেহারার জন্যে মেয়েরা তাকে ঠাট্টা করে 'রসগোল্লা' নাম দিয়েছিল।

বললাম, "হ্যাঁ, দেখে এলাম।"

"কেমন দেখতে? পান্তুয়া, না লেডিগিনি?" বলে আবার হেসে উঠল নীলিমা।

বললাম, "লেডিগিনিই বলা চলে, যেমন কালো, তেমনি গোলগাল।"

নীলিমা হেসে বললে, "এইবার আপনিও একটা বিয়ে করে ফেলুন, অমনি একটা গেঁয়ো মেয়ে দেখে। দিব্যি রান্নাবান্না করে দেবে, কলেজে আসার আগে পান সেজে দেবে......"

সায় দিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, আর বছরে বছরে একটি করে......"

কথা শেষ করার আগেই হয়ত হেসে লুটিয়ে পড়ত নীলিমা, কোন রকমে আমার কাঁধে হাত রেখে সামলে নিল বটে, কিন্তু তার বুকের-কাছে-ধরা বই-খাতার স্তূপ ছিটকে পড়ল রাস্তার উপর। সেগুলো কুড়িয়ে দিতে দিতে লক্ষ্য করলাম, গলির মোড়ের দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি বয়স্কা গৃহিণী সকৌতুকে কী যেন বলাবলি করছে আমাদের সম্বন্ধে।

তাড়াতাড়ি দুজনেই পাশের গলিতে ঢুকে পড়লাম। কারণ লোকচক্ষুর দৃষ্টিতে বড় অস্বস্তি বোধ করতাম তখন। আর বুঝতে পারতাম না, কেন ষাট বছরের বুড়োও ফিরে তাকাত আমাদের দিকে, খোঁড়া ভিখিরীটাও কেন ড্যাবড্যাব করে তাকাত! আর মিষ্টির দোকানের সামনে উনোনের ঠাণ্ডা ছাইয়ের গাদায় কুস্তি লড়তে লড়তে ল্যাংপেঙে রাস্তার ছেলেগুলো কেন ছুটে এসে নীলিমার কাছে পয়সা চাইত!

এখন বুঝতে পারি। কতই বা বয়স তখন আমাদের! কুড়িও পার হয়নি। নীলিমার বয়স কিছু কম। আর তখন আমি যদিও একখানা বাঁধানো খাতা নিয়ে কলেজে আসি, নীলিমা কিন্তু আসত একরাশ বই-খাতা দু হাতে

আড়াআড়ি করে বুকে চেপে। তাই সকলেই হয়ত বুঝতে পারত, আমরা কলেজ পালিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ক্রমশ নেশাটা আমাদের দুজনকেই এমন ভাবে পেয়ে বসল যে, বলা চলে কলেজ পালাবার জন্যেই আমরা কলেজে আসতাম। দুপুরের রোদে টো-টো করে ঘুরে বেড়াতাম কোনদিন, কখনও বা নির্জন কোন চায়ের দোকানে। যেদিন সময় বেশী পেতাম চলে যেতাম চিড়িয়াখানায়, মিউজিয়মে চাঁদপাল ঘাটে। ইডেন গার্ডেনের সবুজ ঘাস—কিংবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের গাছের ছায়ায় বসে বসে কীভাবে যে সন্ধে হয়ে যেত টের পেতাম না। কখনও অনর্গল আজেবাজে অর্থহীন কথায়, কখনও নিশ্চুপ স্তব্ধতায় শুধু পরস্পরের সান্নিধ্য-টুকু উপভোগ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত।

পরীক্ষার তখন মাত্র কয়েকটা মাস বাকী। তবু পরীক্ষার কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে পড়িয়ে দিল শান্তনু।

হঠাৎ একদিন এসে বললে, "পরীক্ষা দেওয়া আর হল না, কলেজ ছেড়ে দিচ্ছি।"

"কেন?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

শান্তনুর চোখ ছলছল করে উঠল। বললে, "এ কলেজে পড়ার এত ইচ্ছে ছিল আমার......"

বললাম, "পড়লি না কেন? কে বাধা দিচ্ছে?"

শান্তনু বিষন্ন হাসি হেসে বললে, "এখানে মেয়েরাও পড়ে জানতে পেরে মা বললে, বিয়ে না করলে পড়া চলবে না। এখন বলছে, চাকরি না করলে, রোজগার না করলে বউকে এনে রাখা চলবে না। কী করি বল্? তোরা কিন্তু বেশ আছিস, ভাই।"

না হেসে পারিনি তার দুর্দশায়। তারপর যখন শুনলাম কোন একটা আপিসে চাকরি পেয়েছে সে, পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, তখন তাকে রীতিমত নির্বোধ মনে হয়েছিল। চাকরি কি পালিয়ে যাচ্ছে? পড়া শেষ করে করা যেত না?

নীলিমা শুনে হেসে উঠল।—"হরিপদ কেরানী এবার আকবর বাদশা হবে। আপনিও একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়ে কলেজ ছেড়ে দিন না।"

বললাম, "দেব, এখন নয়, কয়েক বছর বাদে। আর তখন যদি বেগম পাই বাদশা হতে বাধবে না।"

নীলিমার সুন্দর শরীরটা উচ্ছল হাসির তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠল। শাড়ির আঁচলটায় ডান হাতখানা মুড়ে দাঁতে তার প্রান্তটুকু চেপে বললে, "কলেজে-পড়া মেয়ে ত আর বেগম হবে না, তার জন্যে লেডিগিনি খুঁজতে হবে।"

কিন্তু আমি জানতাম. স্পষ্ট করে ভালবাসার কথা কোনদিন উচ্চারণ না করলেও, ভবিষ্যতের একটি শান্ত সংসারের ছবি আমাদের কারও মনে উদয় না হলেও আমরা পরস্পরের ওপর একটা অস্বাক্ষরিত স্থিরবিশ্বাসের দাবি মেনে

নিয়েছিলাম। মেনে নিয়েছিলাম বলেই সে-কথাটা কোনদিন প্রকাশ করে বলিনি, সে-কথাটা শোনবার জন্যে কোনদিন আগ্রহ প্রকাশ করিনি।

শুধু পরীক্ষা পাস করে নীলিমাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "এবার?"

"চাকরি নাও।"

পরীক্ষা পাস করে নীলিমা এসে প্রশ্ন করেছিল, "এবার?"

"আবার পড়।"

অর্থাৎ তখন আমরা পরস্পরের উপদেষ্টা।

সুযোগ পেয়ে একটা চাকরিতে ঢুকে পড়লাম সেই সময়ে। আর ভাবলাম, এইবার বলি নীলিমাকে নতুন সংসারের কথা। যদিও তখন মনে মনে বেশ একটা সন্দেহ ছিল, এই রোজগারে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখা নির্বুদ্ধিতা কিনা! কিন্তু তা যে এতখানি নির্বুদ্ধিতা বুঝতে পারতাম না, যদি না সিনেমা-হল্ থেকে বেরিয়ে এসেই শান্তনুর সঙ্গে দেখা হত।

শান্তনুকে দেখতে পেয়েই আমার হাতে একটা চিমটি কেটে কৌতুকে হেসে উঠল নীলিমা। যেন শান্তনুর চেহারাটাই হাস্যকর। বললে, "রসগোল্লা। তোমার বন্ধু।"

শান্তনু তখন ফিরে তাকিয়েছে।

বললাম, "কী রে কী খবর?"

নীলিমা আঁচলে হাসি ঢেকে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। আর তার দিকে তাকিয়ে শান্তনুর মুখে কেমন একটা অস্বস্তির ছাপ পড়ল।

তবু কিন্তু-কিন্তু করে বললে, "বেশ আছিস তোরা। আমি ভাই নাজেহাল হয়ে গেলাম। এক শ টাকা মাইনে, এদিকে দুটো বাচ্চা। ছোটটা, মেয়েটা ভুগছে ক' মাস থেকে, ডাক্তারের খরচ দিতেই ফতুর হয়ে গেলাম।"

আরও অনেক দুঃখের কথা বলল শান্তনু। শেষে জিজ্ঞেস করল, "বিয়ে করেছিস?"

বললাম, "না।"

শান্তনু হেসে বললে, "তোর কী, শিক্ষিত শহুরে মেয়ে বিয়ে করবি, দরকার হয় দুজনেই চাকরি করে দিব্যি সংসার চালাতে পারবি। যাক, চলি ভাই, ছেলেটার জন্যে আবার ওষুধ নিয়ে যেতে হবে।"

শান্তনু চলে গেল। আর তার দুর্দশার কথা শুনে নীলিমা হেসে কুটিকুটি।

তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে বললে, "আমি বাবা ও-সবের মধ্যে নেই। চাকরিবাকরি একটা না করে......"

আমারও মনে হল, কথাটা মোটেই যুক্তিহীন নয়। স্বপ্ন দেখা এক জিনিস, আর তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া অন্য। অর্থই পরমার্থ এ-যুগে, তার অভাবে কত সুখের সংসারও বিস্বাদ হয়ে যায়। কত উন্মাদ সমুদ্র নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়।

এ-কথাটা বোধহয় আমার চেয়েও ভাল করে বুঝত নীলিমা। তাই পড়া শেষ করেই একটা চাকরির জন্যে উঠে-পড়ে লাগল সে। আর শেষ পর্যন্ত একটা মেয়েদের ইস্কুলে চাকরি পেয়েও গেল।

তারপর একটা বিশেষ দিন দেখে আমাদের পরস্পরের স্থিরবিশ্বাসকে স্বাক্ষরিত রূপ দিলাম। উঠে এলাম এই ছোট্ট ফ্ল্যাটে।

এতদিন শান্ত সংযত ছিল নীলিমা। বাস্তবের মাটি থেকে এতটুকু পা তুলতে রাজী হত না। কিন্তু এই নতুন ঘরের হাওয়ায় কী যেন এক নেশা ছিল। উচ্ছল উন্মাদনায় নেচে উঠল ওর চোখের তারা। এই প্রথম বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করল।

কোত্থেকে একটা বাচ্চা চাকর যোগাড় করে আনল, তাকেই রান্নার কাজ শিখিয়ে নেবে। চল, একটা কুকার কিনে নিয়ে আসি, কমলাদি বলছিল, রান্নার খুব সুবিধে। খাট কী হবে, একটা তক্তাপোশ হলেই চলবে। রেণুদি, ভূগোলের টীচার, বলছিলেন যে, চেয়ার-টেবিল নিলামে কিনলে অনেক সস্তা। জানলার পর্দাটা পালটে আনবে, সবুজ রঙ আমার বিষ লাগে। চল, তোমার সঙ্গে আমিও বাজার যাব। এই যা, তালাই কেনা হয়নি যে! না, না, কেনা তোশকে শুতে পারব না। মড়া নিয়ে যাওয়ার কিনা কে জানে! তার চেয়ে নতুন তৈরী করিয়ে নাও। দুদিন কি মাদুরে শোয়া যাবে না! একটা ফুলদানি কিনে আনব ইস্কুল থেকে ফেরবার সময়, কেমন!

সত্যি, দেখে দেখে বিস্মিত হতাম। দুদিনেই ছোট্ট ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর কী সুন্দর করে সাজিয়ে তুলল নীলিমা। জীবনের কোথাও যেন যতি নেই, ছেদ নেই। সংসারের কোথাও যেন কুশ্রীতা রাখবে না, গ্লানি রাখবে না।

আনন্দের স্রোতে, রোমাঞ্চের মত্ততায় গা ভাসিয়ে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। আশা করেছিলাম এমনি করেই বুঝি সমস্ত জীবনটা কেটে যাবে। কিংবা কে জানে, জীবনের কথাই হয়ত তখন ভাবতাম না। জীবন যে এত দীর্ঘ তা জানতাম না।

আমাদের দুজনের মনেই তখন একটি নেশা। পরস্পরকে চমকে দেবার নেশা। কোন-কোনদিন তাই আপিসের ছুটি হওয়ার অনেক আগেই ফিরে আসতাম। কোনদিন নীলিমা ফিরে আসত অনেক দেরিতে। তার প্রতীক্ষায় বসে থেকে বিরক্ত-হয়ে-ওঠা আমার মুখটা দেখতে নাকি বেশ মজা লাগে। বলত নীলিমা।

এমনি করেই দিন কেটে যাচ্ছিল। শুধু দুঃসহ লাগত মাঝে মাঝে যখন নাইট ডিউটি দিতে হত। অথচ সেটুকু সহ্য না করেও উপায় ছিল না। খবরের কাগজের আপিসে বার্তা-বিভাগের চাকরি, সে কেন জানতে চাইবে একটি নতুন-বাঁধা হৃদয়ের বার্তা।

নীলিমা মাঝে মাঝে অনুযোগ করত, "ও-চাকরি তুমি ছেড়ে দাও।"

বলতাম, "দেব, তার আগে অন্য একটা জুটিয়ে নিয়ে।"

কিন্তু জুটিয়ে নেব বললেই কি জোটে? না কি চাকরি করতে করতে সে-উদ্যম সকলের থাকে?

তবু তারই মাঝে রোমাঞ্চ বুনে নিতাম। চেষ্টা করতাম, যাতে পরস্পরকে চমকে দেওয়ার নেশাটা না কেটে যায়।

তাই সেদিন নাইট-ডিউটি সত্ত্বেও শরীর খারাপের নাম করে ফিরে এলাম। গলির চৌকো ধোঁয়াটে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ।

ঘরে ঢুকেই বললাম, "আজকের এমন সুন্দর রাতটা তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে হল না, চল, ছাদে গিয়ে বসি।"

চোখ কপালে তুলল নীলিমা। বিছানার ওপর স্তূপীকৃত খাতার রাশি দেখিয়ে বললে, "বেশ, আর ঐ পরীক্ষার খাতাগুলো কে দেখবে? কালকেই শেষ দিন, ফেরত দিতে হবে।"

সারা রাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করলাম, ঘুমবার চেষ্টা করলাম। আর হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম, নীলিমা তখনও টেবিল-ল্যাম্পের নীচে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষার খাতা দেখছে। নিজেকে শান্ত করলাম এই ভেবে যে, প্রতিদিনই ত আর পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে না নীলিমাকে।

এদিকে ক্রমশ টের পাচ্ছিলাম একটা সংসারকে সচল রাখতে দুটো রোজ-গারের চাকাও যথেষ্ট নয়। তাই উপরি আয়ের চেষ্টা করতে হত। আর সেই উপরি আয়ের আশাতেই সুযোগ পেলে দু-চারটে প্রবন্ধ লিখতাম। দু-চারখানা বই আর পত্রিকা উল্টেপাল্টে দেখে 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতি' বা 'স্বাধীনতা ও মহাত্মাজী' ধরনের প্রবন্ধ লেখা ত এমন কিছু শক্ত নয়। দু-দশ টাকা যদি আসে ত মন্দ কি!

ভোরবেলায় উঠে খাতা-কলম নিয়ে হয়ত লিখতে শুরু করেছি, অমনি নীলিমা এসে বললে, "এই, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, চল, আজ রেণুদি আমাদের দুজনকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছেন। তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন—"

"কিন্তু প্রবন্ধটা যে আজকেই চাই।"

মুখ থমথম করে উঠত নীলিমার।—"তা বলে সামাজিকতা মানবে না? নেমন্তন্ন করেছেন—"

বাধ্য হয়েই উঠতে হত। কিন্তু তখন বোধহয় বুঝতে পারতাম না যে ভিতরে ভিতরে একটু একটু করে নীলিমার উপর আমি অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছি।

সংসারের চাকাকে সচল রাখতে হলে কিছু উপরি আয় যে প্রয়োজন তা নীলিমাও যে বুঝত তার প্রমাণ পেলাম দিন কয়েক পরেই।

সারাদিন আপিস করে ভিড় ঠেলে বাসে উঠে বাসায় ফিরতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছিল। বাসায় ঢোকার আগেই নীলিমার গলা শুনলাম। বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "এতবার বললাম মনে থাকছে না কেন?

চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হলেন কেন? কী দেখে অনুশোচনা হল তাঁর?"

কী ব্যাপার? ঢুকেই দেখি, একটি বছর বারো বয়সের মেয়ে মাথা নিচু করে বসে আছে, আর নীলিমা পড়াচ্ছে তাকে।

পাশের ঘরে এসে বসলাম। সমস্ত শরীর ক্লান্ত লাগছিল, মন বিরক্ত হয়ে উঠল। কানের কাছে তখনও নীলিমার গলা ভেসে আসছে : কলিঙ্গ যুদ্ধজয়ের পর শত শত সহস্র সহস্র মৃতদেহ দেখিয়া সম্রাট অশোক...

নটা বাজার পর ছাত্রীকে বিদায় দিয়ে উঠে এল নীলিমা। মৃদু হেসে বললে, "আজ থেকেই শুরু করলাম। বলিনি তোমাকে, মাসে পঁচিশ টাকা করে দেবে, শুধু সন্ধের সময়টা পড়াতে হবে।"

সমস্ত মন যেন বিষিয়ে উঠছিল নীলিমার বিরুদ্ধে, নিজের অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, কখন থেকে যেন অদৃষ্ট মানতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

আমার মুখের ভাবে বোধহয় মনের ঝড়টা টের পেল নীলিমা। কৌতুকের হাসি হেসে এসে দাঁড়াল আমার পিছনে। ওর নরম সরু সরু আঙুলগুলো আমার চুলের মধ্যে কাঁকুইয়ের মত টানতে টানতে বললে, "রাগ কোর না, লক্ষ্মীটি। দুটো টাকা যদি পাওয়া যায়, রাণুদি কমলাদিও ত ট্যুইশনি করেন। তা ছাড়া তোমার খাটুনি ত কত বেশী, আমার মোটেই কষ্ট হয় না।"

মন নরম হয়ে গেল মুহূর্তে। বেচারী। আমার জন্যেই ত......

সব বুঝতাম। কিন্তু সব বুঝেও নীলিমার বিরুদ্ধে এভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠব একদিন, আমি নিজেও কল্পনা করিনি।

মাস কয়েক পরের কথা। নাইট ডিউটি দিয়ে ফিরে এলাম ভোরবেলায়। খিদেয় পেট জ্বলছে, ক্লান্ত শরীর, অথচ......

বাড়ি পোঁছেই দেখলাম, নীলিমা সেজেগুজে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্লেটে ঢেলে চা খাচ্ছে। বেশ একটা তাড়াহুড়োর ভাব মুখে চোখে।

বললাম, "কী ব্যাপার?"

হাসল নীলিমা।—"মর্নিং স্কুল শুরু হল যে। স্টোভে জল চড়িয়ে দিয়েছি, চা-টা তুমিই করে নিও, আর কিছু খাও ত চাকরটাকে বোল......"

বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে।

সে এক দুঃসহ জ্বালা। দিনের পর দিন। ভোরবেলায় ফিরে আসি, আর নীলিমা ছুটতে ছুটতে চলে যায় মর্নিং স্কুলে। রাত জাগতে হবে বলে এগারোটার মধ্যে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি, নীলিমা কখন ফেরে টেরও পাই না। সন্ধের সময় ঘুম থেকে উঠে দেখতাম নীলিমার ছাত্রী এসে হাজির হয়েছে। কানের পাশে পাঠ্যপুস্তকের ঘ্যানঘ্যানানি ভাল লাগত না, বেরিয়ে পড়তাম। একা একা ঘুরে বেড়াতাম রাস্তায়, পার্কে, যেখানে খুশি।

নটার সময় ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আপিসে বেরিয়ে যেতাম। বাড়িতে

একা বসে থাকার চেয়ে যেন বাইরে একা থাকাও অনেক রমণীয়। নীলিমাকে পেয়ে নীলিমার সান্নিধ্যের লোভে যে বন্ধুদের ভুলে গিয়েছিলাম, তাদেরই খুঁজে বেড়াতাম, খুঁজে বের করতাম কখনও কখনও।

তবু এক-একদিন হঠাৎ মনে রোমাঞ্চ জাগত। মনে হত নীলিমার উপর যেন অবিচার করছি।

সেদিন দুপুরের সীফ্‌ট্‌ শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে হঠাৎ মনে হল, বহুদিন সিনেমা দেখিনি। নীলিমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা দেখিনি বহুদিন। একেবারে দুখানা টিকিট কেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। রবিবার, সুতরাং নীলিমার ছাত্রী থাকবে না আজ।

এসে বললাম, "চল, সিনেমা দেখে আসি, টিকিট কেটে এনেছি।"

চোখ কপালে তুলল নীলিমা।—"না জিগ্যেস করেই টিকিট কাটলে?"

"কেন? ছাত্রী ত নেই আজ।"

নীলিমা হাসল, বিমর্ষ হাসি।—"ছাত্রী নেই, কিন্তু আমিই ছাত্রী এখন। সামনের হপ্তায় পরীক্ষা দিতে হবে, পাস করলে মাইনে বাড়বে কিছু।"

বললাম, "তা হলেই বা। পরীক্ষা ত আজ নয়।"

"বাঃ রে, সব ত ভুলে গেছি, ঝালিয়ে নিতে হবে না একটু!"

অনুরোধ করলাম, বললাম, "টাকার চিন্তা তোমাকে করতে হবে না।" তবু শুনল না নীলিমা। বললে, "আহা, শুধু টাকার জন্যেই নাকি! ইস্কুলের সব টীচার দিচ্ছে, সবাই পাস করবে আর আমি যদি ফেল করি? প্রেস্টিজ বলে ত একটা কথা আছে।"

বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম। টাকা, প্রেস্টিজ, ইস্কুল, ট্যুইশনি, পরীক্ষার খাতা! সারা শরীর রী-রী করে উঠল। না, প্রয়োজন নেই নীলিমার। দেখি রাস্তায়, ঘাটে, পার্কে কোথাও কোন চেনা লোক পাওয়া যায় কিনা! তাকে নিয়েই সিনেমা দেখে আসব।

ভাগ্যক্রমে দেখাও হয়ে গেল। হাতে ছাতা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের জুতো, পিঠটা কুঁজো হয়ে গিয়েছে। প্রথমটা চিনতে পারিনি।

সামনাসামনি হতেই থমকে দাঁড়ালাম।—"শান্তনু না?"

শান্তনু হাসল।—"কী খবর? বিয়েটিয়ে করেছিস?"

বললাম, "করেছি। নীলিমাকে। তুই ত দেখেছিস তাকে। কিন্তু তাকে বিয়ে করেই এই দুর্দশা, একা একা সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। চল্‌ তুইও।"

খুশীই হল শান্তনু। বেশ বুঝলাম, অর্থাভাবে বেচারা সিনেমা দেখতে পায়নি বহুদিন।

সিনেমা দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে শুধু বলে, "বাঃ, বেশ ছবিটা। বউকে নিয়ে এলে হত। একা একা দেখলাম, শুনে এত চটবে!"

(সং. ৫-১০) রমাপদ চৌধুরী

সিনেমা থেকে ফিরতে ফিরতে শান্তনু হঠাৎ বললে, "চল্, একটু চা খেয়ে যাবি আমার বাসায়।"

বললাম, "চল্। তোর বউয়ের সঙ্গেও আলাপ হবে।"

শান্তনু ঠিক সেই আগেকার মতই বোকা-বোকা লজ্জার হাসি হাসল। সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, "আলাপ করবি? কী আলাপ করবি, গেঁয়ো বউ ত আমার।"

ছোট্ট একতলার একখানা ঘর, একফালি বারান্দা। পুরনো বাড়ি, দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে কোথাও কোথাও। আর সারা ঘরখানা জিনিসপত্রে ঠাসা। তক্তপোশ, তোরঙ্গ, একটা মোড়া, দেয়ালে-ঝোলানো একটা কাপড়ের টিয়াপাখি, মা-কালীর একখানা বাঁধান ছবি, তিনটে ক্যালেন্ডার। একসময় এ-ঘরে দু মিনিট থাকতে হলে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। কিন্তু কেন জানি না, বেশ ভালই লাগল।

বিছানার উপর একটা রোগা মেয়ে ঘুমচ্ছিল। আর ছেলেটাকে কোলে করে নিয়ে এল শান্তনু। ফিসফিস করে কী যেন বলে এল ওদিকের বারান্দায়। বুঝলাম শান্তনুর স্ত্রী রান্না করছে।

বিছানার উপর থেকে তালপাতার পাখাটা নিয়ে গেল শান্তনু। দরজার এ-পাশ থেকে যেটুকু দেখা যায়, দেখলাম শান্তনু বসে বসে উনুনে হাওয়া করছে।

একটু পরেই একটা প্লেটে করে কিছু ফল নিয়ে এসে দাঁড়াল শান্তনুর স্ত্রী। একটু রোগা হয়েছে, কালো হয়েছে আগের চেয়ে। ঘোমটা কমেছে তার। তবে সেই লাজুক হাসিটা আছে এখনও।

বললাম, "এসব কী হবে, আমি ফল খাই না। চা দিন বরং।"

শান্তনুর স্ত্রী হেসে বললে, "গরিবের ঘরে আম কলা ছাড়া আর কী দেব বলুন! এসেছেন যখন খেতে হবে।"

খেলাম, তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম।

শান্তনুর স্ত্রী কাজের ফাঁকে ফাঁকে এল, কথা বলল, একবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে পাখা করতে করতে গায়ে হাত দিয়ে বললে, "জ্বর ছেড়েছে বোধহয়।"

শান্তনু বললে, "মেয়েটা বড় ভুগছে। একটা সারে ত আরেকটা হয়।"

শান্তনুর স্ত্রী বললে, "আজ ত দক্ষিণেশ্বর যাব ভেবেছিলাম, ওর জ্বরটার জন্যেই যাওয়া হল না।"

"দক্ষিণেশ্বর!" বিস্মিত হয়ে বললাম, "কেন?"

শান্তনুর স্ত্রী হাসল। বললে, "বেড়াতে। আমরা ত রবিবারে রবিবারে বেড়াতে যাই। কখনও বেলুড়, কখনও দক্ষিণেশ্বর।" শান্তনুর স্ত্রী একটু পরে সশব্দে হেসে উঠে বললে, "কিন্তু সবচেয়ে মজা হয়েছিল ডায়মণ্ডহারবার গিয়ে। বলব?"

বলে কৌতুকের চোখে তাকাল সে শান্তনুর দিকে। শান্তনু হাসল, ইশারায় নিষেধ জানাল।

বললাম, "আর অন্য দিনগুলো কী করিস?"

শান্তনু হাসল। স্ত্রীর সঙ্গে একবার চোখাচোখি করে হেসে বললে, "উনি আসার পর থেকে কিছু করবার সময় কই? সকালে বাজার যাই, দাড়ি কামাই, আপিস যাই। আর বিকেলে দু মিনিট ফিরতে দেরি হলে ও দরজা খুলবে না। তাই ফিরে এসে ছেলেমেয়েগুলোকে দেখি একটু, ও রান্না করে।"

"ব্যস, আর কিছু না?" প্রশ্ন করলাম সবিস্ময়ে।

শান্তনু হেসে বললে, "এই উনুনে পাখাটাখা করে দিই, কয়লা ভেঙে দিই, ও বেচারী একা আর কত করবে বল্।" তারপর লাজুক হাসি হেসে শান্তনু বললে, "তোরা ত বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস......"

বিদায় নিয়ে চলে এলাম আর একা একা আমার নির্জন নিঃসঙ্গ বাসার পথ ধরে আসতে আসতে মনে মনে বললাম, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি, শান্তনুকে আমি ঈর্ষা করি।

নীলিমা তখনও গুনগুন করে কী যেন মুখস্থ করছে। পরীক্ষার পড়া, প্রেস্টিজের পড়া, মাইনে বাড়ানর পড়া।

বললাম, "পড়া রাখ তোমার, শোন, আজ রসগোল্লার বাড়ি গিয়েছিলাম। অভাবের সংসার হলেও......"

খিলখিল করে হেসে উঠল নীলিমা।—"লেডিগিনিকে দেখলে?"

"দেখলাম। এত সামান্য রোজগার, তায় একটা ছেলে একটা মেয়ে, কিন্তু..."

নীলিমা হঠাৎ হেসে উঠল। বললে, "ও-ভাবে অভাব-অনটনে সংসার করার শখ যে কেন হয় ওদের!"

বলল বটে, কিন্তু মনে হল নীলিমাও যেন লেডিগিনিকে ঈর্ষা করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে, কেন জানি না, শান্তনুর কথাটা মনে পড়ল।—তোরা ত বেশ আছিস, অভাব নেই, দুজনে রোজগার করিস......

কথাটা যেন সমস্ত দেহমনে সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়ে দিল। সান্ত্বনা এইটুকুই যে, শান্তনুও আমাদের ঈর্ষা করে।

গান্ধারী

ননী ভৌমিক

মেডিকেল কলেজে পড়ি। ছুটিতে ছুটিতে বাড়ি যাই। বাড়ি মানে মফস্বল জেলার একটা শহর। বাড়ি যাই আর আশ্চর্য লাগে। যে শহরটাতে বড় হয়ে উঠেছি, সেটা আসলে এত তুচ্ছ, মামুলী, এত পেছিয়ে পড়া ছিল নাকি কখনো ?

শহরটা হয়ত যা ছিল তাই আছে, হয়ত বা একটু এগিয়েছে। কিন্তু আমাদের মন এগিয়ে চলেছে তার চেয়ে অনেক দ্রুত একটা গতিতে। তাই এক একবার ছুটিতে শহরে আসি, আর এক এক পোঁচ ম্লান হয়ে যায় শহরটা, এক এক ডিগ্রি তুচ্ছ। ছেলেবেলায় মোড়ের যে ঝুপসি গাছটা দেখে বিস্ময়ে চোখ ভরে উঠত, এক ছুটিতে এসে চোখে পড়ল তার মধ্যে এতটুকু অসাধারণ কিছু নেই। নিতান্ত মাঝারি আকারের একটা ধুলো ভরা বট। মেথর পাড়ার যে বদরাগী ভয়াবহ মাতালটাকে দেখে পাড়াশুদ্ধ সকলে বারবার ভয় পেয়েছি, আর মনে মনে অসুরের মূর্তি কল্পনা করেছি, এক ছুটিতে এসে মনে হল সে একটা নিতান্ত গ্রাম্য বিনীত বৃদ্ধ লক্ষ্মীছাড়া মাত্র। তাকে দেখে করুণা ছাড়া আর কোনো ভয়াবহ অনুভূতির অবকাশই হবে না।

শহরের সবচেয়ে বলবান লোকটা, সবচেয়ে সুপুরুষ বাবুটি, সবচেয়ে মাননীয় মাষ্টারমশাই—বছরের পর বছর এ'রা সকলেই আমাদের চোখে এক এক পোঁচ ম্লান, এক এক ডিগ্রি করে মামুলী হয়ে উঠতে লাগলেন। আমাদের কষ্ট হত, তবু মেনে নিয়েছিলাম এই হবে, কেন না আমরা তখন এক এক ডিগ্রি করে এগিয়ে চলেছি।

ফলে মা-মণিকে দেখে সেই ছেলেবেলার যা যা মনে হত, পরে যে আর তা মনে হবে না, সেটা জানা কথা। তবু ছুটিতে এলেই মা-মণির সঙ্গে একবার করে দেখা না করে যেতাম না। তাঁর রান্নাঘরের সামনে পিঁড়ি পেতে বসতাম, চা খেতাম কাঁসার গেলাসে। ওঁদের বাড়িতে চিনেমাটির কাপ বড়ো একটা থাকত না।

আর গল্প করতাম। মা-মণি নিজে যেমন গল্প করতে ভালোবাসতেন, তেমনি শোনার মতো গল্প পেলেও ছাড়তেন না। বলতেন, 'তোরা তো আজকাল কলকাতার লোক। নতুন কি সিনেমা দেখলি বল না।'

নতুন দেখা যা-কিছু, নতুন আইডিয়া যা-কিছু যথাসাধ্য মা-মণিকে

শোনাতাম। অতি আধুনিক কোনো একটা ইংরেজি ফিল্ম কিংবা অতিখ্যাত কোনো একটা ফরাসী উপন্যাসের গল্প শুনিয়ে বলতাম, 'জানো মা-মণি, দুনিয়াটা ভয়ানক এগিয়ে যাচ্ছে। লোকে আর সুন্দর করে বানাতে চায় না, সত্যি করে বলতে চায়।'

'কিন্তু এ তোদের কি সত্যি হলরে বীরু? যে গল্প বললি তার মানে তো এই যে ভালোবাসাটা আসলে ভালোবাসা নয়, নিতান্ত স্বার্থপর একটা প্রবৃত্তি? এ কী রকম সত্যি? এ সত্যি জেনে লাভ কি?'

আমি ডাক্তারির ছাত্র। ডাক্তারি প্রমাণ দিয়ে জানাতাম, 'রকম টকম বুঝি না, লাভ লোকসানের কথা নয় কিন্তু এই-ই হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার। বিজ্ঞানকে গাল দাও কিংবা গ্রহণ করো, সেটা বিজ্ঞানই।'

মা-মণি বলতেন, 'হয়ত তোদের কথাই সত্যি। কিন্তু সব সত্যি তোরাই জেনে ফেলেছিস বলতে চাস? আর হলেই বা সত্যি। সত্যিই কি সব? আমি যদি না মানি?'

মা-মণি তর্ক করতেন কিন্তু কিছু না জেনে। সেই অনেক কাল আগে যা জেনেছিলেন যা শিখেছিলেন সেইটুকুর জোরে। তারপর না পেরে, উঠে যেতেন সংসারের এটা ওটা কাজে। কোলের মেয়েটাকে দুধ খাওয়ানো হয় নি। তার বড়োটা ধুলোর মধ্যে গড়াচ্ছে। বড়ো ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকে বাড়িতে বিশেষ থাকে না। মাঝখানের ছেলেমেয়েগুলো পড়ার নামে এর ওর সঙ্গে খুনশুটি করে চলেছে অনবরত।

আর তখন, অসহ্য মামুলী মনে হত মা-মণিকে। অসহ্য রকমের পেছিয়ে পড়া এক গ্রাম্য মাষ্টারের মধ্যবয়সী স্ত্রী মাত্র। সংসারের অনটন আর একগাদা ছেলেমেয়ে ছাড়া আর কোনো ভাবনা ভাবার ক্ষমতা যার নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেকদিন। অথচ এই মা-মণিকে আমরা একদিন কী চোখেই না দেখেছিলাম।

ইংরেজির নতুন মাষ্টার এসেছিলেন প্রমথবাবু। যা পড়াতেন সব কিছুই অপূর্ব লাগত। স্কুলের পড়া ছাড়াও তাঁর বাড়িতে আমরা হানা দিতাম দলবেঁধে। আর কিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল প্রমথবাবুর চেয়েও বড়ো আকর্ষণ আছে প্রমথবাবুর বাড়িতে : মা-মণি।

প্রমথবাবুকে আমরা ডাকতাম স্যার বলে। প্রমথবাবুর স্ত্রীকে কি বলে ডাকা যায় আমরা ভেবে পাই নি : গুরুমা? কাকীমা, মাসীমা? কোনোটাই ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। মা-মণিই বললেন, 'শোনো, গুরুমা-টুরুমা নয় বাবা। কি বিচ্ছিরি সেকেলে ডাক। তোমরা বরং আমাকে মা-মণি বলে ডেকো, কেমন?'

ডাকার মতো এমন সুন্দর একটা নাম আমরা এর আগে কখনো শুনিনি। উল্লাসে আমরা চেঁচিয়েছিলাম, 'ঠিক তো! কি সুন্দর নাম। মা-মণির মাথা ছাড়া এসব আর কারো কাছ থেকে বেরুত না।'

আমাদের কাছে মা-মণি ছিলেন যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আধুনিক তারই প্রতীক।

আমাদের যেতে দেখলে মা-মণি একটা না একটা কবিতার লাইন বলে আমাদের অভ্যর্থনা করতেন। আর সব কবিতা রবীন্দ্রনাথের।

যাবো বলে কোনোদিন যদি যেতে দেরি হত, তো দেখতাম মা-মণি ঠিক দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। আমাদের দেখে সুর করে বলে উঠতেন, 'ঘণ্টা বেজে গেছে কখন অনেক হল বেলা...'

বাইরের ঘরে অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে প্রমথবাবু যখন তাঁর দরিদ্র আয়োজন নিয়ে বিব্রত হয়ে উঠতেন, তখন অন্দরে মা-মণি খানিক রহস্য খানিক আক্ষেপে চা তৈরি করতে করতে হাসতেন, 'কোথায় বাদ্য কোথায় মাল্য কোথায় আয়োজন...' আর তখন মা-মণির সংসারের সমস্ত দারিদ্র্যটুকুও যেন সুন্দর হয়ে উঠত।

আমরা প্রায়ই আলোচনা করতাম ম্যাট্রিক পাশ করে কে কি করব এই সব। তখন মাঝে মাঝে সমস্ত আলোচনাটাকে এক আশ্চর্য বেদনার জগতে তুলে দিয়ে মা-মণি আবৃত্তি করতেন, 'পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি আপন গন্ধে মম, কস্তুরী মৃগ সম...'

আমরা প্রায়ই তর্ক করতাম, কে সুন্দর দেখতে, কে কুৎসিত, কে ফর্‌সা, কে কালো। আর তখন সমস্ত আলোচনা ভাসিয়ে দিয়ে মা-মণি হয়ত গুণগুণ করে উঠতেন 'কালো সে যতোই কালো হোক. দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।' আর বিস্ময়ের শেষ পেতাম না আমরা।

খুব বেশি পড়াশুনা ছিল না মা-মণির। কিন্তু এমন আশ্চর্য একটা মন ছিল, যা আমাদের বাড়ির, আমাদের চারপাশের বাড়ির কারো মধ্যে আমরা দেখি নি। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আমরা হয়ত কোনো-দিনই পড়ে দেখতাম না, সেই সব কবিতা যেন একটা জীবন্ত মানে নিয়ে মা-মণিকে গড়ে তুলেছিল। সেই সব না শোনা না চেনা কবিতা থেকে আমরা কিছুতেই মা-মণিকে আলাদা করে দেখতে পারতাম না।

অথচ মা-মণির চারপাশের যে জগতটা ছিল. তারসঙ্গে এই কবিতার জগতের এতটুকু কোনো মিল থাকলেও না হয় হত। প্রমথবাবু পড়াতেন ভালো, কিন্তু হাজার হলেও তিনি ছিলেন মফস্বল স্কুলের এক মধ্যম মাষ্টার মাত্র। অভাব-অনটনের শেষ ছিল না। আর ওই বয়সেই মা-মণির ছেলে পিলে হয়ে গিয়েছিল এক পাল। বড়ো ছেলে শ্যামলটা আমাদের চেয়ে বছর চার পাঁচের ছোটো। আর সবচেয়ে ছোটো ছেলে কেউ ছিল না। কেন না, একটা ছেলে কোলে থেকে নামতে না নামতেই দেখা যেত মা-মণি একদিন তাঁদের বারান্দার এক কোণে চট টাঙিয়ে খালিগায়ে কিছু ছেঁড়া ন্যাতাকানি জড়িয়ে শুয়ে আছেন। আর

অন্ধকার অশুচি আঁতুড়ঘরটার দোরগোড়ায় বসে ছানিপড়া চোখে বুড়ি ধাই কাঠকয়লার মালসায় হাওয়া দিয়ে আগুন করছে।

মাত্র এই রকম সময়ে মা-মণি কবিতা বলতেন না কোনো। কেমন অদ্ভুত তৃপ্তির এক কণ্ঠস্বরে আঁতুড়ের অন্ধকার থেকে লালচে একটা শিশুকে অল্প একটু তুলে বলতেন, 'তোদের আর একটি ভাই বাড়ল বীরু! এটা কিন্তু অন্য-গুলোর মতো হবে না, নারে বীরু?'

আমরা অবাক হয়ে বলতাম, 'সত্যি মা-মণি, তোমার এ ছেলেটা ভারি সুন্দর হবে কিন্তু।' কিন্তু তখন যেটা তেমন করে চোখে পড়ে নি, পরে সেইটাই দৃষ্টিকটু লাগতে লাগল আমাদের কাছে। মা-মণির ছেলে হওয়া। মা-মণির কবিতার সঙ্গে এই একের পর এক ছেলে হয়ে যাওয়ার যেন কোনো মিল নেই।

আমরা শুনতাম পাড়ার সকলে ঠাট্টা করত প্রমথবাবুকে : প্রমথবাবু আর কটি হবে আপনার?

প্রমথবাবু গম্ভীর হয়ে যেতেন।

ঠাট্টা হত মা-মণিকে নিয়েও। মুখের ওপর কেউ বলত না, কিন্তু আড়ালে মুখটিপে বলত, গান্ধারী। মাত্র এগারোটি হয়েছে, এখনি কি। একশটি না হওয়া পর্যন্ত। থামে কি না দেখো।

আমরা তখন বড়ো হয়ে উঠেছি। কলেজে পড়ছি।

এমন সব জিনিস তখন আমাদের চোখে পড়ত, যা আগে পড়ে নি।

প্রথম অনুভব করলাম, মা-মণি দেখতে মোটেই সুন্দর নয়, অথচ আগে কি সুন্দরই না মনে হত মা-মণিকে। চোখে পড়ল মা-মণির চেহারার মধ্যে কেমন একটা ধ্বস খাওয়া ভাব আছে। কপালটা বড়ো, চুলগুলো শুধু পাতলা নয়, বিচ্ছিরি একটা টাক পড়েছে পাশ দিয়ে। চোখ দুটো যেন কোনো একটা রুগ্নতার চাপে খোলের মধ্যে ঢোকা। চোখের কোণগুলোতে কিসের একটা কদর্য কারুণ্য। শেমিজের বাইরে কণ্ঠার হাড়টা উঁচু। ঘামাচি ভরা শিথিল চামড়ায় ঢাকা। শরীরের সমস্ত কাঠামোর মধ্যে শুধু মাঝখানটাতেই যা কিছু স্থূলতা। আর সব কিছুই কেমন শীর্ণ. শিথিল, বাঁকা, কুৎসিত। হাসলে চোখ দুটো এখনো ছলছল করে ওঠে, কিন্তু তাতে কেমন করুণাই জাগে বেশি করে।

ছুটিতে মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে এলে এখনো মা-মণি ঠিক তেমনি করেই কবিতার সুরে সম্ভাষণ করতেন : 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে?'

আমরা হাসতাম আর মনে হত, ঠিক এই লাইনটা ঠিক এমনি করেই মা মণি আরো কতোবার যে বলেছেন। সে বলায় আর কোন বিস্ময় ছিল না তখন, ছিল শুধু এক জীর্ণ পুনরাবৃত্তি। শুধুই এক অভ্যাস। সে অভ্যাসকে শুধুই উনিশ শতকের ভাবপ্রবণতা বললে ভুল বলা হবে। উনিশ শতকের ভাব-প্রবণতার একটা নকল অভিনয় মাত্র।

মাঝে মাঝে সম্ভাষণ করতে আসতেন না। প্রমথবাবু থেকে সুরু করে এক-পাল ছেলেমেয়ের জন্যে হাজার রকমের সাংসারিক কাজ সেরে মা-মণি তখন নিজের আঁতুড় নিজেই তৈরি করে নিচ্ছেন। বারান্দার সেই অবধারিত কোণটিতে মন্থর পরিশ্রমে চট টাঙগাচ্ছেন, খড় গংজছেন খংটির চারিপাশে। বড়ো মেয়ে কমলকে হুকুম করছেন ছেঁড়া ন্যাতাকানি কোথায় কি আছে খংজে দেখতে।

আঁতুড়ে যাবার আগে এই রকম সময়টাতে মা-মণির হাড় খোঁচা চেহারার মধ্যেও কেমন একটু মায়া জেগে উঠত। শিথিল চামড়াগুলো টান টান হয়ে উঠত একটু। বুকটা অল্প একটু পুরু। চোখের চাউনি কেমন খানিক ঢলঢল। আর তখন আমরা গেলে কবিতা বলতেন না মা-মণি। কেমন একটা ভরা ভরা টস্ টসে গলায় আস্তে করে বলতেন, 'এসেছিস বীরু? বোস। তোরাতো বড়ো হয়ে গিয়েছিস এখন। বড়ো হবি, উন্নতি করবি। মাঝে মাঝে ভাবি আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে—একটাও যদি মনের মতো হতো! একটাও হল না।'

বলতাম 'থাক, থাক আপনি নিজে এই অবস্থায় অতো খাটবেন না। আমাকে বলুন কি করতে হবে।'

জানতাম, এর কয়েকদিন পরে এলে কি দেখব। দেখব অন্ধকারের কোণ থেকে ন্যাতাকানি জড়ানো মা-মণি একটা লালচে শিশুকে অল্প একটু তুলে বলছেন, তোদের আর একটি বোন বাড়ল বীরু। এটা কিন্তু অন্যগুলোর মতো হবে না, নারে বীরু? আমার মন বলছে...'

মা-মণির মন যাই বলুক, আমি ডাক্তারি পড়ি। মেজাজটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছিল, বিশেষ করে প্রমথবাবুর ওপর। ভেবেছিলাম, মাষ্টারমশাইকে খোলা-খুলি বলব।

কিন্তু বলি-বলি করেও সঙ্কোচে আটকেছিলো। তারপর কোন সময় আবার কলকাতায় ফিরে এসেছি। কলকাতার জীবনের মধ্যে ডুবে গেছি। বলা হয় নি।

বছর দেড়েক পরে আবার গিয়েচি ছুটিতে। মা-মণির সঙ্গে প্রত্যেকবারের মতো একবার আনুষ্ঠানিক দেখা করে আসতে হবে জানি। কিন্তু তখনো পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

হঠাৎ মা-মণির বড়ো ছেলে শ্যামল নিজেই একদিন এসে হাজির হল সন্ধেবেলা।

শ্যামলটা বড়ো হয়ে উঠেছে, প্রায় জোয়ান। কিন্তু সেই কবে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আর পড়াশুনাও হয়নি ওর, কোনো কাজেও লাগতে পারে নি। ভেবেছিলাম, ও বলবে কোলকাতায় কিছু একটা সুবিধা করে দিন না, বীরুদা। বাবা আর টানতে পারছে না।

কিন্তু তার বদলে ও বললে, বীরুদা, আপনাকে এখুনি যেতে হবে আমাদের বাড়িতে। মা কেমন করছে।

ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কেন, কি হল মা-মণির?'

শ্যামল একটু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে অস্ফুট গলায় বললে, 'ছেলে হতে গিয়ে...'

এতবড়ো এক জোয়ান ছেলের কাছে তারই মায়ের প্রসব-প্রসঙ্গ কেমন লাগছে কি জানি ভেবে তাড়াতাড়ি কথা চাপা দিলাম, 'চল্ যাচ্ছি কি মুস্‌কিল।'

জানতাম এই হবে। এই রকম একটা অঘটন না হওয়া পর্যন্ত ওদের এই গ্রাম্য অভ্যাসের সমাপ্তি ঘটবে না। গিয়ে দেখি সারা ঘর থমথমে। বোকার মত মুখ করে প্রমথবাবু বসে আছেন চুপ করে। মা-মণির মেয়ে, শ্যামলের ছোটো বোন গীতুটারও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল বছর দুই তিন আগে। বাপের বাড়ি এসেছে ছেলে কোলে নিয়ে। ছেলে কোলে করেই স্তব্ধ উদ্বিগ্ন ছোটাছুটি যা করার সেই করছে। আর সেই বারান্দার কোণে ঠিক তেমনি করেই ছেঁড়া চট আর খড় বাখারি দিয়ে অশুচি একটা অন্ধকার কোণ রচনা করা ঠিক সেই আগের মতো। শুধু আগের আগের বারের মতো সেখান থেকে মা-মণির ফিসফিসে ডাক শোনা যাচ্ছে না। শোনা যাচ্ছে শুধু থেকে থেকে এক বিকৃত যন্ত্রণার গোঙানি।

ঘৃণায় প্রমথবাবুর সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে এখুনি।

জানতাম, শহরের যে সরকারী হাসপাতালটায় নিয়ে যাবার কথা বলছি, সেখানে শহরের ভদ্রলোকেরা এখনো যেতে সাহস পায় না তবু এই অন্ধকার নরক আর বুড়ি ধাইয়ের চেয়ে সেটা শতগুণে ভালো।

দুই দিন দুই রাত্রি ঘুম ছিল না আমার। এখনো পাশ করে বেরুই নি তবু মফস্বল হাসপাতালের সরকারী ডাক্তারদের কাছে খাতির ছিল আমার। দুদিন পর একটি অপরিপুষ্ট মরা ছেলেকে ন্যাকড়ায় জড়িয়ে প্রমথবাবুর কাছে এনে দিলাম, 'যান সৎকার করে আসুন গে! আরো ছেলে চাই আপনার? আশ্চর্য!' আমার গলার স্বরে ঘৃণার তিক্ততাটুকু একটুও চেপে রাখার চেষ্টা করি নি আমি। প্রমথবাবুর প্রায় বৃদ্ধ নির্বোধ মুখটা খালি বিহ্বলের মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কিছু বললেন না। বললেন রাত্রে, মা-মণি বাঁচবে এইটে জানার পর।

'বীরু, তুই ভেবেছিস এ বুঝি আমার জন্যে? না রে, আমি চাই নি। এতগুলো ছেলে মেয়ে কোন বাপে চায়? এতগুলো পেট! একটাও কি মানুষ হচ্ছে? একটাকেও মানুষ করে যেতে পারব না। কিন্তু... ওযে মানে না। ও তবু চায়!... আমি কি করব যদি...'

আমি চমকে উঠেছিলাম, 'ও মানে মা-মণি? কেন?'

প্রমথবাবু বিড়বিড় করে এলোমেলো কি সব বললেন পরিষ্কার হল না।

শুধু কীরকম একটা অদ্ভুত অস্বস্তি মনের মধ্যে বিঁধে রইল কেবল।

মা-মণির যখন জ্ঞান হল, রূঢ়ভাবেই বললাম, 'এইবার খুব বেঁচে গেছো মা-মণি। কিন্তু আর যদি ছেলে হয়, বাঁচবেনা!'

মা-মণি আমার মুখের দিকে চেয়ে তারপর কি যেন খুঁজলেন। আমি জানতাম কি খুঁজছেন। বললাম নেই, ওটা বাঁচেনি। কিন্তু এর পরের বার তুমিও বাঁচবে না, বুঝেছো? মা-মণি তাকিয়ে রইলেন শুধু।

কিন্তু অসহ্য একটা রূঢ়তা পেয়ে বসেছিল আমাকে। আমি বলেই চললাম, 'তুমি বুড়ি হয়ে গেছো মা-মণি, বুঝেছ? আর কেন? আর হবে না, তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, বুঝেছ?'

রূঢ়ভাবে যেটা বলেছিলাম, সেটা আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেই বলেছিলাম। ছুটি শেষ হয়ে গেলে যাবার আগে মা-মণিকে আরও একটু নরম করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাপারটা। মা-মণি চুপ করে রইলেন। বললাম, 'কি ভাবছো?'

মা-মণি ম্লান হাসলেন, 'তাহলে মরে যাবো বলছিস?'

বললাম, 'হাঁ!'

'তোমার দেহটা আমরা পুরোপুরি পরীক্ষা করে দেখেছি। দেহের একটা নিয়ম আছে তো। সে নিয়মকে মানতে হবে।'

'দেহের সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস বলতে চাস?'

'হাঁ, মা-মণি, হাঁ অন্তত এটা জেনেছি।'

মা-মণি চুপ করে রইলেন একটু।

'আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে। সবকটাকে কি ভালোই না বাসি বীরু। সবকটাকে! যেটা মরে গেলো সেটাকে দেখিনি, তবু সেটাকে ভালবাসি কেমন। বড় থেকে ছোটটা সবাইকে। তবু কি মনে হয় যেন ভারি সুন্দর একটা ছেলে হবে আমার। ছেলে হোক মেয়ে হোক, এমন সুন্দর একটা কিছু হবে, যা আর কারো মতো নয়। কেমন এক ধরনের স্বপ্নের মতো এমন কি একটার জন্যে যে আশা করে থাকি! যেগুলো হয়েছে সেগুলো ভালোবাসি ভীষণ, কিন্তু তবু আশা করি অন্য একটার......'

আমি জোর করে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে এনেছিলাম চিকিৎসা-শাস্ত্রে।

'কিন্তু যা বলেছি মনে থাকে যেন।'

মা-মণি ছল ছল চোখে সুর করে বলেছিলেন, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—'

তিনবছর পরে আবার ফিরেছি দেশে। মা-মণির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখলাম মা-মণি অসুস্থ। ঘর ভর্তি একপাল ছেলে মেয়ে। শ্যামল আমাকে দেখে দৌড়ে এল, 'বীরুদা! দেখুন আপনি যদি পারেন বোঝান। আমরা

পারলাম না। লজ্জা সরম ফেলে রেখে আমি, গীতু, গীতুর ছোটোটা সবাই মিলে রোজ মাকে বোঝাচ্ছি। কিন্তু মা কিছুতেই শুনবে না। ডাক্তার বলেছে, এখনো সময় আছে......। কিন্তু মা......'

'তার মানে!' আমি চমকে উঠলাম, 'আবার?'

'হাঁ'

ত্রস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম মা-মণির শিয়রে। মা-মণি না কোন অচেনা কুৎসিত এক প্রৌঢ়া। ফ্যাকাশে চামড়া, খোঁচা খোঁচা হাড়, শাদার ছিটে-লাগা পাতলা চুল। অন্য অন্য বার তবু একটু অস্থায়ী মায়া নামে চোখে মুখে, একটু ভরাট হয়ে ওঠে বুক। এবার তাও নয়।

শুয়ে শুয়ে মা-মণি গীতুকে দিয়ে যা যা দরকার জোগাড় করে রাখছিলেন—'ওরে গীতু, ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো ফেলিস না মা। রেখে দিস। শ্যামলটা যদি কিছু নতুন চট নিয়ে আসে......'

আমাকে দেখে মা-মণির ফ্যাকাসে মুখখানাতেও কেমন একটা অপার্থিব উচ্ছাস দেখা দিল—'বীরু, তুই এসেছিস। আয় তুই বলেছিলি হবেনা, কিন্তু দ্যাখ...'

আমি জবাব দিলাম না। আমি জানি মা-মণি যে শয্যায় পড়ে আছেন সেটা মৃত্যু শয্যা। কোন ধন্বন্তরির হাত নেই তা রোখে।

'তুই বলেছিলি, সব সত্যি তোরা জেনে ফেলেছিস। হয়ত দেহটার কলকব্জা জানিস, কিন্তু মা-কে তোরা জানবি কি করে?'

আমি চুপ করে রইলাম। হঠাৎ চমকে উঠলাম এক অদ্ভুত স্বপ্নাতুর ফিস্‌ফিসে্ আওয়াজে, 'আমি মরে যাবো বলছিস?... কিন্তু এবারকার ছেলেটা হয়ত অন্যগুলোর মতো হবে না। নারে বীরু? আমার মন বলছে...'

সেই অনেক—অনেক কাল আগে মা-মণি যখন দেখতে সত্যিই সুন্দর ছিল, আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন মা-মণি ঠিক যেমন সুরে একটা লালচে কচি বাচ্চাকে অল্প একটু তুলে ধরে আমাদের বলতেন, অবিকল সেই সুর।

জানিনা কখন নিজের অজ্ঞাতে আমিও বলতে শুরু করেছি. 'সত্যি মা-মণি. এটা কিন্তু সত্যিই ভারি সুন্দর হবে...।'

আমার দু চোখ দিয়ে কখন জল পড়তে শুরু করেছিল আমি জানি না।

দাম্পত্য লীলা

প্রতিভা বসু

দাম্পত্য জীবন প্রায় অসহ্য হয়ে উঠলো শকুন্তলার। অবিশ্রান্ত স্বামীর মনোমত চলা আর কাঁহাতক ভাল লাগে? তা ছাড়া কদিন যাবৎ যে কী হয়েছে, চোখাচোখি হ'লেই কেবল ঝগড়া! কিছুতেই সন্ধি স্থাপন করতে পারছে না দু'জনে। সকালবেলা উঠেই মেজাজ খারাপ হ'য়ে যায়। কেন কী জানি। শকুন্তলা যদি বলে গরম, বারীন নির্ঘাৎ ঠান্ডা ব'লে পাখা বন্ধ ক'রে দেবে;—যদি বলে ভালো, বারীন অমনি ব'লে উঠবে বিচ্ছিরি—কিংবা বারীন যেন বললো, 'চলো বেড়াতে যাই', অমনি শকুন্তলার যত কাজ সব জড়ো হ'য়ে উঠবে সেই সময়ে। এই গরমিলের চোটে দু'জনেই ক্ষতবিক্ষত, কিন্তু উপায় নেই। সকালবেলা কে একবার কার কথায় প্রতিবাদ করেছিলো, সাতদিন পর্যন্ত সেই রাগ পুষে রাখবে তারা মনের মধ্যে। যেহেতু পরশু শকুন্তলা বেড়াতে যায়নি--কাজেই আজ যদি সে পায়ে প'ড়েও অনুরোধ করে, তবু বারীন নিশ্চল পাথরের মত ব'সে-ব'সে কেবল সিগারেটই খাবে—তার পরেই লাগে মারামারি। একদিন এমন হ'ল যে, একটা চামচে ছুঁড়ে শকুন্তলার কপালের একটা কোণ বারীন মারবেলের মতো ফুলিয়ে দিলো। কিন্তু তাতেও বিরাম নেই।

সমস্ত রাত পাশাপাশি বালিশে মাথা রেখে ঘুমিয়েও কোন-কোন দিন একটা বাক্যও বিনিময় করে না তারা। শকুন্তলার মন-খারাপ হ'য়ে থাকে—অমন হাসিখুশি মুখটিও ছলছল করে। আর এদিকে ঝগড়া ক'রেই চমৎকার বেরিয়ে গিয়ে বারীন বন্ধুদের আড্ডায় মন খোলশা ক'রে বাড়ী ফেরে, নয়তো খশখশ ক'রে ছবি আঁকতে বসে। বেচারা শকুন্তলা আর কী করবে—আবছা আবছা সন্ধ্যায় বিষণ্ণ আলোতে মন-খারাপ ক'রে অকারণে গোছানো ঘর আবার গোছায়।

এত ভালবেসে বিয়ে করার এই কি শাস্তি? বিয়ের আগেকার বারীন রায়কে মনে-মনে ভাবতে চেষ্টা করে শকুন্তলা। তার একটা ইঙ্গিতে যে-বারীন মরণপণ করতে পারতো, এই নাকি তার পরিণাম?

অনেক ভেবেচিন্তে সে পিত্রালয়ে যাওয়াই স্থির করলো। আসলে ক্রমাগত একসঙ্গে থাকতে-থাকতেই সম্বন্ধটা বোধহয় এ-রকম দাঁড়িয়ে যায়। আগেকার দিনই ভালো ছিলো, যখন রাত্রে ছোট্ট বধূ শঙ্কিত পায়ে তার স্বামীর ঘরে ঢুকতো আর প্রতীক্ষারত স্বামী সাদরে গ্রহণ করতো তাকে। সত্যি, এত

একসঙ্গে থাকলে আর কোনই মাধুর্য থাকে না স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। পুরো তিন বছর হ'তে চললো তাদের বিয়ে হয়েছে, অথচ এর মধ্যে একদিন একটা বেলাও তারা ছাড়াছাড়ি থাকেনি—বছরে একবার পিত্রালয়ে, একবার শ্বশুরালয়ে যায়—ঠিক বারো দিনের জন্য—বারীন সঙ্গে যায় ও সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মা কতোবার দুঃখু করেছেন এই নিয়ে, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—বারীন কিছুতেই কি রাখবে তাকে? ছেড়ে থাকতে পারে না, না হাতি—কেবল নিজের সুখ-সুবিধের জন্যই না বৌকে এরকম আঁকড়ে রাখা! বিনিপয়সায়—বিনিপয়সায় কেন, লক্ষ টাকা দিলেও কি বৌয়ের মত এমন দাসী মেলে পুরুষের?

সারারাত ভেবে-ভেবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়লো শকুন্তলা। উঠতে একটু বেলা হ'লো—তাড়াতাড়ি উঠে দেখলো ততক্ষণ বারীন মুখ বিকৃত ক'রে দাড়ি কামাতে লেগে গেছে। তাকে আড়চোখে একবার দেখেই ট্যারচা সুরে বললো, 'ওঠবার আর দরকার ছিলো কি?'

অন্যদিন হ'লে ফাঁক যেতে পারতো কথা? আজ কিন্তু শকুন্তলা সে-কথায় মোটেও কান দিল না—আর কী, কতক্ষণ পরে তো চ'লেই যাবে, তার আগে আর ঝগড়া ক'রে দরকার নেই। ক্ষমায় উদার হ'য়ে উঠলো তার মন।

কথাটা ব'লেই বারীন প্রতিবাদ শোনবার আশায় উদগ্রীব হ'য়ে ছিলো, কিন্তু শকুন্তলা যখন কাপড়ের আঁচল কাঁধে তুলে নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলো, তখন মনে-মনে সে একটু অবাকই হ'লো।

খেতে ব'সে ঝক্‌ঝকে গ্লাসটাও, 'ঈশ, কী অসম্ভব ময়লা!' ব'লে যখন ঠেলে দিলো, তখনও শকুন্তলা কিছু না-ব'লে তক্ষুনি সে-গ্লাস সরিয়ে অন্য গ্লাসে জল ভ'রে দিলো। হাতের কাছে সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও বারীন প্যান-প্যান করতে লাগলো, 'যে-বাড়ির কর্ত্রীই ওঠে আটটায়, সে-বাড়িতে কেউ কি কোনো জিনিস পায়?' তখনও শকুন্তলা নতমুখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে সব এগিয়ে দিলো। না, আজ আর কিছুতেই সে ঝগড়া করবে না—শান্তভাবে বিদায় নেবে এ-বাড়ি থেকে।

আপিস থেকে ফিরে কিন্তু বারীন আরো অবাক হ'য়ে গেলো। হোল্ড-অলে পরিপাটি ক'রে বিছানা বাঁধা—তলায় বড়ো সুটকেশটি রাখা। আয়নার কাছে ব'সে চুল বাঁধছে শকুন্তলা, বারীনকে দেখে একটু চকিত হ'লো। তারপর চুল বাঁধা রেখে রান্নাঘরে চ'লে গেলো। চা খেতে-খেতে বারীন বললো, 'বিছানা-বাক্স কার?'

গম্ভীর মুখে শকুন্তলা বললো. 'আমার।'

'তার মানে?'

'আমি পাটনা যাচ্ছি।'

'কে বললো?'

'কে আবার বলবে?'

মা—সব আমি ঠিক করে দিচ্ছি—' এমন বেগে সে ছুটে গেলো যে শকুন্তলা আর 'না' বলবার অবকাশ পেলো না। তাহ'লে সত্যিই কি তাকে যেতে হবে? মাল নিয়ে কুলি নিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সে শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলো জনস্রোতের দিকে। এতদিনের ঝগড়া—এত মন-ভাঙা-ভাঙি—কোথায় যে কোন অতলে তলিয়ে গেলো মন থেকে,—কেবল তাকে যে কতদিনের মধ্যেও আর দেখবে না, তার কণ্ঠস্বর শুনে যে চকিত হবে না—এ-কথাটাই হৃদয়কে বারে-বারে আঘাত করতে লাগলো।

টিকিট হাতে নিয়ে সুরেন এলো। ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে কুলিকে মাল তুলতে ব'লে এগুতে-এগুতে বললো, 'আমি গিয়ে জায়গা ঠিক করি, মা, আপনি পরে আস্তে এগিয়ে আসুন।' শকুন্তলা শিথিল পায়ে অত্যন্ত অবলম্বনহীনের মতো নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করলো। কিন্তু দু-এক পা যেতেই সহসা কাঁধের উপর কার করস্পর্শে চকিত হ'য়ে মুখ ফিরিয়েই সে অবাক হ'য়ে গেলো—তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করলো। আর সঙ্গে-সঙ্গে থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো তার চোখের পাতা।

বারীন বললো, 'সত্যিই যাবে নাকি?'

'হুঁ।'

'না।'

'হুঁ।'

'না।'

'টিকিট কাটা হয়ে গেছে।'

'তা হোক।'

'আমি গেলেই তো তোমার শান্তি—'

'তুমি ছাই জানো!' বারীন শকুন্তলার হাত ধরলো।

ফেরবার পথে একটা ফীটন নিল বারীন, আর সুরেনকে বাস-এর পয়সা দিলো। গঙ্গার পুল পার হ'তে-হ'তে খুব ঘন হয়ে বসলো সে। আস্তে শকুন্তলার নরম হাতটি টেনে নিলো নিজের হাতের মধ্যে, তারপর মৃদুস্বরে ডাকলো. 'কুন্তি! রাগ ক'রে আছ?'

চুপ।

'কথা বলবে না?'

চুপ।

সহসা বারীন দু'হাত দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিলো তাকে, তারপর মুখ নীচু করলো। একটু বাধা দেবার ভঙ্গি করলো শকুন্তলা, তারপর তার দুই চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ ক'রে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে মাখামাখি হয়ে গেলো বারীনের মুখে-চোখে।

অশ্বত্থ

বিমল কর

যতক্ষণ না অফিসে যায় নবনী—তারপর রেণু একা, এ বাড়িতে। রোদ-তেতে-ওঠা বেলা এবং দুপুর—সারাটা দুপুর, বিকেলের ছায়া ঘন হওয়া পর্যন্ত একা-একাই কাটে ওর। নবনী তখন ফেরে।

এই সময়টা, সারা দিনই বলা যায়, এ বাড়ি চুপ—রিভারসাইড রোডের এই নিরিবিলি বাড়ি একরকম নিঝুম। রেণুর চলাফেরা, বিছানা ঝাড়া, ঘরদোর আবার ক'রে ঝাঁট দেওয়া, আর টুকিটাকি কাজ সারায় যতটুকু শব্দ—সে আর কতটুকু—রিভারসাইড রোডের গাছপালা-কাঁপানো হু-হু বাতাসে ডুবে যায়। পাখিদের কিচিরমিচিরও তো আছে! তবু থেকে থেকে আশ্চর্য রকম আরও কিছু শব্দ ফোটে। কুয়া থেকে জল তোলার সময় হুইলের কেমন একটানা সুর, স্নানের সময় রেণুর গা থেকে পায়ের কাছে মেঝেতে জল আছড়ে পড়ার ছর্‌ছর্‌, কিংবা ওর সেমিজ-ব্লাউজ কাচার, নবনীর গেঞ্জি-রুমালে সাবান দিয়ে আছড়ানোর থপথপ-থুপথুপ। আর এরই মাঝে মাঝে আচমকা বা খুব মিহি চিকন গলার মিষ্টি সুর, গানের গুন্‌গুন্‌।

এইসব শব্দ এমন নয়, এত কিছু বেশি নয়, যাতে রিভারসাইড রোডের এই ছোট্ট বাড়ির নিস্তব্ধতা নষ্ট হতে পারে। বাস্তবিক তা হয় না। তবু নবনী অফিস না বেরুনো পর্যন্ত এই ছোট্ট সংসারের কিছু মুখরতা আছে। কোন্‌ সকালে উনুন ধরিয়ে দেয় রেণু, রোদ তখনও উঠনে এসে পড়ে নি, গাছের পাতাতেই আটকে রয়েছে। বাসি কাপড় ধুয়ে-টুয়ে চায়ের পাট সারতে বসে। রান্নাঘর থেকে নবনীকে ডেকে ডেকে হাল ছেড়ে দেয়। তারপর ঘরে গিয়ে ঠেলেঠুলে ঘুম ভাঙায় তার। চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়। ঘরের সব ক'টা জানলা খুলে দিয়ে বলে, 'এত বেলা ক'রে উঠলে আর বাজারে যাবে কখন!' নবনী জানলা দিয়ে বাইরে রোদের দিকে একটু তাকিয়ে জবাব দেয়, 'এমন কি বেলা হয়েছে! তোমার ভাত হতে হতে আমি ফিরে আসব।' রেণু বাধা দেয়, 'থাক! এখন আর সাইক্‌ল্‌ ঘাড়ে ক'রে বাজারে ছুটে যাবার দরকার নেই। যা আছে, হয়ে যাবে।' নবনী কথাটা কানে তোলে না। সে তো আর পাঁচ মাইল দূরে বাজারে যাচ্ছে না—খানিকটা এগিয়ে বি এন আর ব্রিজের চড়াই-এর মুখে যে ছুটকো বাজার বসে দেহাতীদের, সেখান থেকেই আলুটা-মাছটা নিয়ে আসবে!

'আসবে যদি, তবে যাও।' রেণু ভাতের আগে ডালের ব্যবস্থাটা চট ক'রে সেরে এসে ফর্দ দেয় মুখে মুখে, আর টাকা। থলেটা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়।

নবনী সাইক্‌ল্‌ নিয়ে বেরিয়ে যায়।

দেখতে দেখতে নবনী ফিরে আসে। ততক্ষণে বাসি বিছানা তোলা শেষ হয়ে গেছে, এক দফা ঝাঁটপাট পড়ে গেছে ঘরে। বারান্দা-উঠনও বাদ পড়ে নি। কুয়া থেকে জল তুলে রান্নাঘরের কাছাকাছি একটা জায়গায় রেখে দিয়েছে রেণু। বাটনা পর্যন্ত বাটা শেষ। নবনী ফিরতেই আর এক দফা চা, সকালের একটু কিছু খাবার। তারপর রেণু দ্রুত ছন্দে কাজ ক'রে যায়। তরকারি-মাছ কোটাকুটি, ধোয়াধুয়ি। রান্নাঘরে হাতা-খুন্তির শব্দ আর থামে না!

নবনী বেতের মোড়াটা টেনে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে উঠনে বসে। সামনে জলচৌকিতে আয়না, দাড়ি-কামানোর সাবান, ব্রাশ, সেফটি রেজর, ব্লেড। রেণু এরই মধ্যে কখন একটু জল গরম ক'রে নিয়েছে। নবনীর সামনে জলচৌকিতে দাড়ি-কামানোর আংটা-ভাঙা কাপটায় জলটুকু ঢেলে দেয়।

জলটুকু ঠাণ্ডা হতে দিয়ে নবনী বলে, 'আমাদের জ্যোতিষ কি বলছিল, জান?'

রেণু কড়াইএ তেল দিয়ে মাছ ছাড়ছে তখন। বেশ শব্দ উঠছিল। সেই শব্দকে কি ক'রে যেন আয়ত্তে এনে বললে, 'কি?'

'বলছিল, ওদের নিউ কলোনিতে বাচ্চা মেয়েদের একটা স্কুল করেছে—খুব অল্পই মেয়ে, নিজেদের বাড়ির বউ-বোনরা গিয়ে পড়িয়ে আসে। আমায় বলছিল তোমার কথা।' নবনী আঙুল দিয়ে জলের উত্তাপটা পরখ ক'রে ব্রাশ ডুবিয়ে দিল।

'আমি তো বাচ্চা নই, আমায় ভরতি করবে কেন?' রেণু রান্নাঘরের আড়াল থেকে বললে; ঠোঁট টিপে হাসি চেপে।

'পড়তে বলে নি, পড়াতে বলেছে।' নবনী হেসে তার কথাটা আরও প্রাঞ্জল করলে। দাড়িতে সাবান লাগাতে লাগাতে আবার বললে, 'কথাটা কিন্তু মন্দ বলে নি। বলছিল ও, আমিও ভেবে দেখলুম—সত্যি, সারাটা দিনই তোমার একা-একা কাটে। এই আমি বেরিয়ে যাব, তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত তুমি একেবারেই একা! কথা বলার মতনও একটা লোক নেই। সময় কাটে কি ক'রে তোমার, কে জানে! আমি হলে পাগল হয়ে যেতুম।'

মাছের ঝোলটা চড়িয়ে দিয়ে রেণু এইবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নবনীর সামনেই দাঁড়িয়ে। জল-হাতটা মুছতে মুছতে রেণু বললে, 'তোমরা হচ্ছ শহরের হৈ-হট্টগোল ভিড়-টিড়ের লোক। আমি বাপু গেঁয়োটেঁয়ো, ফাঁকা-টাঁকার মানুষ—মধুপুরের মেয়ে। আমার কই একটুও খারাপ লাগে না—পাগলও হচ্ছি না!'

গালের একটা পাশ শেষ ক'রে নবনী স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

দেখল একটুক্ষণ। তারপর হেসে ফেলল। 'ভাল না লাগলেও এখন আর তোমার সে কথা বলার জো নেই।' নবনী আয়নার দিকে তাকিয়ে অন্য গালে ক্ষুর তুলল।

'কেন ?'

'এ বাড়ি নিজেই তুমি পছন্দ করেছ!'

'করেছি তো! এখনও করছি! রেণু এ-পাশ ও-পাশ তাকিয়ে উঠন, বারান্দা, পাঁচিল, ঘরের দেওয়াল—সব যেন একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। হ্যাঁ, তার পছন্দ-করা মনোমতন বাড়ির ঝক্‌ঝকে সুন্দর চেহারাটা। সদ্য চুনকাম-করা বাড়িটার গন্ধও যেন তার নাকে এসে লাগল। পিঠের ওপর খুলে-যাওয়া খোঁপার কাঁটাগুলো খুলতে খুলতে উপর পানে তাকাল রেণু। খোঁপার পাক খুলতে বিনুনিটা পিঠের উপর ছড়িয়ে পড়ল। হাতের মুঠোয় তেল-তেল কাঁটাগুলো নিয়ে রেণু একটু অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল। মাথার উপর অশ্বত্থগাছের একটা পাতা-ভরা ঝাঁকড়া ডালের আগাটা তখন হাওয়ায় দুলছে, পাতাগুলো নড়ছে, রোদের খানিকটা সেই পাতায় পাতায়, খানিকটা রেণুর বুকের উপর শাড়ি ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে। শুধু বাড়ি নয়, এই গাছ, পাঁচিল টপকে অশ্বত্থের একটি শাখা তার প্রশাখা-পল্লব নিয়ে উঠনের মাথার উপর ঢলে পড়েছে, ঢেকে ফেলেছে—এইটুকুও বড় ভাল লেগেছিল রেণুর। প্রথম দিন উঠনে পা দিতেই রেণুর চোখে এ বাড়ির এই আশ্চর্য সম্পদটুকুই আগে চোখে পড়েছিল। আর রেণু অবাক হয়ে গিয়েছিল, মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন পড়ন্ত বিকেল। স্তিমিত, শান্ত, অনুত্তাপ, সোনা-গলার মত সুন্দর রোদ পাতার জাফরিতে উপচে পড়েছে। আশ্চর্য সেই রং, অপূর্ব সেই ছায়া-বোনা-বোনা পাতার চাঁদোয়া! শীর্ণ ডগাটা একটু-একটু নড়ছিল, পাখি আসছিল উড়ে উড়ে—ডানার শব্দে, ডাকে ডাকে সমস্ত গাছটাই যেন হঠাৎ খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। রেণু এত তন্ময় হয়ে পড়েছিল যে, তার মনে হল, রেণুর পায়ের শব্দে গাছটা যেন কতকাল পরে কল্‌কল্‌ ক'রে কথা বলে উঠল। কাছে পেয়ে যেন খুশি দিয়ে আগলে ধরল।

বাড়িতে এসে উঠতে নয়, বাড়ি তখন দেখতে এসেছিল রেণু। এসেই মুগ্ধ হল।

ফেরার পথে নবনী শুধাল, 'কেমন দেখলে গো বাড়ি?'

'সুন্দর—খুব সুন্দর!' রেণু তখনও অভিভূত হয়ে ছিল।

রেণুর পছন্দ বড় খুঁটিনাটি মেনে চলে। নবনী একটু অবাক হয়ে বললে, 'বল কি! তোমার মতন লোকের এক নজরেই এত পছন্দ হয়ে গেল!'

আশেপাশে লোক ছিল না। ধুলোর রাস্তা দিয়ে ওরা হাঁটছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে প্রায়—ফাঁকা মাঠ দিয়ে হাওয়া বয়ে আসছিল, মেঠো গন্ধ, পাকুড়-গাছের ঝোপের ওপর একটা পাখি ডাকছিল। রেণু হঠাৎ বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ,

মশাই! হয়েছে, পছন্দই হয়েছে, খুব পছন্দ! যেমন তোমার হয়েছিল এক নজর দেখেই!' কথাটা বলে ফেলে রেণু হাসল। এবং নবনীর একটা হাত আঁকড়ে ধরে ঘন হয়ে গেল আরও। আর ভাবল, এই তুলনাটা তার হঠাৎ কি ক'রে মনে এল, মুখেও এসে গেল, কে জানে!

রিভারসাইডের এই রাস্তাটা বড় ফাঁকা, আর বাড়িটা একরকম লোকালয়ের বাইরে বলে নবনীর একটু আপত্তি ছিল। অসুবিধের কথাও তুলেছে নবনী। কলের জল নেই বাড়িটায়, কুয়া থেকে জল টানতে হবে—লণ্ঠন অবশ্য এখানেও জ্বালাতে হচ্ছে, সেখানেও জ্বালাতে হবে। ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

রেণু ভাল ক'রে ভেবে দেখেছে। ফাঁকাই তো সে চায়! এই ফাঁকার জন্যে পুরনো বাজারের বাড়িতে সে ছটফট করছে। আর, লোকালয় নেই—এ কথা ব'লো না। সামান্য একটু দূরেই তো পার্সি সাহেবদের বাংলো, তার পাশেই হলদে মতন দোতলা একটা বাড়ি! দু-চার ঘর আরও আছে ছিটিয়ে-ছড়িয়ে। ভয় নেই, তোমার বউকে কেউ চুরি ক'রে নিয়ে যাবে না দিনদুপুরে! এ ছাড়া আর আপত্তি কিসে! কলের জল নেই, না থাকুক; তোমাদের এই শহরের কষ্টা ময়লা জলের চেয়ে কুয়ার জল অনেক ভাল। আমাদের মধুপুরে আমরা কুয়ার জল খেয়েই মানুষ।

নবনী ইচ্ছে ক'রেই যে কথা এড়িয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত সেই কথাটা বললে। 'একদম নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে রেণু, ও বাড়িতে! কথা বলার মতন লোক পাবে না একটা। আমি কোন্ সকালে বেরিয়ে যাব, ফিরতে বিকেল শেষ। অতক্ষণ একা-একা তুমি থাকবে কি ক'রে, কাকে নিয়ে?'

কথাটা বুঝতে পারে রেণু। সহজেই ধরতে পারে। মুখটা হঠাৎ বিষণ্ণ, একটু বা কালো হয়ে আসে। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে রেণু একটুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলে, 'তা কি করব, কাউকে নিয়ে থাকার কপাল যখন হচ্ছে না!' একটু থেমে আবার, 'একা আমি বেশ থাকতে পারব—সে আমার ভাল লাগবে। বরং এই এখানে পাঁচ পড়শীর সব তাতে কান-পাতা, হাসি-তামাশা, মজলিসী আমার ভাল লাগে না, একেবারেই নয়।' রেণু বুক-ভরা নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে গিয়েছিল। তারপর মুখ নিচু ক'রে আঁচল খুঁটতে খুঁটতে আনমনে একটা গিট বেঁধে ফেলল। 'তোমারও সুবিধে হবে, ও বাড়িতে গায়ে-গতরের এই কষ্টটা বাঁচবে। আমি সব ভেবে দেখেছি।'

নবনীর সুবিধে সত্যিই হবে। রিভারসাইড রোডের বাড়ি থেকে সাইক্লে মেঠো পথ দিয়ে গেলে রেললাইন টপকে তাদের স্টিল ওআর্কসে যেতে মিনিট দশেক লাগে। মাত্র মাইলটাক পথ। আর এখন পাঁচ মাইল রাস্তা সাইক্ল্ ঠেঙাতে হচ্ছে যেতে আবার আসতে। গ্রীষ্ম-বর্ষা নেই, নিত্য দশ মাইল সাইক্ল্ ঠেলা। নবনী তার কষ্টের কথা কদাচ বলেছে, কিন্তু রেণু নিয়ত তা অনুভব করেছে।

এর পর আর কোন কথা ছিল না। পুরনো বাজারের সেই এঁদো গলির ঘিন্‌জি আর নর্দমার গন্ধ-ঘিনঘিন বাতাস থেকে নবনী-রেণু—দুটি প্রাণীর ক্ষুদ্র সংসার রিভারসাইড রোডের এই ফাঁকা ছিমছাম ছোট্ট সুন্দর বাড়িতে উঠে এল। যে বাড়ির সামনে দিয়ে লালচে ধুলোর কাঁচা সড়ক এঁকেবেঁকে চলে গেছে দামোদরের দিকে, এ-পাশ ও-পাশ মাঠ, উঁচু-নিচু ক্ষেত, আলের গোলকধাঁধা, ধুলোয়-ঢাকা পলাশঝোপ, বনতুলসী, কাঁটা বেগুন। পাকুড়-বট-অশ্বত্থের কিছু মিশেল এখান-ওখান। বাড়ির সদরের কাছে ছোট কুয়া, সিমেণ্ট দিয়ে ধার-বাঁধানো, হুইল-ঝোলানো।

আর এ বাড়ির বাইরে সেই অশ্বত্থগাছ—যার একটা বিরাট শাখা প্রশাখা-পল্লবে পাতার জাফরি বুনে উঠনের আধখানা ঢেকে ফেলেছে। আলো, আর আকাশ, আর মেঘ এবং পাখি ও তারা সেই জাফরির বুননি আলগা ক'রে ক'রে রেণুকে হাতছানি দিচ্ছে সব সময়।

বড় জোর দিন পনর হল এসেছে রেণু এই নতুন বাড়িতে। কিন্তু পনর মাসের ভালবাসা পড়ে গেছে এর মধ্যেই। রেণু বেশ আছে, খুশী হয়েই আছে। নিঃসঙ্গতা বাস্তবিক সে অনুভব করছে না নতুন ক'রে কিছু! এই নিঝুম নিস্তব্ধতা তার মনের মধ্যে টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে না। বরং রেণু একা-একা, এই চুপ এবং এই শান্ত জায়গায়, নিরিবিলিতে, খানিক বেলায় এবং রোদ্দুরে, ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুরে, ছায়া-নামো-নামো বিকেলে নিজেকে যেন খুলে-মেলে, ছড়িয়ে টুকরো-টুকরো সুখ, সুখের স্বপ্ন দিয়ে ভরিয়ে সুন্দর ক'রে তার মন নিকিয়ে নেয়। তারপর নবনী ফিরে এলে অবসরের সেই শান্ত, আনমনা, স্বপ্নবিভোর রেণুকে রেখে দিয়ে অন্য এক রেণু যেন ঘুম ভেঙে আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। আবার কথা, ডাকাডাকি, হুট্‌হাট্‌, কাপ-প্লেটের ঠুন্‌ঠান্‌, বেলুন-চাকির খটখট, হাতা-খুন্তির শব্দ। মনে হয়, দুপুরের গাঢ় ঘুম থেকে আবার যেন বাড়িটাকে জাগিয়ে দিল রেণু। রেণু এবং নবনী।

ওরা এ বাড়িতে এসেছিল পুজোর পর-পরই। আশ্বিনের শেষ তখন। কুয়াতলার কাছে শিউলি-ঝাড়ে সন্ধ্যেয় আকুল-করা গন্ধ ফুটত তখনও। তারপর কার্তিক পড়ল। রোদ এবং আকাশ আরও কিছুদিন বেশ উজ্জ্বল আর নীল হয়ে ছিল। শরৎ যেন গিয়েও যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত গেল—হেমন্তের ভোরে একটু-একটু হিম পড়ছিল, ঘাসে শিশির ঝরছিল এবং রাত্রে আকাশের নিচে কুয়াশার খুব পাতলা একটা পরদা যেন ঝুলত। একদিন—হ্যাঁ, তেমনি এক হেমন্তের সন্ধ্যায় একদিন—নবনীর খানিকটা দেরি হয়ে গেল বাড়ি ফিরতে। সদরটা খোলাই ছিল—নবনী সাইক্‌ল্‌ নিয়ে উঠনে এসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে গেল। সারাটা বাড়ি নিঝুম হয়ে আছে; কোথাও এক ফোঁটা আলো জ্বলছে না। রেণুর কোনও সাড়াশব্দ নেই। নবনী চমকে উঠেছিল এবং আর একটু

হলেই হয়তো চিৎকার ক'রে ডেকে বসত। কিন্তু রেণুর চেহারাটা চোখে পড়ে গিয়েছিল বলে নবনী বোকা বেরসিকের মতন আর চিৎকার ক'রে উঠল না। বরং দেখল, দেখতে লাগল, বারান্দার ধার ঘেঁসে বসে গালে হাত দিয়ে রেণু তন্ময় হয়ে যা দেখছিল। উঠনের ওপর এলিয়ে-পড়া অশ্বত্থের ডালপালায় নীলের রং মেশানো অপরূপ জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। যেন রুপোর জলে একরাশ ডুবনো পাতা ভাসছে। ভিজে-ভিজে, নরম এবং মসৃণ। সেই পাতার জাফরি গলিয়ে উঠনের সিমেন্টে কেমন এক ছায়া-বোনা চাঁদের আলো লুটিয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, রেণুর গায়ে এবং পায়ে এই ছায়ার নক্‌শা-কাটা আলো সুন্দর হয়ে ছড়িয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, কিসের এক সুন্দর চাদর যেন ঘন ক'রে জড়িয়ে রয়েছে রেণু। আর, সেই ঘন স্পর্শের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—ঘুমিয়ে রয়েছে।

নবনী আস্তে ক'রে রেণুর ঘোর ভাঙিয়ে দিল। চমকে উঠে রেণু চাইল।

'কি ব্যাপার? বাতিটাতি জ্বাল নি আজ—এমন ক'রে বসে আছ?'

কোনও জবাব দিল না রেণু সে কথার। আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল। বাতি জ্বেলেছিল রেণু; বাতিগুলো সবই জ্বলছিল—মিটমিট ক'রে, পলতের আগায় এক-নখ পরিমাণ আলো নিয়ে। পলতে বাড়িয়ে দিতে দিতে রেণু যেন এতক্ষণ পরে নিজেকে ফিরে পেল।

'এত দেরি?' নবনীর হাত থেকে ছাড়া জামা নিতে নিতে রেণু আলনার কাছে এগিয়ে গেল। দু-পাট করা ধুতিটা নিয়ে আবার কাছে এসে দাঁড়াল।

'আর বল কেন! ফাল্‌তু ক'টা কাজ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল—শেষ ক'রে তবে উঠলাম।' রেণুর হাত থেকে কাপড় নিয়ে নবনী একটু থেমে বললে আবার, 'যাই বল, বাড়িতে পা দিয়ে আজ আমার বুক চমকে উঠেছিল।' একটু হাসল ও, 'একেবারে ভোঁ-ভোঁ, অন্ধকার—তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম না; ভাবলাম, সীতাহরণ বুঝি হয়ে গেছে।'

রেণুও ঠোঁটে হাসল। নবনীর দিকে চেয়ে বললে, 'কি করব! তুমি ফিরছ না—বাইরে বসেছিলাম।'

'একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলে। কি দেখছিলে অত একমনে—চাঁদের আলো, না গাছ?'

কথাটার কোনও জবাব দিল না রেণু। ঘর ছেড়ে যেতে যেতে বললে, 'এস তাড়াতাড়ি—চায়ের জল হতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

চা খেতে খেতে নবনী বললে, 'একটা ঝি রাখবে সারাদিনের?'

'ঝি! কেন?'

'তোমার কাজকর্ম ক'রে দেবে। তা ছাড়া, সারাদিন একটা মানুষ থাকবে বাড়িতে! দুটো কথাও তো বলতে পারবে!' নবনী রেণুর দিকে চেয়ে থাকল।

রেণু মাথা নাড়ল। পায়ের ওপর কাপড়টা একটু উঠে গিয়েছিল, হাত দিয়ে

টেনে দিতে দিতে বললে—মুখ নিচু ক'রেই, 'দুজনের একফোঁটা সংসারের জন্যে আবার ঝি কি হবে? আমি তা হলে করব কি?'

নবনী যে এ কথাটা না বোঝে, তা নয়। সবই বোঝে। সংসারের ছোটবড় দশটা কাজ নিয়েই রেণু আছে। তাদের দুটি প্রাণীর সংসার এত ছোট এবং কাজ সত্যি-সত্যি এত কম যে, একটা কাজ একবার সেরে রেণু সময় ফুরোতে পারে না। দরকার নেই, তবু একই কাজে বারেবারে ঘুরে-ফিরে হাত লাগাবে রেণু। কি মানে হয়! তবু একফোঁটা এই ঘর দিনে দশবার ঝেড়ে-মুছে সাজাচ্ছে। বিছানা টেনে টেনে রোদে দিচ্ছে রোজ, বালিশের ফরসা ওয়াড় আবার ক'রে কাচছে, টেবিল গুছচ্ছে, সোডা-সাবান দিয়ে বারেবারে কাপ-প্লেট ধুচ্ছে। এইরকম সব।

রেণুর হাত থেকে এ কাজ কেড়ে নেওয়া যায় না। নবনী তা চায় নি। আসলে, ঝি রাখার কথা তুলেছিল অন্য কারণে; রেণুর সারাদিনের এক সঙ্গী যদি এইভাবে জুটিয়ে দেওয়া যায়, তাই ভেবে।

নবনী খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললে, 'একটা রেডিও কিনবে—ব্যাটারি সেট? বেশ সস্তায় পাওয়া যাবে!'

রেণু মুখ তুলে ভাল ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখল নবনীকে। 'কি ব্যাপার বল তো? মাইনে-টাইনে হঠাৎ বেড়ে গেছে নাকি তোমার?'

নবনী হাসল। 'আরে না, মাইনে আর কোথায় বাড়ল! বলছিলাম এমনি; রেডিও থাকলে বেশ সময় কাটত তোমার—গান-টান শুনতে!'

'আমার সময় কাটানো নিয়ে তুমি দেখছি খুব সমস্যায় পড়েছ!'

নবনী যদিও কিছু বললে না, মাথাও নাড়লে না, তবু তার মুখ দেখেই মনে হচ্ছিল, সত্যিই এটা তার কাছে সমস্যাই এবং যথেষ্টভাবে ব্যাপারটা নিয়ে, বিশেষ ক'রে এ বাড়িতে আসার পর আরও যেন বেশি ক'রে ভাবছে।

ক'দিন পর নবনী হঠাৎ এক মজার প্রস্তাব ক'রে বসল।

'আমি ভাবছি, তোমায় এবার থেকে একটা টাস্ক্ দিয়ে যাব।'

'নাকি! হোম্ টাস্ক্?' হাতের বইটা মুখের কাছ থেকে সরিয়ে স্বামীর দিকে চাইল রেণু। এবং হাসল।

'হ্যাঁ। কাজটা প্রথম-প্রথম ভাল না লাগলেও শেষে দেখবে, নেশা ধরে গেছে।'

নবনী হেসে হেসে বলছিল, 'তা ছাড়া, একবার যদি লাগাতে পার, আর দেখতে হবে না—ক্যাশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা!'

'ক্রস্‌ওআর্ড বুঝি!' রেণু হাসছিল।

'হ্যাঁ। তুমি শুধু সুটেবল ওআর্ডগুলো বেছে রাখবে ডিক্‌শনারি ঘেঁটে—বাকিটা আমি করব।' নবনী উৎসাহিত হয়ে উঠল।

রেণু এবার খিলখিল ক'রে হেসে ফেলল। 'তার চেয়ে একটা দাবার ছক্

কিনে নিয়ে এস। যাবার আগে তোমার শেষ চাল দিয়ে যেও—আমি সারাদিন গজ-নৌকো সামলাতে মত্ত থাকব।' হাসি থামলে বললে, 'যদি বল—আমি বরং রোজ দুপুরে দশ পাতা ক'রে হাতের লেখা লিখতে পারি, গোটা কুড়ি ক'রে যোগ-বিয়োগ-লসাগু-গসাগু।' কথাটা শেষ ক'রে আবার হাসল রেণু।

নবনী চোখ কুঁচকে মিষ্টি ক'রে যেন ধমক দিল বউকে। 'হ্যাত, খালি ইয়ারকি! যা বলব, তাতেই হাসিতামাশা। আমার কি—কচু! আমায় তো আর সারাদিন, দুপুর ভূতের মতন একা-একা বাড়ি আগলে বসে থাকতে হয় না! কষ্ট তোমারই—তুমিই বোঝ!'

রেণু স্বামীর মুখের দিকে আরও খানিক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। বেশ একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল রেণু; বইএর পাতা যদিও একটুক্ষণ চোখের সামনে খুলে বসে থাকল, কিন্তু আর মন বসছিল না। বালিশের পাশে বই রেখে, হাঁটু মুড়ে, কুঁকড়ে, দেওয়াল-মুখো হয়ে শুয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো দেওয়ালের যেখানটায় আসে নি, আসতে পারে নি—সেই অন্ধকারের দিকে আধ-বোজা চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকল।

এখন রেণু ভাবছিল—সারাদিন আর দুপুর, আর বিকেলের ছায়া ঘন না হওয়া পর্যন্ত আমার সময় কি ক'রে কাটে, নবনী তাই ভেবে ভেবে আকুল হয়ে পড়েছে। ওর ধারণা—এই দীর্ঘ সময় আমি একা-একা ভূতের মতন কাটাই এ বাড়িতে, কথা বলতে না পেয়ে আমার বুক শুকিয়ে ওঠে, আমি হাঁসফাঁস করি।

কিন্তু আমার সময় কেমন ক'রে কাটে, নবনী যদি তা জানত, আর বুঝত! সে জানে না; তার বোঝার জিনিসও এ নয়।

তুমি বুঝবে না। রেণু চোখের পাতা পুরো বুজে ফেলল এবং স্বামীকে মনে মনে বলল, আমি মধুপুরের মেয়ে—এখানে কোন্ মধু নিয়ে কেমন ক'রে আছি, কত সুখে!

কিন্তু, রেণু কি ক'রে সেই সকাল নটা সওয়া-নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় একা-একা কাটায়, এই রিভারসাইড রোডের ফাঁকা বাড়িতে! নবনী চলে যাবার পর আর কি থাকে—কোন্ আকর্ষণ?

থাকে। আকর্ষণ থাকে। এবং সুখও আছে।

নবনী চলে গেল। সদরে খোলা কপাটে হাত দিয়ে, কোনদিন বা কুয়ার সামনে দাঁড়িয়ে রেণু দেখল, সাইক্লে চেপে নবনী এঁকেবেঁকে দেখতে দেখতে দূরে চলে গেল; তারপর ধুলো-ভরা পলাশের ঝোপের আড়ালে হারিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গেই যে রেণু সদর বন্ধ ক'রে ঘরে ঢুকল, তা নয়। দাঁড়িয়ে থাকল সামনে চেয়ে। কিংবা একমনে শিউলিগাছের ঝোপটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এখানে দুটো তিতির রোজ নেমে আসে। চড়ুইদের সঙ্গে ভাগাভাগি ক'রে ঘাসে, ছাইএর গাদায় কি যেন খুঁটে খুঁটে খায়; ঝটপট্ করে; উড়ে যায়। আবার ডেকে ডেকে রেণুর পায়ের কাছে টুপ ক'রে নেমে আসে। বাড়ির মধ্যে

হুট্ ক'রে ঢুকে পড়ে রেণু। উঠনে নামানো নবনীর এ'টো থালার ভাতটাত-গুলো এনে ছাই-গাদার কাছে ছড়িয়ে দেয়। আর, দেখতে দেখতে কাক-চড়ুই-শালিক ঝাঁক বে'ধে নেমে আসে।

খানিকটা সময় এইভাবে কাটল। তারপর সদর ভেজিয়ে উঠনে এসে দাঁড়াল রেণু। এতক্ষণে মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালপাতার পাশ কাটিয়ে প্রথম-শীতের সুন্দর রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে আধখানা উঠন জুড়ে। মুখ তুলে তাকায় রেণু। আগায় একটি-দুটি কচি পাতা নিয়ে অশ্বত্থের একটি সরু ডাল পত্‌পত্‌ ক'রে মাথা নাড়ছে। যেন কত খুশী! আর, এক পাশে পাতায়-পাতায় আলুথালু, লম্বা মতন, রোগা একটা ডাল দোল খাচ্ছে। উড়ে-আসা কাকের পায়ের চাপে, গায়ের ভারে। কোথাও বা একটুও কাঁপন নেই; পাতাগুলো সব আঁকা ছবির মত নিথর হয়ে আছে।

এরই মধ্যে টুপ্‌টাপ্‌ ক'টা পাতা উঠনে এসে পড়ল; আঙুলের মত শুকনো ছোট ডাল ফেলে উড়ে গেল কাক। আড়াল থেকে দুষ্টু কোনও পায়রা হয়তো মল ফেলে গেল। আরও কত কি—কুটোকাটা, মাছের কাঁটা, সাপের খোলস!

গাছটার দিকে তাকিয়ে রেণু একটু চোখ কোঁচকাল। মনে মনে বললে, দাঁড়াও, এখনই আমি ঝাঁটা হাতে করছি না! আগে একটু চা খাই, চুল খুলি—তারপর।

তারপর সময় হলে কোমরে আঁচল জড়িয়ে, পিঠে চুল এলিয়ে রেণু উঠনটা একবার ঝাঁট দিয়ে নিল। ঢাকা বারান্দাটুকুও। নারকেলঝাঁটা দিয়ে উঠন ঝাঁট দেয় না রেণু—দিতে পারে না। ফুলঝাঁটার নরম গা দিয়ে সুন্দর ক'রে পাতা, ডাল, কাঁটা, খড়কুটো—সব টেনে নিয়ে উঠনের এক পাশে করে।

এবার রোদে মোড়া টেনে নিয়ে বসল খানিক। কি কি করবে, করতে হবে—ভাবল গাছের দিকে চোখ তুলে। হয়তো প্রথমেই নরুন দিয়ে বসে বসে নখগুলো কাটল হাতের। তারপর পায়ের। গায়ের ব্লাউসটা খুলে ফেলল। রোদের তাতে তাতে গরম লাগছে। চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াল বসে বসেই।

ঘরে ঢুকল এবার রেণু। ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে ঝেড়ে-মুছে বেরুতে খানিকটা সময় লাগে। আবার উঠনে এসে নামল যখন, হাতে হয়তো বালিশের ওয়াড় কিংবা তোয়ালে, নবনীর গেঞ্জি-রুমাল—এমনি কত কি! উঠনের এক পাশে নামিয়ে রাখল সব। জল আনল কুয়া থেকে। কাচতে বসল। গাছের পাতা কেমন ক'রে যেন ঠিক তার মাথার ওপর ছায়া এনে ফেলেছে—ততক্ষণে।

কাচাকুচি শুকোতে দিয়ে আবার একবার উঠন ঝাঁট দিল রেণু। এরই মধ্যে আবার ক'টা পাতা, খড়কুটো ছিটিয়ে পড়েছে। জল দিয়ে উঠনটা ধুয়ে ফেলল। তারপর ওর স্নান। স্নানের আগে জল তোলা, এ'টোকাঁটা বাসনগুলো মেজে নেওয়া, রান্নাঘর ধোয়া।

তরপর স্নান। সদর বন্ধ। পাঁচিলের আড়াল এক পাশে, অন্য পাশে রান্না-

ঘরের গা লাগিয়ে টানা উঁচু দেওয়াল। মাথার ওপর অশ্বত্থপাতার জাফরি। রেণুর ভাল লাগে এই উঠনে নেমে রোদে অনেকখানি সময় নিয়ে স্নান করতে। একটু-একটু ক'রে সাবান ঘসতে, অযথাই জল কুলকুচো ক'রে ফেলতে, এবং হঠাৎ চুপ ক'রে হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে পায়ের কাছে সাবানের ফেনা জমা দেখতে। আঙুল দিয়ে সেই ফেনা কাটে রেণু অন্যমনস্ক হয়ে, বিভোর হয়ে। হঠাৎ একটা কাক হয়তো ডেকে ওঠে, একটি অশ্বত্থের পাতা উড়ে উড়ে এসে ওর খোলা কাঁধের ওপর টুপ ক'রে পড়েই বুক গড়িয়ে কোলের ওপর থেমে যায়। কখনও বা পিঠের পাশে পড়ে—পিঁড়ির ধারে-কাছে। এই পাতা রেণু সহজে ফেলে না, ফেলতে পারে না। তার সাবান-গন্ধ সুন্দর লম্বাগড়ন হাতে আলতো ক'রে তুলে নিয়ে কেমন ক'রে যেন দেখে।

স্নান শেষ হলে রান্নাঘরেই খেতে বসে রেণু। খেতে খেতে গাছটার দিকে তাকায়। তাকায়, আর আনমনা হয়ে যায়।

তারপর শীতের দুপুরে রেণু বারান্দায় মাদুর পেতে ফেলে। লেপটা, তোশকটা রোদ্দুরে দেয়। তারই এক পাশে পানের লালে ঠোঁট রাঙিয়ে একটা বই-টই হাতে নিয়ে একটু গড়াগড়ি দেয় কি দেয় না, হুসহাস ক'রে পাখি তাড়ায়, গাছের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে ধমক দেয়, উঁহু, আর নয় বিছানা নোংরা হবে।

এর পর সারাটা দুপুর সেই নিঝুম, বিভোর, ঘুম-ঘুম, খড়-রং রোদে, এলোমেলো হাওয়ায় রেণু বসে বসে গাছের দিকে চোখ তুলে তুলে উলকাঁটা নিয়ে নবনীর সোয়েটার বোনে। তখন এই গাছ—গাছের পাতাই তার সব। তাদের সঙ্গে যত মনের চুপ-চুপ অস্ফুট কথা, তাদের জন্যে একটু বা ঘাড় কাত ক'রে হাসি, মাঝে মাঝে মিষ্টি মিহি গলায় গানের গুনগুন।

দেখতে দেখতে দুপুর কেটে যায়। অশ্বত্থের পাতা থেকে রোদ সরে যায়। একটু পরেই ছায়া জড়িয়ে আসতে থাকে ডালে-পাতায়। পাখিরা ফিরে আসে। গাছটা যেন ঝট্‌পট্ ক'রে ওঠে, শব্দে ভরে যায়, হাওয়া বয়ে যায়—ঠাণ্ডা হাওয়া; একটা মেঘ এসে খানিক দাঁড়ায় গাছের মাথায়—আকাশে, তারপর আস্তে আস্তে কখন সরে যায়। নবনীর সাইক্‌লের ঘণ্টি বেজে ওঠে বাড়ির কাছে।

সারাদিন, আর দুপুর, আর এই প্রথম-বিকেলের আশ্চর্য এক স্বপ্ন, তন্দ্রা-বিভোর নিস্তব্ধতা থেকে রিভারসাইড রোডের বাড়ি চমকে জেগে ওঠে।

রেণু আবার নবনীর—নবনীকান্ত রায়ের—সুন্দরী স্ত্রী হয়ে ওঠে। সুপটু ঘরনী।

হ্যাঁ, এই আশ্চর্য সুখ এবং এই গাছ-গাছ, নরম কেমন এক অদ্ভুত মন নিয়ে মধুপুরের মেয়ে রেণু এমন ফাঁকা নির্জন বাড়িতে দিব্যি ছিল। বেশ শান্তিতেই। তারপর পাতা-ঝরার দিন এল।

শীত তখন যেন একটু কমেছে—একদিন কোথা থেকে এক দমকা হাওয়া

এল; আর সাত-সকালে রেণু যখন রাতের বাসি কাপড় ছেড়ে উঠন দিয়ে আসছে রান্নাঘরে, একমুঠো রোদ তার গায়—তখন, ঠিক তখনই—কতকগুলো পাতা এসে ঝরে পড়ল। রেণুর গায়ে, পায়ে, উঠনে। রেণু থমকে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকাল। অশ্বত্থের ডালপালা কাঁপছে, হলুদ-হলুদ রোদ-পোড়া ক'টা পাতা দুলছে।

ঝরা পাতা ক'টা উঠনের এক পাশে সরিয়ে দিতে গিয়ে রেণু দেখল, তার কতক শুকনো, কতকের আধখানা গা হলদে, কাঁঠ-রং খড়খড়ে হয়ে গেছে।

সেই শুরু। এর পর প্রথম কয়েক দিন মাঝে মাঝে পাতা ঝরেছে। দেখতে দেখতে কি যে হয়ে গেল, রেণু ভাল ক'রে বুঝতেও হয়তো পারল না, পাতা-ঝরার খেলা শুরু হল।

হ্যাঁ, খেলা। খেলা বইকি! থেকে থেকে হাওয়া দিচ্ছে—দমকা হাওয়া, অশ্বত্থের ঝাঁকড়া ডালের পাতাগুলো গা হেলিয়ে মাথা দুলিয়ে পট্‌পট্‌ কেমন এক শব্দ করছে, তারপর ঝরঝর ক'রে ঝরে পড়ছে সারা উঠন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। রোদ একটু তেতে উঠলেই যেন খেলাটা জমে ওঠে। নবনী তখন অফিস বেরিয়ে গেছে। এই একরাশ পাতা ডাঁই করল রেণু ঝাঁট দিয়ে, তারপর হয়তো লণ্ঠনের চিমনিগুলো পরিষ্কার করছে কিংবা টেবলটা গুছচ্ছে ঘরে গিয়ে—শুনতে পেল, টুপ্‌টাপ ক'রে পাতা ঝরছে, মেঝেতে খস্‌খস্‌ ক'রে ঘসটে যাচ্ছে। রেণুর কানে এই মৃদু শব্দও আজকাল ধরা পড়ে যায়। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে রেণু, ঠিক তাই—আবার উঠন ভরে শুকনো, হলুদ, আধ-হলুদ পাতা ঝরে পড়েছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রেণু কোমরে আঁচল জড়িয়ে আবার পাতা কুড়োতে বসে। পাতাই শুধু নয়—ছোট ছোট ডালপালা, খড়-কুটোও। ডাঁই ক'রে একটা জায়গায় রাখে সব। আন্দাজে বোঝে, এক-আঁচল পাতা আবার ঝরেছে।

খেলাটা নতুন। কিন্তু রেণুর এই খেলাই সবচেয়ে ভাল লেগে গেল—সারা দুপুর ভরে এই ঝরা-পাতা কুড়োনোর খেলা। সব অবসর যেন তারা কেড়ে নিল। ঘুরতে-ফিরতে, বাসন ধুতে, জল তুলতে, স্নান করতে রেণু বারবার উঠনের মধ্যে থমকে দাঁড়ায়, আর অশ্বত্থগাছটার এই শয়তানি দেখে। হ্যাঁ, শয়তানি বইকি! রেণু ভেবে দেখেছে এবং একা-একা বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছে, গাছটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে, দাঁড়াও—দেখছি! তোমার এই ঘর নোংরা করার ফন্দিফিকির আমি এবার বন্ধ করব!

বাস্তবিক, গাছটা যেন রেণুর কাজ বাড়াবার জন্যে দুষ্টুমি ক'রে একটা ফন্দি এ'টেছে।

শুধু তোমায় নিয়ে থাকলেই আমার সব হবে না! রেণু একদিন সত্যি-সত্যি সেই ফাঁকায় চোখ পাকিয়ে গাছটাকে ধমকে উঠেছিল : খালি নোংরামি!

আর একদিন যখন রান্নাঘরে খেতে বসেছে, আর একটা ময়লা পাতা উড়ে

এসে পাতে পড়ল। রেণু একটুক্ষণ অবাক চোখে গাছটার দিকে তাকিয়ে আধ-বোজা গলায় বলে ফেলল, শান্তি ক'রে দুটো ভাত খেতেও দিবি না!

মুখে যাই বলুক, রেণু কিন্তু এই যেন ভালবাসত। সারাটা দিন, দুপুর, বিকেল এই যে একটা দেখ-দেখ ভাব, ঝালাপালা হওয়া, ঝঞ্ঝাট পোহানো—এর কি যেন এক গাঢ় সুখে ও ভরে গিয়েছিল।

একদিন আচমকা বলল নবনীকে, কথায় কথায়, 'কচি ছেলে থাকারও অধম হয়ে উঠেছে বাড়িটা! কি যে জ্বালা জ্বালায় বাপু ওই অশ্বত্থগাছটা, কি বলব! আর পারি না!'

নবনী হেসে জবাব দিল, 'তোমারই তো গাছ! একটু জ্বল।'

কথাটা রেণুর কেমন যেন লেগেছিল কানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত। মনে মনে কয়েকবারই নবনীর গলা দিয়ে কথাটা আবৃত্তি করেছে। আর কি আশ্চর্য, রেণু হঠাৎ ভেবেছে, এ গাছটা যদিও তার নয়, তবু তার যদি নিজের রক্ত-মাংস থেকে একটা সেই গাছ হত—এমনি ক'রেই জ্বালাত!

পাতা-ঝরার খেলাও ফুরল। সব পাতা ঝরে ঝরে সেই অশ্বত্থ একদিন শূন্য হয়ে গেল। তার শাখাপ্রশাখা নিষ্পত্র হয়ে আকাশ, আর রোদ, আর মেঘকে মুক্ত ক'রে দিলে। রেণু সেদিন অশ্বত্থের এই রিক্ততা করুণ চোখ নিয়ে দেখেছে। তার বুক টন্‌টন করছিল, জল আসছিল চোখে। উদাস হয়ে কতক্ষণ সে তাকিয়ে থেকেছে! তারপর হঠাৎ উত্তরের কোণ ঘেঁসে লিকলিকে সরু একটা ডালে দুটি কচি পাতার মাথা দুলনো দেখে নিশ্বাস ফেলেছে। এবার নতুন পাতার পালা! রেণু প্রথমটায় একটু খুশী হলেও যখন ভেবে দেখল, তার অফুরন্ত অবসরে আর কেউ ভাগ বসাতে আসবে না এখন, অনেক—অনেক দিন, তখন আবার বুক ঠেলে ভারি একটা নিশ্বাস উঠে এল। সেদিনটা কিছু আর ভাল লাগে নি রেণুর।

পরের দিন আরও ক'টি নতুন পাতা দেখল গাছে। রেণু বেশিক্ষণ সেদিকে চাইল না। পরের দিন আরও কিছু নতুন পাতা। রেণু এবার চাইল। তারপর এই নতুন পাতার খুশিকে আর সে না মেনে নিয়ে পারল না। মনে মনে যেন সব বোঝাপড়া ক'রে নিয়ে হেসে বললে, আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই—এসেছ, বেশ হয়েছে! নিজের মতন থাক—আমায় জ্বালিও না!

নতুন পাতায় দেখতে দেখতে যখন গাছ ভরেছে, তখন একদিন এক দুপুরে রেণুর মনে কেমন এক খটকা লাগল।

ক'দিন যেতে রেণু আর এক দুপুরে মনে মনে হিসেব করলে। একই হিসেব—সোজা; কিন্তু সারাটা দুপুর সেই হিসেবে কাটল।

আরও ক'টা দিন গেল। রেণু কেমন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তার ভয় হচ্ছিল; রাত্রে ঘুমুতে পারছিল না। স্বপ্ন দেখছিল হিজিবিজি।

তারপর একদিন অশ্বত্থের সেই ঝাঁকড়া-মাথা ডাল যখন নতুন পাতায়

পাতায় ছেয়ে গেছে, বাড়িটা ভরে অদ্ভুত এক বুনো গন্ধ—রেণু বুঝতে পারল, যার আশা ছেড়েই দিয়েছিল ওরা, বিয়ের তিনটি বছর পরে সেই আশা যেন দানা বেঁধে উঠেছে। এখন মনে হচ্ছে, নবনী-রেণুর মধ্যেও একটি নতুন পাতা এইবার ফুটছে।

শেষ পর্যন্ত আর কিছু অবিশ্বাসের থাকল না। কোনও সন্দেহ রেণুর মনে 'কি জানি' হয়ে খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল না। রেণু বুঝল, স্পষ্ট ক'রেই বুঝতে পারল, তার রক্তমাংস এবার এক নতুন প্রাণ গড়ছে।

নবনী বললে, 'চল ডাক্তারের কাছে। প্রথম থেকেই কেয়ার নেওয়া ভাল।'

রেণু একটুও আপত্তি করলে না।

আর কিছুদিন পর নবনী প্রস্তাব করলে, 'একটা ঠিকে ঝি পাওয়া গেছে, সকালে-বিকেলে কাজ ক'রে দিয়ে যাবে। আসতে বলে দি, কেমন? বেশি খাটাখুটি এ সময়ে তোমার উচিত নয়।'

আশ্চর্য, রেণু এবারও আপত্তি করলে না।

ঝি এল। সকালেই আসত—রোদ উঠে গেলে। কাজকর্ম সেরে চলে যেত। আবার আসত দুপুর গড়িয়ে গেলে। ঝট্‌পট কাজ চুকিয়ে চলে যেত। কতটুকু সময়ই বা থাকত; কিন্তু রেণুর কত কাজ যেন কেড়ে নিল! অবসর আরও দীর্ঘ হল। অঢেল, অফুরন্ত সময় হাতে নিয়ে রেণু কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন, শান্ত, স্থির হয়ে গেল।

তারপর বৈশাখের প্রখর তাপ এবং সেই নদীর চর থেকে ঝাঁপিয়ে-আসা ঝড় থেমে গেল। আকাশ কালো হচ্ছিল, মাঝে মাঝে চাতক ডাকছিল, মাটি-ভেজা গন্ধ আসছিল ভেসে ভেসে। বৃষ্টিও নামল। এই ফাঁকা বাড়ির নীরবতাকে আরও নিবিড় ক'রে কত দিন, সারা রাত ভরে শ্রাবণের জল ঝরে গেল। অশ্বত্থের পাতায় কত সব বিচিত্র শব্দ তুলে। এবং শেষে আবার নীল আকাশ জেগে উঠল, রোদ ঝক্‌মক ক'রে উঠল।

রেণু তার একান্ত একাকিত্ব, নবনীশূন্য সময় কি ক'রে কাটিয়েছে? চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে! ভেবে ভেবে, সাতপাঁচ কল্পনায় এবং স্বপ্নে বিভোর থেকে কি!

হ্যাঁ, তাই! রেণু যখন একা, নিঃসঙ্গ, কোন কাজ নেই, আর আলস্যে তার গা-হাত সব—সমস্ত যখন একটুও নড়তে চাইত না, তখন রেণু বারান্দার ছায়ায় কি কাছাকাছি কোথাও বসে পাখির ডাক শুনতে শুনতে এলোমেলো মনে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই ঝাঁকড়া-ডাল অশ্বত্থকেই দেখেছে, তাদের পাতার শব্দ শুনেছে, আর পাতার জাফরিতে মধ্যাহ্নের আলো-ঝিলমিল ছায়া দেখেছে। বর্ষার দিনে এই গাছের ফাঁক দিয়ে মেঘ, এদের পাতায় হাওয়ার পত্‌পত্‌, বৃষ্টির শব্দ। আবার যখন শরৎ ফুটল, আকাশের নীল থেকে সুন্দর রোদ ঝরে পড়তে লাগল, রেণু তখনও এই গাছের পাতা আর ডালপালা দেখে দেখে তার দুপুর

কাটাল। এবং শুধু সকালের গড়িয়ে-আসা রোদ-ভরা দুপুর নয়, রেণুর তিল-তিল ক'রে গড়ে-তোলা স্বপ্নের সুন্দর দুপুর, তার প্রতিটি মুহূর্ত।

এই দুপুরও গড়িয়ে গেল। রেণুকে একটু আগেভাগেই হাসপাতালে রেখে এল নবনী।

এক বিকেলে ফিরল রেণু। হেমন্তের কুয়াশা তখন এখানে এই ফাঁকায় গাঢ় হয়ে নামছে। হাসিখুশী মুখ। তবু একটু যেন ফ্যাকাশে, চুলগুলো রুক্ষ-রুক্ষ। কিন্তু বড় সুন্দর লাগছিল রেণুকে। আর, রেণুর বুকের মধ্যে. হাতের নিবিড় বন্ধনী থেকে একটি শিশুর দুর্বল কান্না উঠে এখানের হাওয়ায় মিশছিল। মাথার ওপর অশ্বত্থের ডালপালা হঠাৎ কেমন এক উদ্ভট হাওয়ায় ঝটপট ক'রে নড়ে উঠল। পাখিরা ডাকল, ডানা ঝাপ্‌টে ঝাপ্‌টে স্তব্ধতা ভেঙে দিল, শিশুর কান্না ডুবে গেল। রেণু একটিবার ওপর পানে চেয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় এসে উঠল।

রিভারসাইড রোডের বাড়িতে কথা এবং কাজের খুটখাট্ শব্দের ফাঁকে ফাঁকে এখন এক দুর্বল কান্না শোনা যায়। কঁকিয়ে কঁকিয়ে একটি শিশু কাঁদে। রেণু হাতের কাজ ফেলে ধড়মড় ক'রে ছুটে যায়।

সব সময়ে অত কাঁদলে কি চলে, খোকন! রেণু ছেলেকে আদর করে, দুধ দিতে দিতে গালে-মুখে কতকগুলো চুমু খেয়ে বেশ জোরে জোরে বলে, এবার তুমি বারান্দায় শোবে। রোদে। তোমায় অলিভ অয়েল মাখাব। চুপটি ক'রে শুয়ে থাকবে। তেল-গায়ে রোদ খেলে কেমন সুন্দর শরীর হবে তোমার—নধর-নধর, ননী-ননী!

বারান্দার চেয়ে উঠনটায় রোদ আসে আগে। উঠোনে শোয়াতে পারলেই ভাল হত—একটু বেশিক্ষণ রোদ পেত। কিন্তু রেণু খুবই বিরক্ত হয়; উঠনে শোয়ানোর জো আছে নাকি! কোথা থেকে একটা কাঠির মত ডাল হয়তো ছেলেটার কচি গায়ে এসে পড়বে, নাকের ওপর পাতা উড়ে এসে আঁচড় কেটে যাবে, পাখিতে হেগে দিয়ে যাবে। যত রাজ্যের ময়লা সব! একদিন ছেলেকে শুইয়ে দেখেছে রেণু। দশটা মিনিটও বেচারীকে রাখা যায় নি! ভীষণ বিরক্ত হয়েছিল রেণু। তারপর থেকেই বারান্দাতেই শোয়ায়। তাতেও রক্ষে নেই। কখন যে কি উড়ে আসে—পাখি-টাখি. পাতা-টাতা! ছেলেকে শুইয়ে রেণু নিজে বসে বসে আগলায়। আর ভীষণ বিরক্ত হয় এই গাছটার ওপর। ওর জন্যেই যত পাখি-টাখি, নোংরা-টোংরা।

কিন্তু তবু একদিন একটা হাড় এনে ফেললে কাকে—খোকনের গায়ের পাশেই। আর একদিন একটা বিঘত-খানেকের মরা সাপ একেবারে খোকনের গায়ের ওপর। রেণু আঁতকে উঠল। হাউমাউ ক'রে ডুকরে উঠল।

'শুনছ, এ বাড়িতে থাকা চলবে না!' রেণু সেই দিনই নবনীকে বললে, 'কোনদিন একটা অঘটন ঘটে যাবে!'

নবনী কানেই তুলল না কথাটা।

ক'দিন বাদেই আবার এক কাণ্ড। হাত-পরিমাণ একটা ডাল ভেঙে পড়ল একেবারে রেণুর মাথায়। রেণু ছেলেটাকে কোলে ক'রে উঠন বেয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছিল। কপালে লেগেছিল তার। তা লাগুক—কিন্তু রেণু খপ্ ক'রে রান্না-ঘরে ঢুকে ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে ভাবল, ডালটা যদি তার মাথায় না পড়ে খোকনের মাথায় পড়ত! তুলতুলে মাথা, রক্তের ডেলা—এক্ষুনি রক্তারক্তি হত! কিছুতেই বাঁচত না ছেলেটা!

গাছটার দিকে বিষাক্ত ঘৃণার চোখে চেয়ে রেণু দাঁত চেপে খানিকটা দাঁড়িয়ে থাকল।

নবনীকে এবার সোজাসুজি বললে রেণু, 'এ বাড়িতে আর একটা হপ্তাও নয়! আজই শেষ হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা! বাব্বা, কি সর্বনেশে গাছ!'

'একটু সাবধানে থাকলেই পার।' নবনী জবাব দিলে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে।

'আবার কি সাবধান হবে! এর চেয়ে কত সাবধান হতে মানুষে পারে!' রেণু রেগে উঠল, 'সারাটা দিন ছেলেটাকে ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডায় অন্ধকারে পুরে রাখব নাকি! ওর আলো-হাওয়ার দরকার নেই? কি রকম শীতটা পড়েছে, দেখছ না!'

'তা, বেশ তো! রোদই খাওয়াও ছেলেকে—একটা আড়াল-টাড়াল দিয়ে নিয়ো!' নবনীর সহজ জবাব।

'আড়ালে কি হবে? আড়ালটা মানছে কে?' রেণু উত্তেজিত হয়ে পড়ে, 'ওই গাছের কুটো-পাতা, নোংরা, পাখির গু-মুত্—কত রকমের নোংরা, জার্ম্স্—। ওই তো কচি ছেলে—ওর কি ইমিউনিটি আছে নাকি কিছু! ঝপ্ ক'রে একটা রোগ হবে, সামলাতে পারবে না!'

নবনী স্ত্রীর আশংকার বাড়াবাড়ি দেখে না হেসে পারে না। বলে, 'তুমি যে সেই রূপকথার ছোটরানীর মতন শুরু করলে। ছেলে পেটে আসতে-না-আসতেই ভয়ে জড়সড়। রাজপ্রাসাদের পদ্মপুকুর ভরাট ক'রে দাও, ছেলে যদি বেড়াতে গিয়ে ডুবে যায়; সব কাঁটা গাছ তুলে ফেল, যদি পায়ে কাঁটা ফুটে যায় তার।' একটু থামে নবনী। হাসির দমকটা থামিয়ে আবার বলে, 'ওসব বাজে ভয় ক'রো না তো! তা ছাড়া, ওই গাছটাই না তোমার খুব আদরের ছিল!'

'ছাই ছিল!' রেণু কোল থেকে ছেলেকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, 'যেদিন থেকে ছেলে কোলে এসেছে, ওটা যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে! ওই শত্রু একদিন আমার সব নেবে! আমি বলছি! তখন দেখব, তোমার কত হাসি থাকে!'

নবনী আর কিছু বললে না। রেণু সত্যিই ভীষণ চটে গেছে! স্ত্রীর আশংকা-কালো মুখের দিকে চেয়ে নবনী হয়তো অবাক হয়ে কিছু ভাবছিল।

অশ্বত্থগাছটা সত্যিই শত্রুতা করছে রেণুর সঙ্গে। আবার পাতা-ঝরার দিন এল। আর, উঠন-বারান্দা থইথই ক'রে তার পাতা ঝরতে লাগল দফায় দফায়। খোকনের জন্যে একটু জায়গাও সে দেবে না এই উঠন কিংবা বারান্দায়; এই রোদ, এবং আলো, ও হাওয়ার কোনও কিছুই। রেণুকে পর্যন্ত না। বারবার ব্যতিব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, ভীত ক'রে রাখবে।

রেণু কেমন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত ভয়। তার মনে শান্তি ছিল না, স্বস্তি ছিল না। শেষ পর্যন্ত বলতে হবে, ভগবান খুবই সদয়—তাই একদিন আচমকা পার্সি সাহেবদের সেই বাংলোর পাশের দু-পাঁচখানা ছিটনো-ছড়ানো বাড়ির একটা থেকে আরতি আর আরতির ননদ এ বাড়িতে বেড়াতে এসে হাজির।

দুজনেই অবাক—রেণু এবং আরতি। রেণু কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল, মধুপুরের আর এক মেয়ে আরতি এখানে হাজির রয়েছে! আরতিও ভাবতে পারে নি। দেখাসাক্ষাৎ হতে আহ্লাদে-খুশিতে দুজন গলে গেল। তারপর বাড়ির কথা উঠল। আরতি বলছিল, 'তোর বাড়িটা খুব সুন্দর রে! ফাঁকা—কত জায়গা! দুখানা বড় ঘর, ঢাকা বারান্দা, উঠন, ভাঁড়ারও আছে। সুন্দর গাছও। আমাদেরটা বড্ড ছোট! আর, গাছপালার একবিন্দু ছায়া নেই ধারে-কাছে। গরমে যা কষ্ট হবে!'

'নিবি এই বাড়িটা?' রেণু আচমকা শুধাল।

'ঠাট্টা করছিস?' আরতি হাসছিল।

'না, না—ঠাট্টা নয়! সত্যি বলছি! এ বাড়ি আমরা ছেড়ে দেব।' রেণু গম্ভীর হয়ে বললে।

'কোথায় যাবি?'

'যদি তোরা নিস এ বাড়ি, তোদেরটায় যাব। করবি পাল্টাপাল্টি?'

আরতি তবু বিশ্বাস করতে পারছিল না। এমন সুন্দর বাড়ি, কত জায়গা, গাছের ছায়া—

'তা, এ বাড়ি ছাড়ছিস কেন?' আরতি শুধাল।

রেণু টপ্ ক'রে জবাব দিতে পারল না। একটু ভাবল। বললে, 'ওর অসুবিধে হয়। ভাড়াটাও একটু বেশি ভাই আমাদের পক্ষে। চল্লিশ টাকা। দিতে বেশ কষ্টই হয়!'

আরতি রাজি হয়ে গেল। তার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না।

নবনী কথাটা শুনে বোকার মতন শুধু বললে, 'সত্যিই তুমি বাড়ি পাল্টা-পাল্টিতে রাজি হয়ে গেলে?'

রেণু কথা না বলে মাথা নাড়ল। আর খানিক পরে চাপা গলায় যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল, 'আমার ছেলে আগে। তার কথা, ভালমন্দ ভেবে তারপর অন্য সব।'

পরের হপ্তাতেই বাড়ি-বদল শেষ হল। নতুন বাড়িতে গিয়ে রেণু শান্তি পেল। তার উদ্বিগ্নতা ধুয়ে গেল। হাসি ফুটল মুখে। এখানে অশ্বত্থ নেই, পাতা-ঝরা নেই; খড়কুটো, ময়লা সাপের খোলসে উঠন নোংরা নেই। রেণু নিশ্চিন্ত। ছেলেকে প্রাণভরে অলিভ অয়েল মাখাচ্ছে রেণু, রোদ আর হাওয়া খাওয়াচ্ছে—আর সারাদিন, আর দুপুর, আর বিকেল সেই একফোঁটা অবোধ শিশুকে নিয়ে, তার কাজ নিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, মাসখানেক বড় জোর—তারপর এক সকালে নবনী যখন দাড়ি কামাচ্ছে, রেণুর কোলে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে, আর রান্না করতে করতে গুন্‌গুন্‌ ক'রে ছড়া গাইছে ও, ছেলেটা হঠাৎ চোখ চেয়ে কে'দে উঠে ক'বার হিক্কা তুলল, চোখের পাতা বুজল। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হল একটু, তারপর থামল। ওর শব্দ থামল গলার, নিশ্বাস থেমে গেল, একটু যেন কেমন নীলচে হয়ে গেল মুখটা।

বিশ্বাস করতে খানিকটা সময় লাগল রেণুর। কিন্তু বিশ্বাস না ক'রে উপায় ছিল না। কেননা, সেদিন আর দুপুর-বিকেল-রাত একটি দুর্বল অসহায় গলার কান্না এ বাড়িতে আর একবারও শোনা গেল না।

কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে, কোন কারণ না দেখিয়ে ছেলেটা যে কি ক'রে চলে গেল, হঠাৎ—রেণু তারপর থেকে শুধু তাই ভেবেছে, ভাবছে।

এ বাড়ি আরও চুপ হয়ে গেল। নবনীও যেন কথা বলতে, হাসি-তামাশা করতে ভুলে গেল। আরও যেন সকাল-সকাল সে অফিস চলে যায়, ফিরতে আরও দেরি করে। রেণু একা। ঝিটা আসে; কাজকর্ম সেরে দিয়ে চলে যায়। রেণু কথা বলে না—যেখানে বসে, বসেই থাকে; শুয়ে থাকল তো থাকলই; কোথাও থমকে দাঁড়াল তো পাথর হয়ে গেল যেন।

এক-একটা দিন যে কি দীর্ঘ এবং দুঃসহ, আর কি ভীষণ কষ্ট এই সময়ের ঢিলেঢালা চলনে, রেণু আস্তে আস্তে তা বুঝতে পারছিল। তার সময় ফুরোয় না; তার বুকের ওপর চাপ-হয়ে-থাকা ভারটা একটুও সরে না। বরং নবনী চলে গেলে, একা হয়েছে কি, রেণুর বুকের হাড়গুলোয় যেন কেউ নরুন দিয়ে কুরতে থাকে, বুকটা অসহ্য ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে. রেণু নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুজে। সারা দুপুর—সারা দুপুর। আর, থেকে থেকে ফুঁপিয়ে ওঠে। যদিও সে ফোঁপানোয় গলা-ভিজে-যাওয়া কান্না নেই. শুধু দলা-পাকানো পাক-খাওয়া বাতাসের থরথর ঝাঁকুনি আছে।

কেন এমন হল—এই কথা ভাবতে ভাবতে রেণু সব সময়েই সেই ডালপালা-ছড়ানো ঝাঁকড়া-মাথা থম্‌থমে অশ্বত্থগাছটাকে চোখের সামনে না এনে পারে না। চোখ বুজলেই গাছটা শকুনির পাখার মতন বিশ্রী এক ভয় নিয়ে যেন

ওর মনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রেণু বুঝতে পারে, ওই—ওই হিংসুক নিষ্ঠুর গাছটা খোকনকে সহ্য করতে পারে নি। তার বিষনিশ্বাস হাওয়া এখানে ছড়িয়ে দিয়েছে। তারপর যেন রেণুকে ঠিকমতন জব্দ করতে, উচিত শিক্ষা দিতে ছোঁ মেরে খোকনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেছে ভরা কোল থেকে। কি হিংস্র আর হৃদয়হীন ওই তরু, কি নিষ্ঠুর!

রেণু যতক্ষণ ভাবে, ভাবতে পারে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সেইসব ঘটনা মনে করে, যেসব ঘটনায় ওই অশ্বত্থের আড়াআড়ি ভাবটা ফুটে উঠেছে—হ্যাঁ, খোকনের সঙ্গে আড়াআড়ির, রেষারেষির। বলতে কি, খোকনকে নিয়ে সে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই ওই গাছ শত্রুতা করতে শুরু করেছিল। খোকনের সঙ্গে। গাছটা যেন হিংসে আর বিশ্বেষে জ্বলত। জ্বলছিল। ওই বোবা কিন্তু ভয়ংকর জীবনটা—রেণুর মনে হত—সব সময়ে চাইছে, রেণু আগের মতন তাকে নিয়ে মত্ত থাকুক। হ্যাঁ, রেণু তা বুঝতে পারত। তার হুঙ্কারের ভাষা তো রেণুর না-জানা নয়—তার মট্‌মট্‌ আছাড়িপিছাড়ি, গোঁ-গোঁ গর্জন! এই অন্যায্য, অন্যায় আব্দার রেণু কি ক'রে সহ্য করতে পারে! তুমি কে, কি আমার! শুকনো কর্কশ গা, আর বাউণ্ডুলে পাতার ঝুপড়ি নিয়ে বসে আছ! আমার জীবনের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কিসের! আমার মাটি ধুলোকাদার নয়, আমার শিরা তোমার রুক্ষ কুৎসিত শিকড় নয় এবং আমার রক্ত তোমার গায়ের আঠা-আঠা জল নয়!

রেণুর এই সরাসরি উপেক্ষা-অবহেলা গাছটার যেন সহ্য হচ্ছিল না। সে দিন-দিন ভয়ংকর হয়ে উঠছিল, রেণু তা বুঝতে পারছিল; আর হ্যাঁ, ভয়—ভীষণ ভয় এবং ভাবনায় পড়ে গিয়েছিল। খোকনকে ওই রাক্ষুসে গাছটা কিছুতেই সহ্য করবে না—রেণু এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিল।

ও বাড়ি তাই ছেড়ে এল। কিন্তু সে ছাড়লেও ওই রাক্ষসটা ছাড়ল না। শোধ নিল। প্রতিশোধই বলা যায়।

মনে মনে গাছটাকে কুটিকুটি ক'রেও রেণুর আক্রোশ মেটে না। আবেগ চাপতে গলার শিরা নীল হয়ে গেলেও এইসব আবেগ রেণু রোধ করতে পারে না। তার সাধ্যে কুলোয় না।

এমনি ক'রেই কাটছিল দিন। অবয়বেই যেন বেঁচে আছে রেণু; তার মন মরে গেছে, তার জীবন থেমে গেছে। কোন বোধ নেই—অন্তত সুখের বা সান্ত্বনার।

হ্যাঁ, তারপর সেদিন আবার এক দুপুরে যখন আকাশ মেঘলা, মাঠ-ঘাট খাঁখাঁ করছিল, বেশ একটা তাপ ফুটছিল—রেণু যেন কখন সদর খুলে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে এই থম্‌থমে রিক্ততা দেখছিল চারপাশের। কতক্ষণ যে, রেণু জানে না। হঠাৎ তার মনে হল, কোথা থেকে যেন একটু অন্যরকম হাওয়া এল। পরক্ষণেই এক ঘূর্ণি উড়ে এল, একটা পাক-খাওয়া বাতাসের ঢেউ।

ধুলো উড়াছিল। আর, হঠাৎ সেই ধুলোর সঙ্গে মিশে একটা শুকনো অশ্বত্থ-পাতা এসে পড়ল রেণুর বুকে, একেবারে বুকের মাঝটিতে—শাড়ির ভাঁজে আটকে গিয়ে থেমে থাকল। রেণু হাত দিয়ে ফেলতে গিয়ে চমকে উঠল। অশ্বত্থের পাতা, শুকনো পাতা। সারা গা ঘিনঘিন ক'রে উঠল রেণুর। নোংরা পাতাটা ঝেড়ে ফিলে দিতে গিয়েও হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল তার। পাতাটা মুঠোয় ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

এখান থেকে আগের বাড়ির সেই অশ্বত্থগাছটা দেখা যায়—খুবই অস্পষ্ট-ভাবে। একখণ্ড মেঘের মতন। কিন্তু আশ্চর্য, রেণু আজ এখানে দাঁড়িয়ে অত দূরের অমন অস্পষ্ট অশ্বত্থকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

সব যেন তাকে টানছিল—এই মেঘলা দুপুর, এই ঘূর্ণি, এই খাঁখাঁ মাঠঘাট এবং ওই দূর অশ্বত্থের শাখা-প্রশাখা-পল্লব। তাকিয়ে থাকতে থাকতে রেণু সব ভুলে গেল। শুধু গাছ—শুধু ওই অশ্বত্থই হাওয়ায়-হাওয়ায় অদ্ভুত এক চুপ শিস্-শিস্ শব্দে তাকে ডাকছিল। রেণুর চেতনা ছিল না; রেণুর পা, রেণুর মন, চোখ—সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেউ যেন যাদু ক'রে অসাড় ক'রে দিয়েছে।

অদ্ভুত এক ঘোরে, নিশিতে-পাওয়া মানুষের মতন ঘুমের আচ্ছন্নতায় রেণু পা-পা ক'রে টলে টলে হেঁটে চলল। তারপর একসময়ে সেই অশ্বত্থের সামনে। গাছটার তলায়। মাটিতে, পাথরে, ঢিবিতে, শিকড়ে একটা অদ্ভুত অন্ধকার স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে এখানে। মাথার ওপর অসংখ্য শাখা-প্রশাখা স্তব্ধ, শত সহস্র পল্লব নিস্তব্ধ।

রেণুর চোখে অন্য এক অপরিচিত জগৎ অস্পষ্টভাবে কেউ মেলে দিচ্ছিল। অশ্বত্থের সেই ভারি কালো গুঁড়ির ফাটা, ঠুকরোনো কঠিন দেহ কেমন এক যাদুতে খুলে গিয়ে খুব নরম এক হৃদ্‌পিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল। আর মৃত্তিকার অন্ধকার থেকে এক ঘ্রাণ উঠছিল। অতি নিস্তব্ধ, নির্বাক, সংগোপন এক প্রাণ যেন গুমরে উঠছে। গুমরে গুমরে।

রেণু জানে না, তার খেয়ালই নেই, কখন সে ধীরে ধীরে তরুতলে বসে পড়েছে, হাত দিয়ে গা ছুঁয়েছে—সেই তরুর, ঝুরি ধরে থেকেছে মুঠো ক'রে। তারপর কখন অচেতনে বুক উপুড় ক'রে আঁকড়ে ধরেছে সেই বিশাল তরুর একটু।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে কার যেন ঠেলায় চমকে উঠল রেণু। চমকে উঠল, উঠে বসল, চাইল। চিনতে পারল না। ঘোর কাটছিল না চোখের।

যখন ঘোর কাটল, তখন রেণু উঠে দাঁড়াল। চিনতে পারল। সামনে অবাক, ভীত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরতি। আর সে অশ্বত্থের তলায়।

রেণুর দিকে তাকিয়ে এবার আরতি ভীষণ অবাক গলায় বললে, 'কি রে, তুই হঠাৎ এখানে—গাছতলায় উপুড় হয়ে পড়ে? কি হয়েছে তোর?' আরতির

চোখ হঠাৎ রেণুর বুকে আটকে গেল। আরও অবাক হয়ে বললে আরতি,
'ইস্, সারা বুকখানা ভিজে গেছে যে! এত ঘেমেছিস?'

ঘাম? রেণু চমকে উঠে বুকের দিকে চাইল। ভিজেই গেছে—সারাটা বুক, ব্লাউস। তবে ঘামে নয়। তাড়াতাড়ি গায়ের আঁচলটা বুকে টেনে নিয়ে রেণু কিছু না বলে সোজা বাড়ির পথে ফিরে চলল।

আরতি ডাকছিল। রেণু শুনছিল না। হন্‌হন্ ক'রে হেঁটে যাচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল, এতদিন বুকের যে টন্‌টন ব্যথা তার অসহ্য—অসহ্য ছিল, আজ এখন সে ব্যথা যেন অনেক কমেছে।

সত্যি, অনেক কমেছে!

দুধ খাইয়ে, আর এক অবোধ শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে রেণু খুব নিশ্চিন্ত মনে এবার ফিরেই যাচ্ছিল। তার সংসারের কাজেই যেন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

অরুণা আজ সকাল সকাল ছুটি নিয়ে হোস্টেলে ফিরল। কিন্তু এ রকম ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি তার চাকরী-জীবনের ইতিহাসে। কারণ যে ক'ঘণ্টা স্কুলে থাকা যায়, সেইটুকুই লাভ,—মেয়েদের পড়াতে তার খুব ভালো লাগে,—তাদের পড়া বোঝানো আর পড়া ধরার মধ্যে একটা গভীর স্নেহস্পর্শ, গোপনে তৃষ্ণার্ত মনকে রসসিঞ্চিত করে তোলে। সব চেয়ে ওর ভালো লাগে নীচের ক্লাসে ছোট ছোট মেয়েদের ঘরে যখন পড়াতে যেতে হয় তখন। পড়া ধরলে কেউ বা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে এক নিঃশ্বাসে তোতা পাখীর মত গড়্ গড়্ করে মুখস্থ বলে যায়, আবার কোনো কোনো মেয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অশ্রু ছল-ছল চোখে দাঁড়িয়ে থাকে, পারে না কথা কইতে, মুখস্থ পড়া ভুলে গিয়েছে,—বোকার মত এমন ভাবে তাকায় সরল চাহনী মেলে যে মায়া হয়, হাসিও পায়। অরুণার মনে এই ছাত্রীরাই এখন বাসা বেঁধেছে। এদের এক একজনের দিকে তাকিয়ে ওর এক একটা কথা মনে হয়। কিন্তু আজ তবু ওকে ছুটি নিয়ে ঘরে ফিরতে হ'ল। এমন কোনো দরকার আছে যে তা নয়, শরীরও খারাপ করছে না—তবু, সে চলে আসে।

একখানা চিঠি এসেছে ওর কাছে আজ। এই চিঠিই ওকে ভাবিয়ে তুলেছে। যতবার যে ক্লাসে পড়াতে গিয়েছে সেখানেই ওকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে এই চিঠিখানা। এক একটি মেয়েকে দেখে ওর মনে হয়েছে, এই রকম ছিমছাম মেয়ে দেখতে মন্দ নয়, হ'লই বা রং একটু ময়লা, কিন্তু কি সুন্দর মুখশ্রী, টানা টানা ভাসা চোখে স্বপ্নময় দৃষ্টি ওর—ছেলেমানুষকে দেখলেই একটু আদর করতে ইচ্ছে করবে—এমন না হ'লে সন্তান কী? ফুটফুটে টিকোলো নাক যার তাকে দেখলে অরুণার নিজের সন্তান ভাবতে ইচ্ছা হয় না। একটু শ্যামল, কচিকচি মেয়েই বেশ।—কিন্তু এসব কথা ভাববার অর্থ কী? অরুণা নিজের দিকেই অবাক হয়ে তাকায়। এ তার হ'ল কী। শেষকালে শান্তির জীবন ছেড়ে কী এক অবাস্তব মায়ার দিকে কেমন যেন মনটা টান্‌ছে? স্বাধীন মুক্ত জীবনের উদারতায় ওর মন কি শেষে হাঁপিয়ে উঠল না কি?

সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই সে স্কুল থেকে চলে আসে,—ভালো করে ভেবে দেখা দরকার, নিভৃতে—।

পথে আসতে আসতে একটা কথা অনবরত তাকে বিচলিত করে। পারুলের

চেহারাটা তার চোখের সামনে নেচে বেড়ায়—'ক্লাশ প্লি'র বাচ্চা মেয়ে পারুল, মাথায় টুকটুকে লাল ফিতে কায়দা করে বাঁধা, নিশ্চয় তার মা বেঁধে দেন। চোখের কোণে কাজলের কালো মাধুর্য, ফ্রকটার কি সুন্দর ডিজাইন—পারুলের পা থেকে মাথা পর্যন্ত মায়ের স্নেহ জড়ানো, বইগুলো মলাট দেওয়া, সেলাই করা। পড়াশুনা মোটে পারে না মেয়েটি। সবটা জড়িয়ে তাকে অরুণার যে কী ভালো লাগে; পারুলের মত মেয়ে এমন কিছু অসাধারণ নয় তবু পারুলকেই অরুণার ভালো লাগে। পারুলকে তার ছোটদা স্কুলে যাবার পথে পেঁাছে দিয়ে যায় আবার ফেরবার পথে দুই ভাই বোন এক সঙ্গে বাড়ী ফেরে। পারুলের ছোটদার নামও অরুণা জানে—অজিত, সে পড়ে হাই স্কুলের ক্লাশ সিক্স-এ। ওদের দুই ভাই-বোনে এত ভালোবাসা—একমাত্র ওদের পক্ষেই বুঝি সম্ভব।—না, অরুণা আর পারে না,—যত সব আজেবাজে কথা আর পারা যায় না ভবতে।

ও নিজের ঘরে এসে জামা-কাপড় বদলে চৌকীর ওপর শুয়ে পড়ল। সারা বাড়ীটা দুপুরের স্তব্ধ নিবিড়তায় খাঁ খাঁ করছে। সামনের মাঠে ঘাসের ওপর অনেকগুলো কাপড় শুকোচ্ছে। তেমনি কাঠফাটা রোদ—বারান্দার সিমেন্ট তেতে গেছে, খালি পায়ে চলাফেরা করা যায় না, ওরই মধ্যে কাপড় আড়াল দিয়ে ছায়া তৈরী করে চাকর পৈরু তার খাটিয়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। পৈরু অনেক দিনের চাকর, আগে ছিল স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ীতে, এখন বুড়ো হয়েছে তেমন খাটাখাটুনির কাজ পারে না বলে তাকে এখানে চালান দেওয়া হয়েছে।

চৌকীর ওপর শুয়ে ও চিঠিখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে। সাদা কাগজে সোজা সোজা হরফে কালো কালি দিয়ে লেখা আছে কয়েকটি কথা। ভদ্রলোকের হাতের লেখা ভালো নয়, তবে ভালো করে লেখবার যত্নটা সুস্পষ্ট। কে জানে ক'বার কাগজ নষ্ট করে তবে এই চিঠিখানির এই চেহারা দাঁড়িয়েছে।

বিয়ে? অরুণা বিয়ে করবে? বিয়ের বয়স আর তার আছে কি এখনও? আছে, নিশ্চয় আছে। না থাকলে কেউ উপযাচক হয়ে প্রস্তাব করতে যাবে কেন? কিন্তু বিয়ে করে স্বাধীনতা খুইয়ে অন্যের সংসারে বধূ হয়ে প্রবেশ করবার মত নমনীয়তা তার নেই। এত দিনের মুক্ত জীবন হারিয়ে অপরের হুকুম-বরদারী করতে যদি মন সায় না দেয়?—এমনি কত কথাই মনে হয় অরুণার, দুপুরের মোহময় নিরবতায় সে আবারও স্বপ্নাতুর হয়ে উঠে। আজ যে তাকে আহ্বান করল তার কাছে যাওয়ার যে আনন্দ সে-ও সামান্য নয়। তার ত্রিশ বছরের জীবনে মধুকর আনাগোনা করেছে অনেক; কিন্তু প্রজাপতি এপথ দিয়ে চলতে ভুলে গিয়েছিল। আজ বুঝি অসময়ে মনে পড়েছে—

ভদ্রলোকের লেখার ধরণধারণ দেখে অরুণার ভালো লাগে—মন্দ নয়, এরকম সরল, স্পষ্ট মানুষকে সহজে চেনা যায়। বেশ লিখেছেন ভদ্রলোক—"আমার বয়স চল্লিশের ওপর, অবস্থা সাধারণ কেরাণী, বর্তমানে কিছু দিন গৃহিণী-বিহীন জীবন যাপন করছি—আপনি যদি আসেন ত' কৃতার্থ হব। আমি

নিজেই প্রস্তাব করছি বলে মনে কিছু করবেন না। এ বয়সে দ্বিতীয়পক্ষের জন্য ঘটকালি করতে কাকে ডাকি বলুন ত'। আমার মনে হয়, আপনার নিজের মতামত সম্বন্ধেও সরাসরি আপনি নিজেই জানাবেন। আপনার সঙ্গে একটু আধটু আলাপ আছে, তবে তা দিয়ে পরিচয় দাবী করবার মত স্পর্ধা নেই। আমি আপনাকে বিয়ে করতে চাই—আপনিও যে অমত করতে পারবেন না, সেই আশা করব। আপনাকে আমার একান্ত প্রয়োজন। যদি বলেন,—আমি ভালোবাসি কি-না? তার উত্তর যাই দিই, বলতে পারেন ফাঁকা কথা। যাকগে, ভালোবাসি কি বাসি না সে কথা পরে হবে—যদি না-ও ভালোবাসি তবু কি বিয়ে হতে পারে না? এমনি, ধরুন পরস্পরকে অবলম্বন করে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া—মন্দ কি? কেউ ভালোবাসা দাবী করব না—অতটা ছেলেমানুষীর বয়স অনেক-দিন পার হয়ে আসা গেছে। তার চেয়ে শুধুই Companion হয়ে থাকা?

"যদি রাজি থাকেন তবে আগামী কাল স্কুলে যাবার সময়ে লাল পেড়ে শাড়ী পরে বেরুবেন, তারপর বিকেল চারটের পর পাঁচটা পর্যন্ত যে কোনো সময়ে বেরুবেন, বড় রাস্তার কাছাকাছিই আমি অপেক্ষা করব। বাকী কথা সাক্ষাতে হবে—পাত্র ও কনে দেখাটাও তখনই সেরে নিতে পারবে উভয় পক্ষ। ইতি—

নাম ঠিকানা দিলাম না।"

অরুণার কাছে চিঠিখানা সমস্যা হয়ে উঠেছে। যা লেখা আছে এতে, তার চেয়ে একটি অক্ষরও জানবার উপায় নেই চিঠিখানি থেকে। এর বেশী কোনো কথার জবাব এই শাদা-কালো-রেখা মাখানো কাগজখানা দিতে প্রস্তুত নয়। হঠাৎ অরুণার মনে হয়, কি কঠিন, নির্মম সেই লোকটা। আরও দু'টো কথা যদি লিখতেন তিনি, ত' বেশ হ'ত। যদি লিখতেন, তিনি কোথায় দেখেছেন অরুণাকে, লিখতেন কবে দেখা হয়েছে, কি কথা হয়েছে—তা হ'লে সে একবার ভেবে দেখবার চেষ্টা করত, খুঁজে বার করতে পারত—

বিয়ে করতে গেলে অসুবিধে অনেক রয়েছে। কিন্তু এমনভাবে নিজের দায়িত্ব বহন করে বেড়ানো আর ভালো লাগে না।—অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের একটি ছবি ও মনে মনে আঁকে। অত্যন্ত সাধারণ হয়েও সেই দিনগুলি অনায়াসে অসাধারণ হতে পারবে—যেমন, এক দিন অরুণার খুব জ্বর হয়েছে, সকাল বেলায় সে ওষুধপত্র এনে দিলে, কিন্তু অপিস যাবার সময় বয়ে গেলো, সে জামাকাপড় বদলালো না, বসে রইল অরুণার পাশে। একান্ত, এমনই একান্ত আপনার জন তার জীবনে কেউ হবে। একেবারে আপনার নিজস্ব একজন কেউ আছে, একথা ভাবতেও যেন ভালো লাগে। সে আপনার—একান্ত আপনার। বার বার অরুণা চিঠিখানা নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে, কখনও মনে হয় বুঝি এ কোন্ স্পর্শসুখ, এ কোন্ মধুর অনুভূতি তার দেহমনে সঞ্চারিত হলো—একবার নিজের কাছে লজ্জিত হয়ে হাতের মুঠোটা আল্‌গা করে চিঠিখানা ছেড়ে দিতে যায়। আবার সজাগ হয়ে সামনের জানলা দিয়ে

বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে আপনার কাছ থেকে দূরে। চিঠিখানা আলতোভাবে মুখের ওপর রেখে কখনও চোখ বোজে সে। এতদিনের ভেসে বেড়ানোর পালা শেষে কোন কূলে এসে সাঙ্গ হ'ল। এ কোন অজানা আশ্রয়। হোক অজানা, তবু ত' আশ্রয়।—আরও কত কথাই ও ভাবে।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়েও অরুণার ঘুম আসে না। শোবার সময় আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে ওর মনে হয় যেন অন্ধকারে কে তার পাশে এসে বসেছে। অন্ধকারে ছায়ামূর্তিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে যেন সেই লোকটি। আজ সকালে যে তাকে চিঠি দিয়েছিল, অর্থাৎ—? অর্থাৎ অরুণার স্বামী। 'স্বামী' কথাটা মনে হতেই অরুণা চমকে উঠে বিছানা থেকে ছিটকে সোজা মেঝেতে এসে দাঁড়ায়। তারপর 'খুচ' করে সুইচটা টিপে দিতেই ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ে। আলো জেবলে নিশ্চিন্ত হয়ে অরুণা আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল। সারাদিন একটা চিন্তা মনের পিছু পিছু এ রকম ধাওয়া করে চললে ভালো লাগে না। ভারি বিশ্রী ব্যাপার—এমন করে আর পারা যায় না—অরুণা ভাবে। বিবাহিত জীবনের প্রতি কোন মোহ তার নেই। থাকলেও সে এ ধরণের বিবাহিত জীবন কামনা করে না।

হঠাৎ তার সমস্ত অন্তর সেই লোকটির প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। জানা নেই শোনা নেই—এ রকমভাবে চিঠি দেওয়া কেন? অরুণা আপন মনেই বলে ওঠে—বেহায়াপনা, হ্যাংলামো। আর একটা সংশয় তার মনে জাগে—এই ধরণের লোককে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে এরা। না, কিছুতেই সে এই লোকটার স্পর্ধাকে বরদাস্ত করবে না। কেন? বিয়ে না করে সে কি এমন খারাপ আছে? কিসের অভাব? আর এখন এই বয়সে অচেনা একটা লোকের ঘরে গিয়ে বাঁধা পড়ে জীবনের সমস্ত আশা ভরসাকে বিসর্জন দেওয়ার জন্যই বা কেন তার এত মাথা ব্যথা! আর বিয়েই যদি করতে হয়, তবে একটু দেখে-শুনে ভালো গোছের পাত্রকেই বরণ করা ভালো। এই ধরণের গায়ে-পড়া মানুষকে স্বামীত্বের আসনে বসাতে গেলে নিজেরই অমর্যাদা করা হবে। আর পাঁচজনেই বা কি বলবে।

হঠাৎ এক সময়ে আবার অরুণার খেয়াল হয়, সেই লোকটার কথাই ভাবছে ও। এবারে জোর করে নিজের বুড়ো আঙ্গুলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রে নিজেকে শাস্তি দেয় ও।...তারপর এক সময়ে আলো জেবলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল বেলায় উঠেই প্রথম কথা মনে হ'ল ওর—সেই চিঠি। চিঠিখানা বালিশের নীচে ছিল। না, আর নয়—চিঠিখানা ছিঁড়ে না ফেললে ওই লোকটার চিন্তা তার মন থেকে যাবে না। এই ভেবে অরুণা বিরক্ত হয়ে চিঠিখানা বার করলে। ছিঁড়ে ফেলবার আগে মনে হ'ল, আর একবার চিঠিখানা পড়ে দেখলে হ'ত।

তারপর থেকে অরুণার সারা মন বিরক্ত হয়ে ওঠে পৃথিবীর তাবৎ ব্যাপারের ওপর। ও ঠিক করে ফেল্‌লে, আজ কালাপেড়ে শাড়ী পরে বেরুবে। এ রকম অশিষ্ট লোকের অপমানিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন, কেনই বা অরুণা একজন অপরিচিত লোকের কথায় নিজেকে চালাবে? জানা নেই শোনা নেই,—না, না তা হতেই পারে না। সে বাক্স থেকে কালাপেড়ে শাড়ী বার করতে গিয়ে দেখলে, —সেটা ধুতে গেছে। সবেগে বিমলাদির ঘরে গিয়ে নিয়ে এলো কালাপেড়ে শাড়ী। আজ যেন ইচ্ছে করে বেশি করে স্নো পাউডার মাখলে, রুজ (যা কোনো দিন ব্যবহার করেনি এর আগে, তাও) লাগালে, ঠোঁটে রঞ্জনী রং একটু দিলে। মোটের ওপর সে বেশ একটু সাজল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধা ভরে ঠোঁটের উগ্র রংটা একটু হাল্কা করে দেবে কি না ভাবলে—পাছে স্কুলের অন্য সবাই আর কিছু মনে করে, এই আশঙ্কা। তা করুক গে, অপমান যাকে করা হবে, তাকে রীতিমত জ্বালিয়ে দেওয়াই ভালো। অরুণাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে—তার নিজেরই মনে হয়।

শাড়ীটার পাট ভাঙতে ভাঙতে গুণ গুণ করে একটা গানের কলি ভাঁজতে থাকে ও "রোদন ভরা এ বসন্ত কখনো আসে নি বুঝি আগে"—

হঠাৎ মাঝ পথে থেমে গিয়ে অরুণার একটা কথা মনে হ'ল।—সেই লোকটি ত' ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যাবে, তার নয় খুব দুঃখ হ'ল—কিন্তু অরুণা ত জানতে পারবে না, কোন দরদী মন তার শাড়ীর আঁচল আশ্রয় করবার জন্য ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে লিপিদূত পাঠিয়েছিল? যে তার মনকে একটি দিনের দীর্ঘ মুহূর্তগুলি অধিকার করে ছিল তাকে যে জানা হ'ল না।

একটা অদম্য কৌতূহলে অরুণার মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। শুধু তাকে দেখবার জন্যই ও লাল শাড়ী পরবে। তখনই সে কালাপেড়ে শাড়ীটা আলনায় গুছিয়ে তুলে রেখে লালপেড়ে শাড়ীখানাই পরতে লাগল। অন্ততঃ তাকে চিনতেই হবে—। দেখতে দোষ কি, মানুষই ত'।

লালপেড়ে শাড়ীখানায় যেন জগতের সমস্ত লজ্জা পুঞ্জীভূত হয়ে আশ্রয় করেছে। শাড়ীখানা পরে অরুণার পথ চলতে আজ পা যেন জড়িয়ে আসছে। তার জীবনের সঞ্চিত ব্রীড়ারাশি পথের বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে রয়েছে যেন। স্কুলে যাবার সময়ে আজ আর সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চলতে পারে না, আশপাশে তাকাতে সঙ্কোচ বোধ হয়, এই পথ, যা তার নিত্য দিনের সাথী ছিল, তা যেন কেমন দুরত্বময় হয়ে উঠেছে। এর কোথায় যেন কী হয়ে গেছে, তার পায়ে পায়ে লজ্জার কুণ্ঠা জড়িয়ে ধরছে, পথ চলার গতিকে ব্যাহত করছে। চলতে চলতে অরুণার মনে হয় স্কুল থেকে ফেরবার সময় কী হবে? তখন ত'—।

যে মানুষটির কল্পনায়ও সে বিরক্ত হয়ে উঠেছে, আজ সকাল থেকে প্রতি মুহূর্তে সেই অজানা লোকটি তাকে এত সঙ্কুচিত করে তুলল! অরুণার মনে হয়, বুঝি সারা রাস্তার প্রত্যেকটি পথিক তার দিকে তাকিয়ে আছে। ছি, ছি,

এমনভাবে প্রতিনিয়ত সঙ্কোচের ডালি ভাগ্যের ললাটে এ'কে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে সে পারবে না, কিছুতেই পারবে না।

স্কুল থেকে ফেরবার পথে নিশ্চয় সেই লোকটির দেখা পাওয়া যাবে। তখন তাকে বেশ দু' কথা শুনিয়ে দেবে অরুণা—ভদ্রতা, শিষ্টাচার, ভব্যতা এগুলো যে গল্প-কথা নয় তা সে বেশ কড়া করেই জানিয়ে দেবে।

স্কুলের গেটের সামনে এসে পড়ে অরুণার মন আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে. এমন সাজগোছ করে কোনো দিন সে স্কুলে আসেনি। শিক্ষয়িত্রীর ষোলো আনা আদর্শ তার কাছে অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু আজ—

আজ আর সময় যেন কাটতে চায় না। এক একটা ঘণ্টা যেন যুগ যুগান্তর পার ক'রে দিচ্ছে।

এমনি করে তিনটে বাজল। এক ফাঁকে অরুণা বাথ রুমে গিয়ে ঠিকঠাক হয়ে নিলে। মুখের ওপর ঘামের তৈলাক্ত ভাবটুকু যেন কিছুতেই কাটতে চায় না, কপালে কুঙ্কুমের টিপটা যেন ম্লান হয়ে গেছে। অরুণার চেহারায় অপরাহ্ণের ছায়া পড়েছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে যতই বড়-রাস্তার কাছাকাছি সে এসে পড়ে ততই যেন নিজের ওপর বিরক্তি শ্রাবণের ঘনকালো মেঘরাশির মত পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে থাকে। একটা কথা তাকে পীড়া দিচ্ছে--তার জীবনে কি অপরাহ্ণের ছায়া পড়েছে সত্যি? তাই যদি সত্যি হয় তবে ওই অশিষ্ট লোকটিকে আজ অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়ে কোন ভরসায় অরুণা বসে থাকবে?

না, তবু, তবু সে বরদাস্ত করতে পারবে না এই স্পর্ধিত লোকটার এই ধরণের আচরণ। লোকটা যেন জোর করে অরুণাকে জানিয়ে দিতে চায় যে, তাকে পাওয়া সহজ।—তবে কি সত্যই তার মূল্য কমে গেছে? অরুণা নিজেকে বিচার করতে চেষ্টা করে। তার মনে সংশয় জাগে।

অত বড় আঘাত দিতে পারে যে মানুষ তার সাহসের তারিফ করতে হয় বই কি।

না, অরুণা আর পারে না অহর্নিশ এই দ্বন্দ-সংঘাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে ছুটে বেড়াতে। এক একটা কথা যে তাকে এমন পেয়ে বসছে, যেন পাগল করে দেবে। এই যে কাল থেকে নিজের বিরুদ্ধে বিবিধ অস্ত্র প্রয়োগ করছে অরুণা তার জন্যে সত্যই কি ওই লোকটি দায়ী? সে এমনিই বিয়ের প্রস্তাব করে চিঠি লিখেছে হয়ত। হয়ত কোনো সাতপাঁচ না ভেবেই লিখে ফেলেছে। অরুণাই ত তার নিজের মনের ঘাত-প্রতিঘাতে জিনিষটা এত ঘোরালো করে তুলেছে।

এইসব ভেবে ওর বিরূপতা যেন একটু নরম হয়ে আসে।

সত্যিই যদি কেউ এই অপরাহ্ণের অবসন্ন মুহূর্তে আহ্বান করে—দীর্ঘ-কালের সঙ্গীবিহীন জীবনযাত্রার পর তা কি কম লোভনীয়!

অরুণা ভাবে, হোক না সে লোকটা বোকা বোকা, হোক না সে কেরাণী,

না হয় হ'লই বা একান্ত বাস্তববাদী প্রৌঢ় অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—তবু ত অবলম্বন। যদিও অরুণা তাকে জানে না, চেনে না, সে সম্পূর্ণ অপরিচিত—তা হোক, এই একলা চলার অবসান যেখানে হবে সেই আশ্রয়টুকুই জীবনের অপরাহ্নে অরুণার কাছে পরম-মূল্যবান। সে ভালোবাসা চায় না, আশার স্বপ্ন কিছুই সার্থক হবে এ দুর্লভতার প্রতি লোভী নয় তার মন—শুধু অবসান হোক একলা চলার পালা। তাতে অশান্তি আসুক, দুর্ভাগ্য ভেঙে পড়ুক তার মাথায়, দারিদ্র্যে দৈন্যে তার জীবন ছারখার হয়ে সার্থক হয়ে উঠুক। তবু এই একলা চলার অবসান হোক। সে আর পারে না নিজেকে বহন করতে।

মহাদেব ন্যাশানাল সার্কাসের ক্লাউন্।

তার মুখের গড়ন ঠিক বাংলা পাঁচের মতো। চোখ দু'টো গোল, নাক বেশ লম্বা কিন্তু তীক্ষ্ম নয়, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো। একে দেখবার জন্যেই সহস্র দর্শকের ভিড় জমে যায়।

দু'একটা ছোটখাটো খেলা হ'য়ে যাবার পর নিজের বিশেষ পোশাক প'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুত ভংগীতে মহাদেব এসে আছাড় খেয়ে পড়ে একেবারে মাঝখানে। ব্যস, সেইটুকুই যথেষ্ট! প্রবল অট্টহাসিতে চারপাশ যেন ফেটে পড়ে।

তারপর রঘুনাথের বাঘের খেলা! কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিট রঘুনাথকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—দর্শকের হাসি সহজে থামে না।

আরও নানারকম খেলার পর আসে রুক্মিণী।

প্রায় চৌষট্টিটা চেয়ার একটার পর আর একটা দিয়ে উ'চু করা। চেয়ারের তলা দিয়ে সাপের মতো এ'কে বে'কে রুক্মিণী একেবারে ওপরের চেয়ারে গিয়ে বসে, তারপর তেমনি ক'রে আবার নেমে আসে। কী আশ্চর্য কৌশল! নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে প্রত্যেকে যেন তাদের হৃৎস্পন্দন শোনে! একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সর্বনাশ—বে-কায়দায় প'ড়ে গিয়ে রুক্মিণীর হাড় গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। হাত-তালির তীব্র শব্দে তাঁবুর বাঁশগুলো যেন দু'লে ওঠে।

তারপর আবার মহাদেব। নিমেষে দর্শকের হৃৎস্পন্দন শোনার আগ্রহ টুটে যায়—সমস্ত গাম্ভীর্য আর আশংকা হাওয়ায় মিশে যায়।

ঠিক রুক্মিণীর মতো সেও চেয়ারের তলায় সশব্দে মাথা ঠুকে সেই চৌষট্টিটা চেয়ারের সংগে হুড়মুড় ক'রে পড়ে। কিন্তু তার হাড় গুঁড়ো হয় না—অদ্ভুত কায়দায় আঘাত বাঁচিয়ে পা বাঁকাতে বাঁকাতে মহাদেব উঠে দাঁড়ায়।

হাসির আওয়াজ প্রবল হ'য়ে ওঠে।

বাইরে বেরিয়ে এসেই মহাদেব রুক্মিণীকে জিজ্ঞেস করে, কেমন খেলা দেখালাম আজ?

ওঃ, চমৎকার!

চমৎকার, হ্যাঁ? হে' হে', বা বা বাঃ, খেলা না দেখেই ব'লে দিলে চমৎকার?

না দেখে মানে? নিশ্চয়ই দেখেছিলাম।

কই বাবা, মাথা চুলকে মহাদেব বললো, আমি চেয়ারের তলা থেকে চোখ পিট্‌পিট্‌ ক'রে দেখছিলাম যে, তুমি তো—

তাড়াতাড়ি রুক্মিণী বললো, কেমন ক'রে বেরিয়ে আসো তুমি? আমি হ'লে তো গুঁড়ো হ'য়ে যেতাম।

আহা হা, কী যে বলো, তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণ—তুমি কি পড়ে যেতে পারো?

আমি না-হয় সার্কাসের প্রাণ, আর তুমি?

আমি বাবা সার্কাসের লেজটি।

ওমা, সে আবার কী?

হুম্‌ বাবা, লেজটি। কিন্তু পড়ে যাবার কথা তুমি আর ব'লো না—আমার ভয় লাগবে।

আমি প'ড়ে গেলে কাঁদবে তুমি?

হুম্‌ বাবা, কেন কাঁদবো না? তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণটি...সেটি পড়লে কাঁদবো না? একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে—

পেছন থেকে রঘুনাথ ব'লে উঠলো, তোকে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে দেখলে সকলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে। ভাগ্‌ এখান থেকে—

এই সব নিয়ে গড়ে উঠেছে ন্যাশানাল সার্কাস। সমস্ত পৃথিবী থেকে লোক নেয়া হ'য়েছে। আয়োজন বিরাট। তা ছাড়া বাঘ-সিংহ, হাতী ঘোড়া, বাঁদর-ভাল্লুক, নানা রকম জন্তু-জানোয়ার মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলা দেখায়।

আজ সার্কাস বন্ধ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম। ফেণী মহকুমায় তাঁবু পড়েছে। বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, কারুর শহর দেখতে বেরুবার উপায় নেই। চায়ের কাপ্‌ আর খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে মহাদেব আর রঘুনাথ রুক্মিণীর তাঁবুতে আসর জমালো।

রুক্মিণী বললো, কিছুই খাচ্ছ না যে রঘুনাথ?

বাড়ির কথা ভাবছি!

বাড়ির কথা? গম্ভীর হ'য়ে রুক্মিণী বললো, বউএর কথা নাকি?

না, আমার বিয়ে হয় নি।

আমারও হয় নি, মহাদেবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আ হা হা হা, হেসে রুক্মিণী বললো, তোমার কেন বিয়ে হয়নি মহাদেব?

কে বিয়ে করবে বাবা? যা হ্যাংগামা! যেন আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে কুঁজো হ'য়ে এমনি ক'রে চলা—উঠে দাঁড়িয়ে চলাটা দেখিয়ে দিতে দিতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, ও এতো শিখলো কোথায় রঘুনাথ?

হ্যাঁ, বেটা শিখছে বটে!

ওর মুখ দেখলেই আমার হাসি পায়। মহাদেব বলে, তার মুখ নাকি আর এক রকম ছিল, চেষ্টা ক'রে ক'রে ও এমনি মজার মুখ তৈরী করেছে।

হবেও বা, শালা সব পারে! তারপর একটু চুপ করে থেকে খুব আস্তে আস্তে রঘুনাথ বললো, আচ্ছা রুক্মিণী তুমি·বিয়ে করো নি?

রুক্মিণী যেন বড়ো বেশি লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে জানালো, না।

কেন?

সে অনেক কথা রঘুনাথ!

বল না শুনি?

আর কেউ এদের কথা শুনছে না। বৃষ্টি ঝরার একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে। মেমসাহেবদের তাঁবু থেকে হাসির কল্লোল শোনা যাচ্ছে। বোধহয় মহাদেব গিয়ে জুটেছে সেখানে।

বলো রুক্মিণী।

আমি বিয়ে করলে সংসার চলবে না। আবার বাবা নেই, মা আর অনেক ভাই বোন। তোমার দেশ কোথায় রঘুনাথ?

দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি অনেকদিন। আমার আপনার লোক বলতে এখন কেউ নেই। আজ এখানে কাল সেখানে—এখন তো ঘর সংসারের ঠিক নেই। তাই তো বিয়েও করি নি।

তাঁবুর হাওয়া যেন সজল গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে দু'জনের বুকে ফুলে ফুলে উঠলো দীর্ঘ নিশ্বাস।

এখানকার প্রত্যেকের জীবনের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এমনি আসরে মাঝে মাঝে সেই সব কথা আলোচনা করা হয়। সকলের ইতিহাস প্রত্যেকের জানা।

জানোয়ারেরা কথা বলতে পারে না। তবু কখনো কখনো খাঁচার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের চোখের ভাষা যেন পড়া যায়। গহন বনের স্বাধীন জীবনের প্রায়-বিস্মৃত ইতিহাস তাদের চোখের তারায় তারায় কাঁপে। তাদেরও দীর্ঘ-নিশ্বাস খাঁচার কোটরে জমা হ'য়ে আছে।

কিন্তু শুধু ব্যতিক্রম মহাদেব। তার চেহারা দেখলেই প্রত্যেকের হাসি পায়। তারও নিশ্চয়ই একটা কাহিনী আছে আর হয়তো তা একান্ত দুঃখেরই গম্ভীর ইতিহাস! কিন্তু সে কথা শুনবে কে? তার মুখই যে দুঃখ ভোলানো। ভাঁড়ামির প্রবল চাপে মহাদেবের অন্তরের গভীর দিকটা আজ একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেছে। মহাদেবও নিজের সব গভীর কথা ভুলেছে—এই ভাঁড়ামির ভোলই তার একমাত্র চরম পরিচয়।

যদি সে একদিন অন্য সকলের মতো বেশ গম্ভীর মুখে আসরে বলতে আরম্ভ করে, শোন তোমরা, তোমাদের মতো আমিও একদিন সংসারে ছিলাম,

আমারও আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, বিয়েও করবো ভেবেছিলাম—কিন্তু এতো কথা ওই মজার মুখ নিয়ে বলতে পারবে কি? আর বললেই বা লোকে শুনবে কেন! মহাদেবের জীবনের গভীর কাহিনী তার ভাঁড়ামির ছাপমারা মুখের চেয়ে বড়ো কি? লোকে হাসি ঠেকাবে কেমন করে!

মহাদেবের কোন কথাই কেউ জানে না।

সকালবেলা জন্তু জানোয়ারদের খেলা শেখানো হয়। রঘুনাথই শেখায় আর অনেকে নিজের খেলা অভ্যাস করে নেয়। মহাদেব এ সময়টা বড়ো ব্যস্ত থাকে। কারণ তাকে হাসাবার নতুন ভংগী বের করতে হয় আর খেলারও অভ্যাস করে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

রুক্মিণী দূরে দাঁড়িয়ে মহড়া দেখে। কখনও কখনও সে মুগ্ধ বিস্ময়ে রঘুনাথের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রঙ আর গম্ভীর মুখ রুক্মিণীর মনে যেন নেশা জাগায়। রঘুনাথ কি যাদু জানে? তাকে দেখলেই বাঘ সিংহেরা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। চেয়ে চেয়ে রুক্মিণীর মানসিক বিলাস বেড়ে যায়। তারপর সে হাসতে আরম্ভ করে। দূর থেকেই হাসির শব্দ শুনে মহাদেব বুঝতে পারে রুক্মিণী তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ মহাদেবেরও উৎসাহ বেড়ে যায়। গড়াতে গড়াতে সে চলে আসে একেবারে তার পায়ের কাছে।

কেমন রুক্মিণী?

খুব ভালো, এতো জানো তুমি!

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা নেই বার্তা নেই মহাদেব ফস্ করে গান ধরে, আমি জানি তাই মানি...

মহাদেবের হাত ধরে টানতে টানতে রুক্মিণী তাঁবুতে চলে এলো।

কী খাবে বলো মহাদেব?

তোমাকে খাবো—হাঁ—মহাদেব মুখটা একটু বেঁকিয়ে গোল হাঁ করলো।

বাবারে বাবা, এতো হাসাতে পারো তুমি, পেটে খিল ধরে গেল!

ছেড়ে গেলেই সেরে যবে।

তাই নাকি?

হুম্ বাবা।

সত্যি মহাদেব, তোমাকে দেখলে শুধু হাসতে ইচ্ছে করে। কাকে বিয়ে করবে তুমি? সে বোধহয় হাসতে হাসতে মরে যাবে।

নকল কান্নাভরা গলা ক'রে মহাদেব বললো শুধু আমার এই চেহারাটা দেখে প্রথমেই ডুকরে কেঁদে উঠবে—হুম্ বাব্বা!

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, বলো এবার কী খাবে?

বকের ডিম—

বকের ডিম? সে কোথায় পাবে?

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিণ্ডিম্ ডিণ্ডিম্—নাচতে নাচতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

সেদিন একেবারে প্রথমেই এক কান্ড!

ঘোড়ার পিঠের ওপর পি-কক্ হ'তে গিয়ে মাটিতে পড়লো মহাদেবের মাথার চাঁদি। একটা শব্দ হ'লো। মহাদেব জ্ঞান হারালো—রক্তের ধারা ব'য়ে গেল। ধরাধরি করে মহাদেবকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তারপর ডাক্তার—ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি।

এমন ঘটনা এই সার্কাসে এই প্রথম। আজ মহাদেব দেখছিলো দূরে দাঁড়িয়ে রুকিনী হাসছে—তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে সে কী যেন ভেবেছিল! ব্যস্ তারপরই এই কান্ড! কিছুক্ষণের জন্যে খেই হারিয়ে গেল। সার্কাসের লোকেরা কি করবে ভেবে পেল না।

জ্ঞান হবার পর চোখ খুলে মহাদেব বুঝতে পারলো না সে কোথায়। চোখ চেয়ে দেখলো রুকিনী গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কেমন আছো মহাদেব?

আমার কী হ'য়েছে? স্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনাটা মহাদেবের মনে পড়লো।

মৃদুস্বরে রুকিনী বললো, আর কথা ব'লো না, ঘুমোও চুপ ক'রে—

আমার মাথায় বড়ো যন্ত্রণা—উঃ, বড়ো কষ্ট—

সব সেরে যাবে মহাদেব। ঘুমোও, তোমার কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিই।

তুমি থাকবে, আমি বাঁচবো রুকিনী?

আঃ, কী যে বলো!

কেন আমার এমন হ'লো!

কিছু হয়নি তোমার। আর কথা ব'লো না, ব্যথা তাহ'লে বেড়ে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি ঘুমোই।

দূরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় সকলের খাওয়া শেষ হ'লো। রাত কত কে জানে!

কয়েক দিন কাটলো।

আজ ডাক্তার বাবু আশা দিয়ে গেছেন, মহাদেবের আর কোন ভয় নেই।

রুকিনীর দিকে চেয়ে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় মহাদেবের মন ভ'রে গেল।

বার্লিটা খাও এবার—

না, আমাকে আর বার্লি দিও না।

ছি, ছেলেমানুষী করে না, আমার কথা শোন!

আগে তুমি খাও?

ওমা, আমি কেন খেতে যাব? আমার কি হ'য়েছে?

তাহ'লে আমিও খাবো না।

বারে, এতো বেশ!

নিঃশব্দে অন্ধকার জমা হচ্ছিল। রুক্মিণী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ল্যাম্প্ জেবলে দিল। আর সেই মৃদু আলোয় তার চেহারা দেখে মহাদেবের কি যেন মনে হ'লো—একটা তীব্র নতুন অনুভূতিতে তার শরীর কে'পে উঠলো। বার্লি হাতে নিয়ে মহাদেবের বিছানায় আবার এলো রুক্মিণী আর আস্তে আস্তে মহাদেব তার একটা হাত চেপে ধরলো।

বার্লি খাও—

রুক্মিণী, কেন তুমি আমার জন্যে এত কর, কথাটা মৃদু গম্ভীর স্বরে বললো মহাদেব আর তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠলো।

হঠাৎ হাসির প্রবল তরঙ্গ উঠলো রুক্মিণীর পেটে। সে অনেক চাপতে চেষ্টা করলো কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই। হাসির তোড়ে কিছুটা বার্লি ছিটকে পড়লো মহাদেবের গায়ে।

এ কি, অতো হাসছো কেন রুক্মিণী?

না, কিছু না—

আবার আমার মুখ দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে, না?

না না—বার্লির কাপটা রেখে হাসি থমাবার জন্যে রুক্মিণী বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব বার্লি খায়নি, কাপটা দূরে ছু'ড়ে ফেলে দিয়েছে।

রাগ হ'য়েছে, না?

না।

ও বাবা বড্ড রেগে গেছ দেখছি।

না, আমার আবার রাগ কি!

হাসি চেপে রুক্মিণী বললো, ছি, অত রাগ করে না, এখনো তুমি খুব দুর্বল—আবার অসুখ বেড়ে যাবে যে!

আমি মরলেই বা কার কি!

থাক, অনেক হ'য়েছে, যাই আবার আমার কাজ বাড়লো, বার্লি করি গে!

আমি খাবো না।

দেখা যাক, হাসতে হাসতে রুক্মিণী চলে গেল।

বার্লি তৈরী ক'রে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব ঘুমিয়ে পড়েছে।

রুক্মিণী তাকে আর জাগালো না। তার অদ্ভুত মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কয়েক দিন পর মহাদেবের মনে হ'লো তার ব্যথা অনেক কমে গেছে।

বোধহয় ইচ্ছে করলে সে এখন উঠে দাঁড়াতে পারে। সে উঠতে যাবে এমন সময় রুক্মিণী এলো।

উঠো না, উঠো না বলছি।

আমি সেরে গেছি রুক্মিণী।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কে সারিয়ে তুললো তোমাকে?

তুমি। কিন্তু কেন আমাকে সারিয়ে তুললে তুমি?

কেন বল তো?

আমাকে দেখে হাসবে ব'লে।

না না মহাদেব।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, মহাদেবের পাশে রুক্মিণী ব'সে পড়লো।

তার একটা হাত ধরে মহাদেব বললো, একটা কথা বলবো রুক্মিণী?

বলবে বৈ কি, নিশ্চয়ই বলবে।

ভাবছি আমার অসুখ কেন সারলো? তোমাকে তো আর অতো বেশি কাছে পাবো না।

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, এত কথা শিখলে কোথায়?

তুমিই তো শিখিয়ে দিলে, একটু থেমে মহাদেব আবার বললো, আচ্ছা রুক্মিণী, তোমার কী কোনদিনও বিয়ে হবে না?

কে বিয়ে করবে আমায়?

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে মহাদেব জোরে ব'লে উঠলো, আমি—আমি তোমাকে বিয়ে করবো রুক্মিণী!

আরও জোরে হেসে উঠে রুক্মিণী বললো, দূর পাগলা, তোমাকে কেন বিয়ে করবো? রঘুনাথ—রঘু কী আমায় বিয়ে করবে!

বড়ো বেশি আঘাত লাগলো মহাদেবের, করুণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে রুক্মিণীর মুখের দিকে সে চেয়ে রইলো।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, বিয়ে—তোমাকে বিয়ে—বাকি কথাগুলো হাসির ঝাপটায় সে আর বলতে পারলো না।

শীতের প্রবাহে তাঁবুর চারপাশ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে।

আজ রাত্রে হবে শেষ প্রদর্শনী। বহুদিন পর আসরে আবার মহাদেবকে দেখা যাবে। হ্যান্ডবিলে একথা লেখা ছিল। সন্ধ্যে থেকেই শহরের সমস্ত লোক ভেঙে পড়লো সার্কাসের তাঁবুতে। ভেতরে প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রস্তুত—যাবার আগে সব চেয়ে ভালো খেলা তারা দেখিয়ে যাবে।

যথা সময়ে সার্কাসের সেই পরিচিত বাজনা বেজে উঠলো। রুক্মিণীকে আজ লাল পোশাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল তলোয়ারের মতো। দূরে দাঁড়িয়ে মহাদেব

তার খেলা দেখলো। সেই রুক্মিণী—যে তার মাথার কাছে বসে থাকতো দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত।

তারপর আরম্ভ হ'লো রঘুনাথের বাঘের খেলা। চাপা উত্তেজনায় গ্যালারী-গুলো যেন থম্ থম্ করছে। চারপাশে চারটে রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে শুধু হাতে তেজস্বী নির্ভিক বীরের মতো রঘুনাথ ভয়াবহ খেলা দেখাচ্ছে। কখনও বাঘের মুখে মাথা পুরে দিচ্ছে আর কখনও অদ্ভুত কৌশলে প্রকান্ড বাঘকে ধরাশায়ী করছে। জনতার মুখে ফুটে উঠেছে তীব্র আগ্রহ।

দর্শকদের আড়ালে একটু দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মহাদেব আর রুক্মিণী খেলা দেখছে। মহাদেব এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রুক্মিণীর মুখের দিকে। কী ব্যাকুল দৃষ্টি রুক্মিণীর! তার গভীর কালো চোখ থেকে যেন আগ্রহ আর উত্তেজনার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মহাদেব ভাবলো, তার খেলার সময় রুক্মিণীর চোখ মুখ এমনি অপরূপ হয়ে ওঠে না কেন! সে শুধু হাসে। কিন্তু সে তো তার মনে এমনি দাগ অতি সহজে কাটতে পারতো! কি খেলা দেখায় রঘুনাথ! অমন খেলা ইচ্ছে করলেই মহাদেব দেখাতে পারে। হোক না সে এ সার্কাসের ভাঁড়, কোন খেলা সে না জানে? হ্যাঁ, এই বাঘের খেলা এক সেকেন্ডে সে দেখাতে পারে। মহাদেবের মাথার ভেতর কেমন যেন হতে লাগলা। দুর্বল শরীর নিয়ে সে এগিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ প্রচন্ড হাসির শব্দে মহাদেবের চমক ভাঙলো। আরে একি সে যে একেবারে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে আর দর্শকদের হাসির আওয়াজে বাঘগুলোও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

কোন রকমে হাসি চেপে রঘুনাথ মহাদেবের কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে বললো, এই শালা পালা এখান থেকে, বাঘ ক্ষেপে গেলে মুশকিল হবে।

পরিপূর্ণ সার্কাস মন্ডপে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ মহাদেব যেন নিজেকে ফিরে পেল, ফ্যাল ফ্যাল করে দর্শকের দিকে চাইলো সে শুধু একবার। তারপর তার নিজস্ব ভংগী করে পা বাঁকাতে বাঁকাতে বেরিয়ে গেল। চারপাশে হাসির প্রচন্ড আওয়াজ। দূরে রুক্মিণীও হাসছে।

মাটি

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি কোল্‌রিজের সেই বিখ্যাত কবিতা 'পুরোনো নাবিকের কাহিনী' যাঁদের পড়া আছে, তাঁরা আমার গল্পের এই অদ্ভুত চরিত্রটিকে সহজেই বুঝতে পারবেন। আমার এই চরিত্রটিও নাবিক, এবং বহু পুরাতন নাবিক। সেই জীর্ণ শীর্ণ—জরাগ্রস্ত, অথচ দীঘল চেহারা,—রাত্রের অন্ধকারে ভয়াবহ বলেই মনে হবে। কোল্‌রিজের নাবিকের বর্ণনা দিয়ে এরও হুবহু বর্ণনা করা চলে। তফাত শুধু আমাকে নিয়ে। আমি কোল্‌রিজের কবিতা-অনুযায়ী কোনো বিবাহের নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিলাম না,—ছিলাম উমেদার। চাকরির উমেদার।

একেবারে নির্মম বাস্তব। বাংলাদেশে চাকরি নেই, তাই, বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ঘুরে বেড়াচ্ছি এদেশ-ওদেশ কাজের চেষ্টায়। কীভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেটা সবিস্তারে বলা চলে না, রেল কোম্পানীর কর্তাদের চোখে পড়লে বিশেষভাবে চিহ্নিত হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা।

হট্টমন্দিরে শয়নের কথাটা বুঝতে কষ্ট নেই, কিন্তু যত্রতত্র ভোজনের কথায় সন্দেহের অবকাশ আছে। এই 'যত্র-তত্র'-এর সঙ্গে যদি 'ছত্র' যোগ করা যায়, তাহলেই আমার ভোজনের ব্যাপারটা যথেষ্ট সরল ও সহজ হয়ে আসে। তিন-দিন ক'রে ছত্রে থাকছি (কারণ তিনদিনের বেশী ছত্রে থাকতে দেয় না), আর ঘুরে বেড়াচ্ছি দক্ষিণ ভারত, চ'ষে বেড়াচ্ছি বললেও চলে। কিন্তু ফসল ফলছে না। এমনই এক নিষ্ফলা রাত্রে লোকটির সঙ্গে আমার দেখা। নাম করব না, ভারতের পশ্চিম উপকূলের একেবারে প্রান্তবর্তী একটি শহর,—ছোটখাটো বন্দরও বলা চলে। নারকেলের শাঁস, আর লবণের আমদানী-রপ্তানীর সমারোহই বেশী। দেশী পালতোলা ছোট জাহাজের সারি দাঁড়িয়ে, কিছুদূরে দু'একটি কলের জাহাজকেও দেখা যায় মাঝে মাঝে নোঙর ফেলে ব'সে থাকতে।

যেদিনের কথা বল্‌ছি, সেই দিনটা সকাল থেকেই ছিল ভয়াবহ। মেঘে মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। সোঁ-সোঁ-করা প্রমত্ত বাতাস। সমুদ্রের বুক ফুলে ফুলে উঠছে। সেই স্ফীত বক্ষ থেকে মত্ত ব্রেকার্‌গুলো শিকারলোভী শ্বাপদের তীক্ষ্ন দংষ্ট্রার মতো তীব্র শুভ্রতায় ঝল্‌সে উঠে তীরের দিকে এগিয়ে আসছে!

বন্দরে সতর্কতার সীমা নেই। কলের জাহাজ দুটি নোঙর তুলে আরও দূরে সরে গেল। পালতোলা কাঠের জাহাজগুলো বারবার মুখ ঘুরিয়ে রাখছে

বাতাসের গতি বুঝে বাতাসের অভিমুখে। জাহাজের ছুঁচলো মুখ বাতাসের প্রতিকূলতা কাটিয়ে যাবার উপযোগী, কিন্তু সাবধান, বাতাস যেন জাহাজের গায়ে এসে ধাক্কা না দিতে পারে, তাহলে সহজেই জাহাজ উল্টে যাবার সম্ভাবনা!

চারিদিকেই একটা সতর্কতার ভাব, একটা 'সাবধান-সাবধান' রব, ডুবুরিরা মুক্তার খোঁজে যায়নি আজ, জেলেরাও বেরিয়ে পড়েনি তাদের নৌকা নিয়ে মাছের সন্ধানে। সবই দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু আমি বাঙলাদেশের ছেলে, সমুদ্রের ঝড়-সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, সারাটা দিন ছত্রের মধ্যে আটক থেকে হাঁপিয়ে উঠলাম। তাই, 'যা হয় হোক' ব'লে সন্ধ্যা ঘন হ'তে না হ'তেই পড়লাম বেরিয়ে। তেমন বৃষ্টি নেই, বাধা কী বেরিয়ে পড়তে? ছত্রের দু'একজন অবশ্য বারণ করেছিল, কিন্তু কে শোনে ওদের কথা?

চারিদিকে একেবারে কালোয় কালো। আকাশ ঢাকা কালো মেঘে, সমুদ্রও অন্ধকারে কালো, শুধু সেই উত্তাল ঢেউয়ের ব্রেকারগুলো আরও দুর্নিবার বেগে এসে তীরভূমিতে ভাঙছে! কী রুদ্ধ আক্রোশ!

বন্দর ছাড়িয়ে চলতে লাগলাম দূরে। বাতাসের বেগ তখন সাংঘাতিক, আমাকে সুদ্ধ না উড়িয়ে ফেলে! শেষে এমন হ'লো যেন পা ফেলতেও ভয় করছে! পা তুলছি, কিন্তু মনে হচ্ছে পা আর পড়বে না,—তার আগেই ছিন্ন পাতার মতো উড়ে চলে যাবো!

বন্দর ছাড়িয়ে একটা টিলার মতন কিছুতে উঠেছি বোধ হয়। কতকগুলো নারকেল গাছ প্রাণপণ যুদ্ধ করছে বাতাসের বিরুদ্ধে! নুয়ে পড়ছে অতবড়ো মাথা-উঁচু-করা গাছগুলো, আবার মাথা তুলছে, আবার নুয়ে পড়ছে! বাতাস যেন অতিকায় দৈত্যের মতো টুঁটি টিপে ধরেছে ওদের!

দূরে, বন্দরে, যেখান থেকে সার্চলাইটটা ফেলছে মাঝে মাঝে, সেই ক্ষুদ্র সিগন্যাল্ অফিসের মাথায় জ্বলছে দুটো লাল আলো—বিপদসূচক সংকেত! তার চারিদিক জুড়ে একটা তীব্র সোঁ-সোঁ শব্দ! যেন অতিকায় একটা কালো সাপ ফণা তুলে অনবরত ক্রুদ্ধ গর্জন করছে!

ঠিক এমনি মুহূর্তটিতেই লোকটির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। তখন পা ফেলতে পারছি না ঠিক ক'রে, চোখ চাইতে পারছি না,—বালির কণা বাতাসে উড়ে আসছে,—পাথরের ক্ষুদ্র টুকরোও দুটো-একটা উড়ছে বোধ হয়, গায়ে এসে বিঁধছে, গড়ানো আলগা কোন পাথরে পা দিয়ে গড়িয়ে না যাই,—এই রকম বিহ্বল অবস্থা,—লোকটি এসে ধরল আমার হাত। লোহার মতো শক্ত আর বরফের মতো ঠাণ্ডা একটা হাত। বলল,—ভয় নেই, এসো আমার সঙ্গে।

বেশীক্ষণ হাঁটতে হয়নি, কিন্তু কোথায় যে এলাম তা' বুঝতে পারিনি। সবই ত গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। লোকটির পাশে যখন তারই নির্দেশ মতো এসে বসলাম, তখন এইটুকু বুঝেছিলাম, যেখানেই এসে থাকি, মাথায় একটা ছাদ আছে। জানালা নেই, ছাঁট আসছে না! শুধু যেখানটা দিয়ে ঢুকেছি, সেটা

আমাদেরই ঠিক সামনে এখন, দরজার আকার, কিন্তু কবাট নিশ্চয়ই নেই, থাকলে আমার সঙ্গী ঠিক সেটা ভেজিয়ে দিতো।

যাই হোক, দরজাটা বাতাসের গতির বিপরীত মুখে ছিল, তাই বাতাসের কশাঘাত থেকে বেঁচেছিলাম। আর বেঁচেছিলাম বালির কণার হাত থেকে! ঝড়ের মুখে ওই বালির কণাই যে কী ভয়ানক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবেন না!

লোকটি বলল, জীবনের মায়া যে নেই তা'ত বুঝেছি, নইলে এই সর্বনাশের সামনে বেরোয় কে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই সে একটু ধমকের সুরে বলল,—থামো। কতো কী ঘটতে পারে আজ, তা জানো? সমুদ্র ক্ষেপে ছুটে আসতে পারে ভিতরে! গাছপালা-বাড়ীঘর দোর সব তাসের মতো ভেঙে পড়তে পারে! এরকম ঝড় জীবনে কখনো দেখেছ?

—না।

—শোনো। শুনে যাও। কেন শোনাচ্ছি জানি না, কিন্তু বলতে আমাকে হবেই।

বললাম,—তুমি কে, জানতে পারি কী? আর, এ কোথায় আমরা ব'সেছি এসে?

লোকটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল। যেখানে আমরা এসেছি, এটা যে কারুর বাসগৃহ নয়, তা' বোঝা যায়; কেমন একটা অস্বস্তিকর ভ্যাপ্‌সা গন্ধ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। একটা চামচিকে মাথার ওপর উড়ে উড়ে পোকা ধরছে!

নীরবতা ভঙ্গ করল লোকটিই প্রথম। বলল,—তুমি নিশ্চয়ই এদেশের লোক?

বললাম, না। কেন?

লোকটির কণ্ঠস্বরে এবার বেশ আগ্রহ ও উত্তেজনার আভাষ পেলাম, বললাম,—তুমি এদেশের নও? তবে কোথাকার?

—বাঙলা দেশের।

—ও!—উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ ততক্ষণে নিভে গেছে, বলল,—ঐ একই কথা। তুমি ভারতবর্ষের লোক।

—হ্যাঁ। আমি ভারতবর্ষের। তুমি?

চুপ ক'রে গেল লোকটি। বাতাস বাইরে আগের মতই হুঙ্কারে মত্ত। অন্ধকারে লোকটিকে মোটেই দেখতে পাচ্ছি না, অনুভবে বুঝতে হচ্ছে যে একটি লোকের পাশে বসে আছি।

বলল,—আমি বাইরের লোক। জাহাজী নাবিক। আজীবন জলে জলে কাটিয়েছি—সমুদ্রে সমুদ্রে। আমার কেউ কোত্থাও নেই, জলই আমার মা-বাপ,

জলই আমার ঘর, জলই আমার সব। কিন্তু জলে ভেসেও যারা মাটির স্বপ্ন দেখে, তারা আমাকে শেষপর্যন্ত পাগল সাব্যস্ত ক'রে কলম্বোতে ফেলে গিয়েছিল! আমি পালিয়ে এসেছি। বন্দর দেখলে বা জাহাজ দেখলে অন্তরটায় টান পড়ে, সব ভুলে কাছে এসে পড়ি কিন্তু আমার কাপ্তেনের হাতে ধরা পড়বার ভয়ে আবার পালিয়ে যাই। আমার কাপ্তেন বড়ো কড়া লোক। আমাকে ধরবার জন্য প্রত্যেকটি জাহাজে সে কাপ্তেন হ'য়ে বসে আছে! বুঝতে পারছ, কী ভয়ানক!

মনে মনে চমকে উঠলাম। এ যে দেখছি এসে পড়েছি এক বদ্ধ পাগলের পাল্লায়! কিন্তু এড়াবই বা একে কীভাবে? বাইরে প্রকৃতির যে তাণ্ডব চ'লেছে, তার মধ্যে গিয়ে পড়বার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

—শুনছ ত?

ভয়ে-ভয়ে বললাম,—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমি তোমাকে একটা কাহিনী বলব এবার।

মনে-মনে বললাম, কাহিনী কেন, যা খুশী তোমার, তা-ই বলো। শুধু পাগলামীটা দৈহিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত না হলেই হলো!

লোকটি বলল,—বহুদিন আগেকার কথা।

মনে মনে উত্তর দিলাম,—দেড়শো-দুশো বছর আগেকার কথা বললেই বা তোমায় ঠেকায় কে?

বলল,—ক্রুজে চ'লেছি এই ভারত মহাসাগরেই। নাবিকদের মধ্যে সবাই ইয়োরোপীয়ান, শুধু একজন নিগ্রো। দাস-হিসাবে নেওয়া হয়েছিল আফ্রিকার কোনো এক বন্দর থেকে।

—দাস হিসাবে! দাস-ব্যবসায় ত বহুদিন...

লোকটি ধমকে উঠল,—তুমি থামো দেখি। বাধা দিও না। নিগ্রোটির নাম দিয়েছিলাম আমরা—জন্। খুব খাটিয়ে নিতাম জন্‌কে। শুধুই কী খাটানো? রীতিমত অত্যাচার চলত ওর ওপর। অহেতুক নিষ্ঠুরতা। আমরা সেকেলে নাবিক, উদ্দাম আমাদের জীবন। সেই উদ্দামতা কখন যে মত্ততার মুখে চরমে উঠ্‌ত, তা' নিজেরাই জানতে পারতাম না! দিনের পর দিন—জল আর জল—যে দিকে তাকাই বিস্তীর্ণ জলরাশি! মাটির তৃষ্ণায় আমাদের সব-কিছু যেন শুকিয়ে আসছে—প্রাণমন তবু অস্থিরতায় ভরা, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটত নিষ্ঠুরতার মধ্য দিয়ে। তার ওপর আমরা যেন ঐ কৃষ্ণবর্ণ দাসটিকে মানুষ ব'লেই গণ্য করতাম না! যেন একটি পালিত অথচ অবহেলিত পশু! মন ভালো থাকলে তাকে কাছে ডেকে এনে আদরের বন্যা বইয়ে দিতাম, মন ভালো না থাকলে করতাম অত্যাচার। বর্ণনায় বাহুল্য কিছু এনে লাভ নেই, আমাদের অদ্ভুত মানসিকতা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝবে। কিন্তু যা বলছি' শোন,—সব

রকম কাজ করানো হচ্ছিল তাকে দিয়ে—স্টীয়ারিং হুইল-চালনা থেকে পাল-তোলা পাল-গুটানো পর্যন্ত!

—সে কী! পালতোলা জাহাজ!

আবার ধমক।—তুমি থামবে কি না!

মনে মনে বললাম,—আচ্ছা বাবা, বন্ধ করলাম মুখ। এই ১৯৫৩ সালের ঝড়ের রাত্রিতে ব'সে তোমার অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্পই শুনি। কল্পনা করা যাক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক সেটা। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মেজর ব্রাউনকে দিল্লীতে পাঠিয়েছে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সাক্ষীগোপাল রেখে মোগল সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু ইংরেজের দখলে আনার জন্য। কিন্তু লাসওয়ারীর যুদ্ধ পর্যন্ত সেটা সম্ভব হয়নি মোগল সম্রাটের 'ওয়াকিল-ই-মুতলাক' মহাদজী সিন্ধিয়ার জন্য। সম্ভবত সেটা ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দ;—রোহিলা গোলাম কাদের মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে সিংহাসনচ্যুত করে, এবং সে নিজে শাহ্ আলমের বুকের ওপর ব'সে ছোরা দিয়ে তার একটি চোখের তারা উপড়িয়ে ফেলে।...

চমৎকার। নিজের চিন্তাধারায় নিজেই চমৎকৃত হলাম মনে মনে! ইতিহাসের এত খুঁটিনাটি মনে আছে আমার! এত স্পষ্ট হ'য়ে!...অদ্ভুত ত! এবং সে রাত্রিতে ঐ বিচিত্র লোকটির পাশে ব'সে বেছে বেছে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের কথাই বা আমার হঠাৎ এত উজ্জ্বল হয়ে মনে পড়েছিল কেন, সেটা আজও একটা বিরাট বিস্ময় হ'য়ে আছে আমার জীবনে! কিন্তু থাক এসব ঐতিহাসিক চিন্তা, যা বলছিলাম......

নাবিক বলল,—ভারত মহাসাগরে কতো নাম-না-জানা অদ্ভুত অদ্ভুত দ্বীপ আছে! কতো জনহীন ছোট-ছোট দ্বীপ! সামুদ্রিক কচ্ছপ অথবা পাখীদের মেলা!

—তারপর?

থেমে গেল। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, বাধা দিও না। ক্রুজে চলেছি। জন্‌কে নিয়ে হুইলে আছি। ও হুইল ঘোরাচ্ছে, আমি পাশে দাঁড়িয়ে শেখাচ্ছি ওকে। ব্রীজ থেকে কাপ্তেন তার নির্দেশ জানাচ্ছে,—ডানদিকে এতটা ঘোরো—বাঁদিকে এতটা ঘোরাও। আমরা উত্তর দিচ্ছি। উত্তর আর কী, তারই আদেশের পুনরাবৃত্তি। এই-ই নিয়ম। উত্তর দিতে একটু দেরী হলেই সে খেঁকিয়ে উঠছে,—কী হে, মরে গেছ নাকি তোমরা দুজনে? কফিন তৈরী করব? না, হাঙ্গরের মুখে ফেলব!...

বাতাস নেই, পালগুলি মাস্তুলের গায়ে জড়িয়ে আছে। কিন্তু এ পাগলটা অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্প পেলো কোথা থেকে? গল্পের মধ্যে ত আবার নিজেকে ঢুকিয়ে দিয়ে ব'সে আছে!...

পাগলের খেয়াল,—অষ্টাদশ শতাব্দী আর বিংশশতাব্দী সব একাকার হ'য়ে গেছে ওর কাছে!

লোকটি শুরু করল,—মরিসাসের এক বন্দর থেকে উত্তরে রওনা হয়েছি আমরা। জন্ এমনিতে খুব ফুর্তিবাজ লোক, খুব মিশুকে আর আমুদে; সঙ্গী ছাড়া সে থাকতে পারে না। প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক শক্তিমান যুবক। হুইল ঘোরাচ্ছে আর বকবক ক'রে যাচ্ছে সাত-সতেরো রকম। আমার নিজের মনটাও হয়ত সেদিন ছিল ভালো, নইলে চড়-চাপড়-লাথিতে ওর বকবকানি অনেক আগেই বন্ধ ক'রে দিতাম। এক নিগার আমার সমকক্ষ হ'য়ে রসিকতা করছে, অন্যদের মতো আমিও তা' সহ্য করতে স্বভাবতই রাজী নই! কিন্তু, কিছুদিন থেকে কী হয়েছে, জন্‌কে খুব অসহ্য লাগছে না।

নাবিকের বিচিত্র মন! তখন আমার মনে এই ধারণাটাই দৃঢ় হ'য়ে বসতে আরম্ভ করেছে, আমার কেউ নেই, সমুদ্রই আমার সব! সমুদ্রই আমার সর্বস্ব। আমার দেশ নেই, সমুদ্রেই আমার জন্ম, সমুদ্রেই আমার শেষ হবে! বিস্মিত হয়োনা, ক্রমাগত সমুদ্রে থেকে থেকে নাবিকদের ওই ধরনেরই এক জীবন-দর্শন গড়ে ওঠে এক-এক সময়ে!

ঠিক এমনি মানসিকতার সময়েই হাতের কাছে পেলাম জন্‌কে। অম্লান বদনে ফাই-ফরমাস খাটে, আমি ওর প্রলাপ শুনে যাই দেখে, আমার বিশেষ অনুগত হয়ে পড়েছিল ও। নতুন খৃষ্টান হয়েছে, বাইবেল আর বাইবেলের ঘটনা সম্পর্কে প্রচন্ড উৎসাহ! আর একটা ধারণা ওর মনে-মনে জন্মাচ্ছে তখন,—দাসত্ব থেকে ও শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

বলতে যাচ্ছিলাম, দাস-ফাস রেখে গল্পটা ব'লে যাও ত বাপু, ইতিহাসের জাবর কেটে দরকার নেই! কিন্তু ধমক খাবার ভয়ে চুপ করে গেলাম। নাবিক বলতে শুরু করল,—জন্ সেদিন শুরু করেছে তার প্রণয়িণীর গল্প। আফ্রিকা-নিবাসী এক তরুণী। তাকে খৃষ্টান ক'রে ও তার নাম দেবে মার্থা। তোমাকে বলা কর্তব্য, এই মার্থাকে নিয়ে আমরা ওকে রীতিমত অস্থির ক'রে তুলতাম খেপেয়ি। কখনো বলতাম,—ওহে জন্, তোমার মার্থা এখন কী করছে বলো ত?

মার্থা?—একটু ভেবে জন্ বলত,—এখন বেলা পড়ে এসেছে, মার্থা এখন কুঁজো নিয়ে ইঁদারায় চলেছে জল তুলতে!

—তোমাকে ভাবছে না?

—নিশ্চয়ই ভাবছে। ভাবছে, জন্ আসবে, আমার জন্য নিয়ে আসবে একটা মেমেদের গাউন!

হো-হো করে হেসে উঠত এবার নাবিকরা। বলতো,—গাউনের যে খুব শখ!

হাসির একটা কারণ ছিল। গাউনের কথা উঠলে এই জন্যই হাসির ঝড় জাগত! জন্ একবার তার এক আলোকপ্রাপ্ত বন্ধুর স্ত্রীর গাউন চেয়ে নিয়ে এসে তার প্রণয়িণীকে পরিয়েছিল। আলোক-প্রাপ্ত বন্ধুর নির্দেশ মতোই

মার্থাকে জড়িয়ে ধরে তার স্ফীত অধরপুটে দিতে গিয়েছিল নিবিড় চুম্বন! মার্থা তার উত্তরে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ওর হাত থেকে।... ব্যাপারটা বুঝলে নিশ্চয়ই, চুম্বনরীতি ওদের মধ্যে ছিল না। জন্ পাগল হয়ে গেছে এই ধারণায় মেয়েটি কেঁদে কেটে অনর্থ করেছে, ওঝা ডেকেছে!

ডাকলাম,—জন্?

উত্তর দিলো,—জী মঁসিয়ে, সাত ডিগ্রি দক্ষিণ...

বাধা দিয়ে বললাম,—জাহাজ সাত ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখায় এসেছে তা জানি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি জন্ তার প্রণয়িণীর কত ডিগ্রি দক্ষিণে এসেছে?

জন্ হেসে ফেলল, বলল,—মঁসিয়ে...

—বলো, বলো, লজ্জা কী?

—আমি মার্থাকে নিয়ে ঐ জঙ্গল থেকে পালিয়ে আসব। এই সব নির্জন দ্বীপ. এর কোনো একটা বেছে নিয়ে দুজনে মিলে থাকব। মনের মতন ব্যবসা।

—আর কেউ থাকবে না?

—না।

—কোনো শিশুর কলকণ্ঠ?

—হ্যাঁ,—বহু শিশুর কলকণ্ঠ। একশো বছর পরে যখন তুমি জাহাজ নিয়ে যাবে এখান দিয়ে, সেই ছোট্ট দ্বীপ তোমায় অভ্যর্থনা করবে। জাঁ ব্রাঁতো পরিবার। হ্যাঁ, জন্ নিজের নাম দিয়েছিল ঃ জাঁ ব্রাঁতো।

হেসে বলেছিলাম. রাজী হবে তোমার মার্থা?

—রাজী হবে। ও আমার সব কথায় রাজী।

—বটে? আর ওঝা ডাকতে ছুটবে না ত?

সলজ্জ হেসে জন্ বলল,—না। ওঝার ভার ঘাড় থেকে নেমে গেছে। জানো? এমন বুদ্ধিমতী আর নম্র মেয়ে ও তল্লাটে আর নেই। আমি এবার গিয়ে ওকে লিখতে শেখাবো। কতো সুন্দর সুন্দর চিঠি ও আমাকে লিখবে, তুমি দেখো। ও ভারী ভাবুক আর মিষ্টি মেয়ে।

—জন্?

—বল?

—নির্জন দ্বীপে ওকে নিয়ে ত উঠবে এসে। করবে কী?

জনের চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখালো,—আমি ক্ষেত করব। চাষবাস আর পশু-পালন। খামার আমার চমৎকার লাগে। মার্থারও ভালো লাগে। মাঠের ধারে ফলন্ত ফসলের কাছে কাছে বসে আমরা কতদিন এইসব স্বপ্নের কথা বলেছি!

নাবিক হঠাৎ এই সময় অভাবিতরূপে থেমে গেল, তারপর আমাকে জিজ্ঞাসু লক্ষ্য ক'রে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল,—স্বপ্ন—স্বপ্ন—মানুষ স্বপ্ন দেখে কেন,

বলতে পারো?' জন ছিল অত্যধিক স্বপ্নিল! আমরা কথায় কথায় নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতাম,—জনের আশাবাদে এক এক সময় মনে হতো মার্থার স্বপ্নই কী ওর মধ্যে এভাবে এই দুরন্ত আশাবাদের সৃষ্টি ক'রেছে! কথাটা মনে হতেই কাঁটার মতো মনে এসে বিঁধত একটা অব্যক্ত ঈর্ষা! এবং সে ঈর্ষা যে কী প্রচণ্ড হয়ে উঠতে পারে, তা লক্ষ্য করলাম জাহাজ ডুবি হ'য়ে এক নির্জন দ্বীপের আশ্রয়ে এসে। বেঁচে ছিলাম আমরা পাঁচজন, তার মধ্যে জন্ একজন। আমরা দুমাস ধ'রে সেই পরিত্যক্ত নির্জন ছোট্ট দ্বীপটিতে প্রতিদিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি, তখনো জনের অত্যুগ্র আশার সমাপ্তি নেই।

বললাম—তোমাদের জাহাজ ডুবে গিয়েছিল?

—হ্যাঁ—নাবিক বলল,—আমাদের "L' Eclair" জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে ডুবে যায়। কাপ্তেন সুদ্ধ মারা পড়ে! বেঁচে থাকি জন্‌কে নিয়ে আমরা পাঁচজন। থার্ড মেট্‌ও বেঁচেছিল, তার পকেটে ছিল কম্পাস।

কী ভাবে যে দুমাস কাটিয়েছি ঐ নির্জন ছোট দ্বীপে, তা তোমাদের আজ বোঝাতে পারব না! এই জন্‌ই কি ভাবে যেন পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরী করে তাই দিয়ে বড়ো বড়ো সামুদ্রিক কচ্ছপগুলো মেরে নিয়ে আসত। ঐ জন্‌ই চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত কচ্ছপের মাংস, তাই আমরা প্রাণে মরিনি। পাথরের খাঁজ কেটে কেটে তাতে জমিয়ে রাখত বৃষ্টির জল, তা-ই ছিল আমাদের পানীয়। অবশ্য, অজস্র ছিল নারকেল গাছ। নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে তৈরী করে দিয়েছিল আমাদের ঘর, সে-ও ঐ জন্। এক একদিন কেউ কেউ আমাদের মধ্যে ব্যাকুল হ'য়ে কেঁদে উঠত। তখন ঐ জন্‌ই শোনাত আমাদের আশ্বাস বাণী, বলত,—ভয় ক'রো না মশাইরা! শিগ্‌গিরই জাহাজ আসবে, নিয়ে যাবে আমাদের উঠিয়ে।

বাস্তবিক, সাদা-কালোর প্রভেদ সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছিল সেই দ্বীপে,—জন্ আমাদের প্রত্যেকেরই ছিল অকপট বন্ধু!

থার্ড্ মেট্ একদিন বলল,--জানো হে, কোথায় আমরা এসেছি? সাত-ডিগ্রি ছয় মিনিট দক্ষিণ অক্ষরেখা, এবং ছাপ্পান্ন ডিগ্রি সতেরো মিনিট পূর্ব দ্রাঘিমারেখা।

আমার নোটবুকটা পকেটেই থাকত। থার্ড মেট্ আর আমাতে চার্ট দেখে একদিন হিসাব করছিলাম। পাঁচ মাইল লম্বা দেড় মাইল চওড়া দ্বীপটা হবে না? তাহলে ঠিকই মিলেছে। এর নাম কোয়েতিভি আইল্যাণ্ড, সিসেলিস্‌মাহে থেকে দেড়শো মাইল দূর। বসতি নেই, নির্জন দ্বীপ।

—সে' ত দেখতেই পাচ্ছি।

—১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কেভালিয়র দ্য কোয়েতিভি এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তাঁরই নাম অনুসারে একে কোয়েতিভি দ্বীপ বলা হ'য়ে থাকে।

জন্ এই সময় ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এলো।

—কী ব্যাপার, জন্?

—জাহাজ, একটা জাহাজ!

জাহাজ!—

পাগলের মতো ছুটলাম টিলাটার ওপরে।

পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগলাম!

জাহাজটা সত্যিই আসছে কাছে।

আনন্দে চিৎকার করতে করতে চোখে জল এসে গেল। থার্ড মেট্ ত সবলে জড়িয়ে ধরল জন্‌কে। জন্ শুধু বলতে লাগল,—আমি বলেছিলাম না? আমি বলেছিলাম না,—জাহাজ আসবেই!

"L' Hirondelle" জাহাজ একটু দূরে গিয়ে নোঙর করল। জাহাজের একটা লাইফ্‌বোট্ ভেসে এলো আমাদের নিতে। জাহাজটা ছয়দিন ছিল দ্বীপের পাশে বেঁধে। কী আনন্দে কী সমারোহেই না কেটেছিল সেই ছটা দিন! জন্ পাড়তে লাগল অজস্র নারকেল। কাপ্তেন জাহাজ বোঝাই করলেন অজস্র নারকেল আর জীবন্ত সামুদ্রিক কচ্ছপ দিয়ে। যতদূর মনে পড়ে, একাম্নোটা অতিকায় কচ্ছপ ধ'রেছিল "L' Hirondelle"।

ভোরে জাহাজ ছাড়বে, রাত্রে বিরাট উৎসব জমেছে তীরভূমিতে। নৃত্য-গীত আর পানীয়ের উৎসবে সবাই মত্ত! জন্ একা তার অদ্ভুত আফ্রিকার নৃত্যে আসর মাত ক'রে দিলো! নৃত্যের শেষে বললাম,—জন্! এই দ্বীপটা পছন্দ হয়? মার্থাকে নিয়ে এসে বাসা বাঁধো না এই দ্বীপে!

জন্ সোৎসাহে ব'লে উঠল,—ঠিক বলেছ মঁসিয়ে। আমি যে'রকম ক'রে হোক মার্থাকে নিয়ে আসব! কী চমৎকারই না হবে! জাঁ ব্রাতোঁ ফ্যামিলি!

নাবিক আবার থেমে গেল। ঝড় সমানে বইছে। বললাম,—তারপর?

এবার ধমক খেলাম না, কানে এলো অদ্ভুত কান্নাভরা কণ্ঠস্বর,—জীবনে পাপ করেছ কখনো? পাপের তীব্র জ্বালা কাকে বলে জানো?

থেমে গেল বাইরে ঝড়ের হুঙ্কার। ভিতরের চামচিকেটা পোকা ধরতে ধরতে আমার কানের পাশ দিয়ে এক সময় স'রে গেল যেন! নাবিক বলল,—মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতম ব্যবহারই বোধহয় সব থেকে বড়ো পাপ। তোমরা আধুনিক মানুষ, তোমরা কী বলো?

—বর্বরতা সমানে চ'লেছে। রকমটা বদলেছে মাত্র।

—ঠিক বলেছ, এ বদলায় না। যীশুখৃষ্টরা আসে, বুদ্ধরা আসে,—তবু এ বদলায় না! বর্বর পশুটা ফাঁক পেলেই মানুষের রূপ ধ'রে সামনে এসে মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ায়! ওঃ, কী ভয়ানক!

—কি হ'লো নাবিক?

—ঈর্ষা—ঈর্ষা! আমাদের ঘর নেই—ঘরণী নেই—শুধু জল আর জল!

সেই আমাদেরি মধ্য থেকে এক সামান্য কাফ্রী 'শ্লেভ্' কি না স্বপ্ন দেখছে ঘর বাঁধবার! দেখছে সুমধুর সফলতার স্বপ্ন! আমাদের অন্তর-কন্দরে জেগে উঠলো সেই ভয়াল হিংস্র পশুটা!...

একটু থেমে আবার সে ব'লে উঠ্‌লো,—জানো কি হ'লো? "L' Hirondelle" নোঙর তুলেছে, শেষ লাইফবোট্‌টায় আমি, আর আরও তিনজন। জন্‌কে নারকেল পাড়বার ছল করে গাছে উঠিয়ে আমরা জাহাজে ফিরে আসতে লাগলাম। জাহাজ ওকে ঐ নির্জন দ্বীপটিতে একা রেখে পৈশাচিক আনন্দে ফিরে চলে গেল!

—কী বলছ, তুমি!

—ঠিকই বলছি, বন্ধু। রাত বোধহয় শেষ হয়ে আসছে। আমাকে সব কথা খুলে ব'লে যেতে দাও, শান্তি পাচ্ছি না।

জন্ চীৎকার করতে লাগলো তীরে দাঁড়িয়ে! ভয়ার্ত চিৎকার। আমরা তখন নিষ্ঠুর বর্বর আনন্দে মত্ত। বললাম,—তোমার মার্থাকে ডাকো! জাঁ ব্রাতোঁ ফ্যামিলি! হোঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ!...

কেউ কেউ বলল,—ড্যাম, নিগার!

জাহাজে ফিরে এসে সবিস্তারে আমরা আমাদের নিষ্ঠুরতার গল্প করেছি—সকৌতুকে। সবাই সমান আনন্দে তা' উপভোগ ক'রেছে! শুধু কাপ্তেনের দূরবীনটা নিয়ে একবার আমি দেখেছিলাম,—জন্ পাথরের মূর্তির মতো টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে!...আজ তার ঐ ভঙ্গিটির কথা ভাবতে গেলে এই কথাই মনে হয়,—যে মানুষকে এতো ভালবাসত,—সে সেদিন সেই মুহূর্তে সমস্ত বিশ্বাস আর ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছিল সেই মানুষের ওপর থেকে!

মাহে—সিসেল্‌সে এসে বেশ কেটে যেতে লাগল দিন। শুধু হারিয়ে ফেললাম নাবিকের জীবন। নাবিকরা যে কী ভীষণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন তা' বোধহয় জানো না,—জাহাজ ডোবা নাবিক শুনে কেউ আর জাহাজে কাজ দিতে রাজী হয় না। তাই সিসেল্‌সেই বসতি স্থাপন করলাম বলা যায়। সে' আরেক কাহিনী। পুরো এক বছর কেটে গেল, কিন্তু কী যে হলো আমার, প্রতি মুহূর্তে মনে পড়তে লাগল জন্‌কে। সে কী করছে ঐ দ্বীপে? বেঁচে আছে ত? কেমন চলছে তার জীবনযাত্রা? মার্থাকে সে কী আজো ভাবছে—আজো সে কী তেমনি দুরাশা নিয়ে ব'সে আছে যে একদিন জাহাজ আসবে তাকে নিতে, তার মতো এক সামান্য নিগ্রোকে তুলে নিতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবে—জাহাজ? মনুষ্যত্বে কী সে এখনো বিশ্বাস হারায়নি?

অনেক চেষ্টার পর এক মাছধরা জাহাজে কাজ যোগাড় ক'রে ছিলাম! বেশী

দূরে নয়, কাছে-কাছে যায়, একবার ভারতের উপকূলও ঘুরে গিয়েছিল। এই জাহাজ সেবার হঠাৎ গেল কোয়েতিভি দ্বীপে।

সাগ্রহে বললাম,—দেখা পেয়েছিলে তার? বেঁচে ছিল ত?

—ছিল! টিলার ওপরে উঠে চিৎকার করতে লাগলাম,—জন্—জন্!

প্রত্যুত্তরে শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো পাথরের আড়াল থেকে। কোনক্রমে আত্মরক্ষা ক'রে বলে উঠলাম,—জন্—আমি!...

হাতে বুমেরাংয়ের মতো একটা পাথরের অস্ত্র, জন্ এসে দাঁড়ালো সামনে, আবির্ভূত হলো বলাই বোধহয় সমীচীন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মুখে দাড়ি, লম্বা চুল,—চোখ দুটি জ্বলছে ভাঁটার মতো। একেবারে পুরোপুরি আফ্রিকার জংলী নিগ্রো! ভয়াবহ—ভীষণ সেই রূপ!

বললাম,—ক্ষমা করো জন্।

'ক্ষমা' শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে এলো! চোখে তার অপরিসীম ঘৃণা। বললাম,—চলো আমার সঙ্গে।

সে উত্তর দিলো না, সেই তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করতে লাগল আমাকে নীরবে। তবুও বললাম—জন্, তোমার মার্থাকে কী ভুলে গেছ? তাকে কী তোমার চাই না? চলো তার কাছে। সেই ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল জন্। শুধু মুহূর্তের জন্য চোখের একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম।...

হ্যাঁ বন্ধু, ফিরে আসতে হয়েছিল সেবার একাই। বুঝেছিলাম, মানুষের প্রীতি, ভালবাসা,—সব-কিছুতেই জন্ আস্থা হারিয়েছে। ওকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না!

বহু বছর কেটে গেল আমার সিসেল্সে। মানুষের স্বার্থপরতা, অর্থ-গৃধ্নুতা, হিংসা আর মত্ততা দেখেছি, আর মনে পড়েছে জন্‌কে। ওকে কিছুতেই ভুলতে পারিনি।

আমার মনের এই অবস্থাটা তোমরাও বুঝবে। যখন মনুষ্যত্বের দরজায় মাথা কুটে মরবে, প্রতি পদক্ষেপে মানুষ যখন তোমাকে হিংসা করবে, তীব্র মানসিক যাতনায় অস্থির ক'রে তুলে পৈশাচিক আনন্দে হাসির লহর তুলবে, তখন তোমাদেরও মনে পড়বে সভ্যতান্বেষী সেই আফ্রিকার নিগ্রো জন্‌কে!

—তুমি আর দেখেছিলে তাকে?

—আর একবার। কোয়েতিভি দ্বীপ। একটা গুহার কাছে সে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। বহুদিন থেকেই শুয়ে আছে বোধহয়। মাটি তাকে মায়ের মতো বাহুবেষ্টন ক'রে ধ'রে আছে। একবার ভেবেছিলাম,—নিয়ে আসি বুকে ক'রে তুলে তার সেই শুভ্র অবশিষ্টাংশটুকুকে। কিন্তু কেন যেন মনে

হলো,—একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য প্রসন্নতার ভঙ্গীতে সে শুয়ে আছে,—তার সে শান্তি ভঙ্গ করার অধিকার আমাদের কারুর নেই!

ভোর হয়ে গেছে কখন। ঝড় থেমে গেছে। আচ্ছন্নতা থেকে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি ব'সে আছি একটা জীর্ণ কবরের পাশে। গা'টা ছমছম ক'রে উঠল। কে আমার পাশে ব'সে আমাকে গল্প বলল সারারাত?

পরে জেনেছিলাম—এ এক নাম-না-জানা পুরোনো নাবিকের কবর।

কিন্তু গল্পটি যেই বলে থাকুক, তার কথামতো সত্যই অত্যাচারিত নিগ্রোটিকে আজও ভুলতে পারছি না। এই ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা আর স্বার্থপরতার যুগে তাকে ভুলব, সে অবকাশই বা কই?

পাশের বাড়ির মেয়ে

লীলা মজুমদার

কাল আমাদের বাড়িতে পাশের বাড়ির গিন্নি এসেছিলেন। আমি রান্না চাপাচ্ছি, মেজাজটা খুব ভাল নেই, ঠাকুরের শরীরটা কদিন ভাল যাচ্ছে না। নিজেই রান্না করছি। মনে দারুণ সন্দেহ ব্যাটার বোধহয় আসলে কিছুই হয়নি এমন সময়ে পাশের বাড়ির গিন্নি এসে দোরগোড়ায় দাঁড়ালেন।

মাছগুলো ছেড়ে দিয়ে, ফিরে একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালাম, মুখখানি যেন তেলো হাঁড়ি, ভাঁড়ের দুধ দই হয়ে যাবার জোগাড়। শুধোলাম—

"ওকি, আবার কি হল?"

জলচৌকির উপর বসে পড়ে বললেন—"দিদি, মনটা বড় খারাপ।"

বললাম, "সে কি! অনিলবাবু ভাল আছেন, ছেলে পাশ করেছে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, জায়গাজমি কিনেছেন, মন ভালো হয়ে গেছে বলুন।"

বিষম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—

"না, হাসির কথা নয়. ছেলে মেয়ে জায়গাজমি দিয়ে কি হবে? জানেন নুটুর ভূগোল বইতে কি সাংঘাতিক কথা পড়ে এসেছি?"

মাছে অল্প একটু জল ঢেলে. তার উপর কুচি কুচি ধনে পাতা আর আস্ত আস্ত কাঁচা লঙ্কা ছেড়ে বললাম,

"এ্যাঁ, তাই নাকি? ভূগোল আবার কি বলে?"

বললেন,

"উঃ, জীবনে আমার সব স্পৃহা চলে গেছে। আপনি জানেন যে পৃথিবীটা ক্রমে ঠান্ডা হতে হতে একদিন একেবারে হিমশীতল বরফে ঢাকা মরুভূমিতে পরিণত হবে? তখন এই সব প্রাসাদ. মন্দির, কৃষ্টি, শিল্প. বিজ্ঞান, কাব্য, এ সবের কি হবে?"

হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন. "আমাদের পুতির-পুতিদের কি অবস্থা হবে ভেবেও যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে!"

মাছটা নামিয়ে রেখে দিলাম—"কি আপদ! এই ভেবে এত কষ্ট পাচ্ছেন? আপনি জানেন না এ্যাটম বোমা দিয়ে সব কৃত্রিম উপায়ে গরম করা হবে?"

"আঃ! বাঁচালেন দিদি! সত্যি এম্ এ পাশ করার কত সুবিধে? যাই, এবেলার রাঁধাবাড়ার জোগাড় করি গে, সারাদিন ভেবে ভেবে আর কিছু করে উঠতে পারিনি।"

এমনি ধারা ঘটনা প্রায়ই হয়। হয় তো রাত্রে একটা বই নিয়ে নিরিবিলি একটু বসেছি, দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালেন, ভারি চুপচাপ ঠান্ডা মানুষটি এদিকে। আদর করে বসাই, কান পেতে থাকি আবার কি নতুন চিন্তা এল। বললেন—

"দিদি, ঘরকন্নার উপর কখনো আপনার ঘৃণা ধরে যায়?" বললাম—"তা আর যায় না? অনেক সময়েই যায়। কাঁচের বাসন ভাঙলে, ছেলে অঙ্কে ফেল করলে, ধোপা দেরী করে এলে, ননদ এসে দু মাস থাকলে, হঠাৎ জিভ কামড়ে গেলে, ওর সঙ্গে খিটিমিটি লাগলে, সত্যি বলছি, এই সব বলতে বলতেই আমার সংসারের উপর একটু একটু ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে।"

তিনি বললেন—

"না, দিদি; আমি ওরকম ঘৃণার কথা বলছি না। আপনার কি কখনও মনে হয় না যে যীশু, শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস, এমন কি স্বয়ং আমার গুরুদেব, কেউ দুনিয়াটাকে যখন ভালো করতে পারছেন না, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই? যেদিকে তাকাবেন খালি পাপের গন্ধমাদন, ঠগ জোচ্চর নিষ্ঠুর দুষ্টু লোকরা চারিদিকে আনন্দে বিচরণ করছে আর ভালো লোকরা কষ্ট পাচ্ছে?"

আমি চমকে উঠে বললাম—"এই রে! পাপের গন্ধমাদন বলতে মনে পড়ে গেল, আমার ছোট ভাজ আবার আমার কাঁচি নিয়ে গিয়ে ফেরৎ দেয়নি। ধর এবার ওকে ঠেসে।"

উঠেই পড়ি।

ভদ্রমহিলা আগে বোধহয় খুব মাছের মুড়োটুড়ো খেতেন, নইলে চিন্তা করবার এত শক্তি পেলেন কোথায়? একদিন এসে বললেন—

"দিদি, একটা বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। এই যে কারো ছেলে হ'ল, মেজ-পিসিমার নাতনী হ'ল, অমলা কমলা দুজনারই ছেলে হ'ল, রমেনের বৌ-এরই বা হতে কতক্ষণ, এই এতগুলো লোক বেড়ে গেল, তার বদলে কই কেউ তো আমাদের মলনা? তা হলে কি করে চলবে? পাঁচটা জন্মাবে আর বড় জোর একটা মরবে, এমনিতেই শুনি রেশনের বাজার, কিছু পাওয়া যায় না, তাহলে শেষ পর্যন্ত ওনাকে কি করে পেট ভরে খেতে দেব?"

আমি বললাম,—"কি মুস্কিল! আপনার যে ভাবনার আর অন্ত নেই। এই বিষয়ে অনেক বড় বড় পণ্ডিতরা আগেই গবেষণা করে রেখেছেন। আপনি কিছু চিন্তা করবেন না, দেখবেন ঐ অমলা কমলার ছেলেপুলেরা হয় জলে ডুবে, নয় বোমা পড়ে, নয় গাড়ী চাপা পড়ে, নিশ্চয় অল্পদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তাছাড়া শীগগির দেখবেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই এইটুকু জায়গায় এতখানি ধান গজানো হবে, সবাই খেয়েপরে সুখে থাকবে।"

"তাই বলুন।" নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে যান।

(সু. ৫-১৪) লীলা মজুমদার

পরদিন সকালে আবার এসে উপস্থিত।

"দিদি, কাল যে অমলা কমলার ছেলেদের শীগগিরই মারা যাবার কথাটা বললেন, কথাটা ঠিকই। বোধহয় কয়েক বছরের মধ্যে গাড়ি চাপা পড়ে ওরা মরবে। খবরের কাগজে দেখলাম গত একশো বছরের মধ্যে আমেরিকার লোকরা যুদ্ধে যত না মরেছে, গাড়ী চাপা পড়ে মরেছে তার চেয়ে ঢের বেশি। আমাদের দেশের লোকরা তো আরও আনাড়ি। ভাবছি অমলা কমলাকে জানিয়ে দেব কিনা। ওরা আবার ছেলেদের নামে কি সব কাগজ কিনে রাখবে বলছিল। মরেই যখন যাবে তবে আর পয়সা নষ্ট কেন?"

ব্যস্ত হয়ে বললাম, "না, না, অমন কাজো করবেন না, কে জানে হয়তো অমলা কমলার ছেলেরাই বেঁচে থাকবে, আমরা সবাই মরে যাব, কিছুই তো বলা যায় না।"

কোনও রকমে তাঁকে ঠাণ্ডা করি।

আরেকদিন আমিই একটু আঠা চাইতে ওঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম। দেখি গিয়ে বাড়ীর যা অবস্থা সে আর ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জিনিসপত্র এদিকে ওদিকে ছড়ানো, চারধারে ধুলো ঝুল কালি, বুঝলাম নিশ্চয় কোনো দারুণ চিন্তা এসেছে। তিনতলার ছাদে গিয়ে দেখলাম হাসি হাসি মুখ করে আকাশের দিকে চেয়ে বসে আছেন। তবুও ভালো। আমাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ে পড়ে বললেন—

"দিদি, দিন, দিন, চারটি পায়ের ধুলো দিন। আজ আমার মনটা যে কি খুসি সে আর কি বলব!"

জিজ্ঞাসা করলাম—"কেন বলুন তো? আমি আবার কোথাও আমার আঠার শিশি খুঁজে পাচ্ছি না, বলে খুব মন খারাপ করে এসেছি।"

খুব হেসে আমাকে আঠার শিশি দিলেন, দিয়ে বললেন—"না, দিদি, এখনি যাবেন না, বসুন একটু মিষ্টিমুখ করে যান। আজ বড় আনন্দের দিন।"

কি আর করি, হাতে তেমন কাজও ছিল না, বসে রসগোল্লা টস্‌গোল্লা, খেলাম। বললেন—

"জানেন, ভেবে ভেবে পৃথিবীর সব দুঃখ দূর করে দেবার উপায় ঠিক করে ফেলেছি। এত সহজ উপায়টা যে এতোদিন কারো কেন মনে হয়নি তাই ভাবি।"

অবাক হয়ে বললাম—"তাই নাকি! সবাইকে শিখিয়ে দিন তাহলে।"

"শেখাবার কিছু নেই, পৃথিবীতে কেউ যদি বিয়ে না করে, সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, তা হলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল! সংসারে লোকই থাকবে না, তবে আর কষ্ট পাবে কে? হাসছেন, দিদি, ভাবছেন বুঝি ঠাট্টা করছি। এই দেখুন, সত্যি সত্যি আমার ননদের ভাবী বেয়াই বাড়ীতে চিঠি লিখেছি, এ চিঠি বেয়াই পেলে, কক্ষণই ননদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এমনি করে

একটু একটু করে, দুঃখের সম্ভাবনা দূর করত হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকি দিদি, চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন যে।"

ভদ্রমহিলার স্বামীর সঙ্গেও আলাপ আছে আমাদের, দিব্যি মোটাসোটা হাসিখুসি মানুষটি, চোখে একটা দুশ্চিন্তার ছাপ। একদিন বললেন—"দেখুন, আমার গিন্নির হাজার রকমের চিন্তা, কিন্তু আমার ঐ একটিমাত্র চিন্তা, গিন্নির চিন্তাগুলো যাতে কাজে পরিণত না হয়, এই এক চিন্তা। জানেন, কাল আমাদের একটা বড় ফাঁড়া কেটে গেছে!"

বললেন—"ভালো চিন্তাই বলুন আর মন্দ চিন্তাই বলুন, চিন্তাতে আমাদের বড় একটা এসে যায় না। আর শুধু আমাদের কেন, পৃথিবীতে কারই বা এসে যায়। যদি যেত, তবে এত ভালো লোক এত সব ভালো ভালো চিন্তা করে যাওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াটার এ দুর্দশা কেন? গিন্নি যতক্ষণ শুধু চিন্তা করেই ছেড়ে দেন, আমরা একটুও মাইন্ড্ করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে যখন উনি চিন্তাগুলোকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন, তখন আমরা বাড়ীশুদ্ধ সকলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি।

"বুঝলেন, কাল দেখলাম একটা নতুন চাকর এসেছে, কদমছাঁট করে চুল ছাঁটা, খাটো একটা নীল হাফপ্যাণ্ট আর ময়লা গেঞ্জি গায়, চোখ দুটো নাকের পাশ ঘেঁষে বসান, সব সময় চারিদিকে চাইছে। দেখেই আমার দারুণ সন্দেহ হল। গিন্নিকে বললাম,

'ওকে কোথায় পেলে? ও যদি পাকা চোর না হয় তো কি বলেছি!' গিন্নি অবাক্ হয়ে বললেন—চোরই তো!' চোর বলে কি ফেলে দেব? জেলে দিয়ে, শাস্তি দিয়ে, ঘেন্না করে, কোন চোরকে কখনো ভালো করা গেছে? চাকরি দেব না তো কি! ও বেচারা কি আবার চুরি করে খাবে? জানো ও সাতাশবার জেল খেটেছে, তবু ওর স্বভাব বদলায় নি? জেলের দারোগাবাবুর বৌ-এর কাছ থেকে আমার শোনা। তাই ওকে ডেকে নিয়ে এসেছি। এ বিষয় আমি অনেক চিন্তা করেছি, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। তুমি খালি আপিস যাও আর পয়সা রোজকার কর, তাই তুমি চিন্তা করবার সময় পাও না, নইলে বুঝতে আমি ঠিকই বলছি। আজ রাত্রে তোমার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি আর ফাউন্টেন পেন টেবিলে রেখে, দরজা খুলে শোব। দেখো, কিছু হবে না। বরং ওর একটা অনুতাপ আসবে। কত ভেবেছি এ বিষয়।"

বললাম—"আমার সোনার বোতাম, হাতঘড়ি, ফাউন্টেন পেন এ সম্মানের যোগ্য নয়। তোমার সোনার মাকড়ি দিয়েই পরীক্ষা হোক. আর কিছু দিয়ে নয়।"

তাই গিন্নি করলেন শেষ পর্যন্ত। আর সে কি ঘুম, খাটে শোয়ামাত্র ভোঁস ভোঁস নাক ডাকা। কি বলব মশায়, আমারি চুরি করতে ইচ্ছা করছিল। চুপ করে মটকা মেরে পড়ে আছি। আর পা টিপে টিপে বাছাধন ঘরে ঢুকেছেন,

যেই মাকড়ি পকেটে পুরেছেন, আমিও লাফিয়ে উঠে, তাকে জাপটে ধরে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে লোক জোগাড় করেছি। তারপর জেলের ছেলে আবার জেলে!"

একটু থেমে, একটা পান মুখে পুরে, ভদ্রলোক অল্প হেসে বললেন—"গিন্নির চিন্তাশক্তিকে আজ হার্নেস করে ফেললাম মশাই। উনি আসছে বছর স্কুল ফাইনেল পরীক্ষা দেবেন। অঙ্ক আর সংস্কৃতের মাষ্টার ঠিক করেছি। এখন উনি, চিন্তা করবার বিষয় পেলেন—নর-নরা-নরো আর একটা বাঁদর একটা তেল মাখানো বাঁশ বেয়ে এক মিনিটে তিন ফুট ওঠে, পরের মিনিটে দেড় ফুট পিছলে পড়ে! আচ্ছা তবে আসি।"

ছেঁড়া তমসুক

সমরেশ বসু

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিদ্রূপময় অথচ নির্বিকারভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, "ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।"

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। মফস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ও অন্যান্য দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড়টা একটু বেশী। কারণ দোকানপাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত ত আছেই। তারপর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকানপাট কমে এসেছে।

আকাশে কুয়াশা, তারাগুলি মরা চোখের মত নিষ্প্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা উলঙ্গবাহার শাড়ির মত একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি ফাদার' ষাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুরেরা আর মানুষেরা গরম আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকায়, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু-ছাদ, পোকা-খাওয়া কড়ি-বরগা আর চুন-বালি-খসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তখন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের উপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মত। সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউন্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেল-করা, ভেগে-পড়া কিংবা পড়তে-না-পাওয়াদের ভিড়ই বেশী। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যাণ্ট, ছেঁড়া জামা, উসকোখুসকো চুল আর পুরোপুরি খেতে না-পাওয়া মুখের একটা লেপটা-লেপটি দঙ্গল। অবশ্য এদের মধ্যে এদেরই দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভরপেট খাওয়া সুস্থ বন্ধুবান্ধব যে না দেখা যায় তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। খাপছাড়া, করুণা-করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি এস পি, আর এস পি, স্কুল-কলেজ মিউনিসিপ্যালিটি, খুন-জখম-মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-

ব্যাজনা-থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত। চেঁচামেচি উত্তেজনা ত আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাতিও যে নেই, তা নয়। মাঝেমধ্যে ছুরিও বেরিয়ে পড়েছে রুদ্ধ হুঙ্কারের মধ্যে। হয়নি যদিও, তবু খুনোখুনির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কান্নাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তখন বেজায় জমজমাটি। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া দুটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডী নেই একজনও।

গণেশ-কাফের মালিক গণেশও আড্ডার শরিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘরটায়, সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় একটি নরক-গুলজার-করা প্রেতছায়ার মত দেখাচ্ছিল সবাইকে। নানান রকমের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিত্ত-নৈমিত্তিক পুরনো খবর বলার মত, হেসে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, "সেই, কলোনি-পাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাড়ুজ্যের মেয়ে আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।"

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়াগুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটুনোর মত অনড় নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল, "কী ভাবে?"

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, "আজ বিকেলেও ত দেখেছি।"

আর একজন, "হ্যাঁ, এখানেই ত দেখেছি সন্ধের সময়।"

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুজন। চব্বিশ-পঁচিশের বেশী কারও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ আজই সন্ধেয় সে ছিল। কিন্তু কীভাবে মারা গেল? কোথায় আছে?"

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, "নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল লাইনের ওপরে।"

"রেল লাইনে?"

"হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাছ থেকে—"

"সুইসাইড নিশ্চয়? নইলে সেখানে রাত্রিবেলা কে যায়?"

ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে।

তারপরেও গণেশ কাফের নিচু-ছাদ ঘরটা খানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, "আশ্চর্য! কিছু বোঝা যায় না আজকাল।"

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "সত্যি! আর এই রেল লাইনটা যেন কী মাইরি।"

কেউ কেউ উঠল। বলল, "যাই, দেখে আসি।"

সেই তিনজন তখন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পেঁছেছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার সুযোগ পায়নি একটি গাছের জন্য। গুটি তিনেক টিমটিমে রেল-লণ্ঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চলাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় ঘিরে রয়েছে ফোর্থ লাইনের একটা অংশ।

ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়েই একই সঙ্গে চোখাচোখি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত তিন জোড়া চোখ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করছে, এটা বিজুই ত?

হ্যাঁ। বিজুই। চোখ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজলীকে। ঠিক ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ান রুক্ষ দীর্ঘ বেণীটা পুরোপুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে, কিন্তু মাথা সুদ্ধু লাল ফিতে স্লীপারের উপর। মাথাটা লাইনের মধ্যে, শাড়ি-জড়ানো দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপর যেন প্রায় কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।

রেল-লাইনের টিমটিমে আলো বিন্দুর মত চিকচিক করছে বিজলীর চেয়ে-থাকা স্বচ্ছ চোখে। হা-মুখটা খোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্তটিপটা জ্বলজ্বল করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে খয়েরী-ডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে। কোথাও যেন এতটুকুও অবিন্যস্ত হয়নি। কেবল বাঁ পায়ের থেকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, ঘুমন্ত যে-রকম উঠে যায় মানুষের। হাতের লাল কাচের চুড়িগুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকীগুলি সবই আস্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে খয়েরী ডোরা কাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল ব্লাউজের বুকের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যেই শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।

তা ছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সঙ্গে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখুনি বিজু ওর বিজলী চমক হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে, চমকে দেবে সবাইকে। যে-হাসিতে এই মফস্বল শহরের সবাই কোনও না কোনও দিন একবার চমকেছে।

বিজু, হ্যাঁ বিজুই। কলঙ্ক যার অঙ্গের ভূষণ ছিল। যে-কলঙ্কিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চির-কালের টোপ-ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে কিন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়ো কিংবা পড়তে

পড়তে সরে-পড়া রথো দুর্বিনীত ছেলের সঙ্গে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মত। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে হেসে, শহরের গায়ে জ্বালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলে-কাটা মেয়েটা।

গণেশ কাফের ওই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা রথো ছেলে, যাদের সঙ্গে বিজুকে দেখা যেত সবসময়। তাদের তিনজনেরই চোখের দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাসের মত আরও উদ্দীপ্ত। একটা মহাশূন্যের মত অশেষ বিস্ময় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোখগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।

বিজু বিজুই ত। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সঙ্গে গণেশ কাফেতে ছিল। যার কথায়, হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা পড়ার ছায়াও দেখা যায়নি।

তবে?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ হুঁ-উ-উ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, "বড্ড বাড়িয়েছিল। বোঝ এবার।"

তিনজোড়া চোখ সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের দিকে ছুটে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মত। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-লণ্ঠনগুলি বিজলীর কাছে নামান। বিজলীকে ঘিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

অচেনা আর চেনা লোকের গুঞ্জন একইভাবে চলছে। কে? কার মেয়ে? ও! সেই মেয়ে? কী হয়েছিল?

বুঝে নাও! হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়।

হবে, জানা-ই ছিল।

বিজলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজুর দিকে ওঁর চোখ নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজলীর লাস কিংবা লাস দেখতে আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স হয়েছিল আপনার মেয়ের?"

"তেইশ।"

"বিয়ে দেননি কেন?"

দারোগার মতই প্রশ্ন। রাধুবাবু বললেন, "সঙ্গতি ছিল না।"

"হুঁ। কী হল হে, লাস বাঁধ।"

একটি সেপাই জবাব দিল, "বাঁশ নিয়ে জমাদার আসছে স্যার।"

"হুঁ।" দারোগা আবার বলল, "থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে?"

"ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই!"

“উঁ, তা হলে বলছেন, কোন চিঠিপত্রই রেখে যায়নি?”

“না।”

“আঁ-হা! দেখবেন মশাই, চেপে টেপে যাবেন না, পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন।”

রাধুবাবু যেন ধরা-পড়া চোরের মত অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজলীর ওপর।

লাস বেঁধে নিয়ে যাওয়ার লোকেরা এল।

ওরা তিনজনে এগিয়ে গেল রাধুবাবুর কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোখে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুরির মত চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাবুর কাছে তারা জানতে চায়, কী হয়েছিল।

কেন মরেছে বিজলী।

রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপি চুপি, “এই যে শঙ্কর আর নরেশ এসেছ। ও, প্রভাতও এসেছ?”

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন। তারা জানতে চায় তাদের, হ্যাঁ তাদের বিজু যে হাসতে হাসতে এসেছিল ‘গণেশ কাফে’ থেকে, সে কেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে।

রাধুবাবুও ওদেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে দেখা গেল, ওঁর কোল বসা চোখ দুটি সর্দি-জ্বরের মত ভেজা ভেজা লাল হয়ে উঠছে। দাঁতহীন ঠোঁট দুটি চাপছেন বারে বারে। বললেন, “কিছু জানিনে। বিজুর তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না?”

শঙ্কর নরেশ আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে? তবে কে বলবে? কে জানে?

তিনজনেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজলীর উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। যেন নইলে ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজলীর শ্যামলী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজলী এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি—জু! বি—জু!

জমাদারেরা লাস কাপড়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাকল, “আসুন রাধুবাবু।”

ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। একদল লেগে-থাকা মাছির মত চলল জি আর পি পুলিশ অফিসের দিকে লাসের পিছু পিছু।

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আরও খানিকটা উত্তরদিকে গিয়ে, আঁশশ্যাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অন্ধকার রেল-পুলটার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিংএর উপর ভর দিয়ে, ঝুঁকে দাঁড়াল।

জংশন স্টেশনের সর্পিল লাইন ক্রমশঃ এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে দূরদূরান্তর।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলছে।

ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর কিছু গ্রাস করে ফেলছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

কেবল নরেশ দম নিয়ে নিয়ে বলল, "বিজু-বিজুটা..."

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রোজকার মত আজকেও বিজু কেমন খিলখিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝিঁ'র চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই যেন বাজতে লাগল। তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর হয়ত এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। হয়ত এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই খিলখিল হাসিটা হয়ত রেল লাইনের লোহায় বেজে উঠবে। কেননা, বিজুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

ওদের তিনজনকে এখন যে-কোনও লোক পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত। যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোন সর্বনাশের মতলব আঁটছে। ওদের ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড় উসকো-খুসকো চুল, সর্বোপরি ওদের রক্তাভ চোখে কুটিল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণি-হারা অজগরটার মত দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ যখন বিজু এল বিকেলে, ওরা বললে, "বিজু তুমি লেট।" বিজু বললে, "এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না।" ওরা বললে, "কেন?"

বিজু হেসে বললে, "বা রে, আমার বুঝি বে-থা হবে না। তোমাদের তিন-জনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে?" বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওকথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হ্যাঁ। লেট বিজুর প্রায়ই হত। মনে কোনও রাগ থাকলে. কিংবা এমনি রহস্য করেও কতদিন বলেছে, "আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।" এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোন অভাব হয়নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ-দেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হল? ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে গিয়ে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কপাল কেটে কুটে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে, "কেন, কেন বিজু?"

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইল রেলিং-এ। কেননা, কপাল ফুটে রক্ত-গঙ্গা করলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই দিনগুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জি ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোচ্ছল প্রাণ আর চোখে স্বপ্নের কাজল। যখন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মত, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রানীর স্তুতি করত ওরা বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায়নি প্রিন্সিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মত শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। যে-হাসিটা তখন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মত ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলঙ্কিনী ভেবেই ওদের বিদ্রোহ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ছাত্র-জীবনের যেখানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নৌকোটাই ছিল তলা-ফুটো। জীবনে যে-ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন-লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-খ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে-কথা ওরাও জানে না।

আর কে এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোন একদিন ওরা একটু মস্তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাও ওদের মনে থাকত না, যদি না তিনবছর আগের এক সন্ধ্যায়, শহরের দক্ষিণে, নিরালা রেল-কালভার্টের উপর দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীর চোখের কোলে সেদিন গভীর পরিখা। চোখ দুটি বড় বেশী ভাসা ভাসা, করুণ। মুখখানি শুকনো। হাত ভরতি বাদাম ভাজা। মুখেও দু-একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্তে বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পর-মুহূর্তেই সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, "আপনারা এখানে?"

বিজলীকে দেখা মাত্র ওদের তিনজনেরই জিভ্ চুলকে উঠেছিল বিদ্রূপ করার জন্যে। মনে মনে তৈরি হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।

কিন্তু বিজলীর কালো চোখ দুটিতে কী জাদু ছিল, ওদের ইচ্ছে পূরণ হয়নি। বরং সেই কুখ্যাত দুর্বিনীতেরা বিজুর গায়ে-পড়া আলাপে যেন একটু থিতিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, "এমনি।"

কিন্তু একটু রহস্যের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছিল বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, "আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।"

বলে হাতের মুঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, "নিন, বাদাম খান।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করে, বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোসের ছাপ। ছেঁড়া জামা কাপড় আর উসকো-খুসকো চুলে তিনজনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোখে মুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চায় মেয়েটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি, ওই অদূরের সাইডিংএর পাশে থাক-দেওয়া রেলস্লীপারগুলি সরাতে এসেছে ওরা? কেন না, স্লীপারগুলি একটি কাঠের গোলায় পেঁছে দিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাই, নইলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অন্য-কোন রাস্তা ওরা আবিষ্কার করতে পারেনি।

কিন্তু বিজলী ওদের কিছুই বলেনি। শুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোঁটের কোণে। বলেছিল, "চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।"

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা? পা ঘষছিল তিনজনেই।

বিজলী আবার বলেছিল, "চলুন।"

আশ্চর্য! সে-ডাক ওরা ফেরাতে পারেনি। যেন কোন্ সুদূর আবছায়া থেকে এক বিচিত্র রহস্যময়ী তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই গণেশ কাফের আস্তানায়। আর নিজের খিদের নাম করে এক রাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এক্স আর এর ক্লাস টেনের মেয়েটাকে পড়াই। আজ মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তখন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল কালভার্টের কাছেই টি এক্স আর এর কোয়ার্টার। তাই বিজু তাদের দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন।

ওরা লোভীর মত খেয়েছিল। জানত, রাধু বাঁড়ুজ্যের এক পাল পুষ্যি-খিকথিক ঘরে কানাকড়িটি না থাকলেও বিজলীর অভাব নেই। তার মেলাই মক্কেল।

খেতে খেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "কলেজের খবর কী?"

বিজু ছোট মেয়েটির মত এক মুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"টাকা নেই।"

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। কিন্তু এ-কথাও

সবাই জানত, ব্রজেন পালের মত কাপ্তেন থাকতে, বিজলীর কোনও অভাব নেই। উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু নকুড়ের মতে, সে ত ভগবানের হাত। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পালবংশে কলেজের মুখ দেখা সে-ই ত প্রথম। অতএব, বি এ পাশ করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী? নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই ত গাধা একদিন ঘোড়ার মত হ্রেষাধ্বনি করতে পারবে।

সেই হ্রেষাধ্বনিরই বাসনায়, খুরেমোরা নাল থেকে মাথার শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত পোশাকে আশাকে ব্রজেন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তখন। আমেরিকান কাট কোট প্যাণ্টের পকেটে তার উৎকৃষ্ট টাকা বাজত ঝনঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাঁড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হত, বিজলীর শাড়ি ব্লাউজ, বই-ফাউণ্টেনপেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজেনের সঙ্গে তখন বিজলীকে এদিকে ওদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে ওদেরই গলায় খাবার আটকে যাবার দাখিল হয়েছিল।

বিজুর চোখে সেই রহস্যের ঝিকিমিকি আরও কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল, "কী হল?"

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি?"

পলকের জন্য বুঝি বিজলীর চিকুরচিকচিক চোখ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমুহূর্তেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন। যতটুকু ভাব দেখছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন ত কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেননি, ব্রজেন ছায়ার মত আমাদের পেছন-পেছন এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমান কুকুরটার কৃপা প্রার্থনার দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, দু হাত প্যাণ্টের পকেটে।

ফিরে দেখেছিল ওরা, বিজলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি। আর সেই ওদের তিনজনেরই, বিজলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত বুকেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল যেন একটু।

বিজু কেমন একটু হেসে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায়, বলুন।"

সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়েথাকা চোখের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।

বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

বিজলীর চোখে আবার সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি উঠেছিল চমকে।

বলেছিল, "ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক। কিন্তু—"

বিজলীর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। একটু থেমে বলেছিল, "কালভার্টের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুড্‌স-শেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"

বলে সে চলে গিয়েছিল।

ওরা তিনজন যেন বিজলীতারের শক্ খেয়ে থমকে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল।

সেই ওদের ত্রয়ীকে ঘিরে বিজলীর শুরু। সেইদিনই গণেশ কাফে থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যানভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যার যেথা ঠাঁই।

তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিনবছরে, ওই তিন-জনের সঙ্গে বিজু প্রতিদিন ঘুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হ'য়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে। ব্রজেন পিছন ছাড়েনি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গায়ে অনেক জ্বালা ধরেছে। আজও ধরেছে।

আজও ধরেছে এবং ধরিয়ে বিজু নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল। কেন?

রেলপুলের উপর থেকে তিনটে অভিশপ্ত প্রেতের মত ওরা আবার ফিরে তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়।

আর ওদের তিনজনেরই মনে হল, প্রথম দিন বিজুকে যে রহস্য ঘিরে ছিল, আজ সেই রহস্যই ওই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষবারের জন্য গলা পেতে দিয়েছে। উদ্ঘাটনের কোন চিহ্নই সে রেখে যায়নি। শুধু তিনটি প্রেতাত্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্যের সন্ধানে ফিরবে।

ফিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল? বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটায় যেতে বারণ করেছিল, তারা আর যেতে পারেনি। তারপরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে বারণ করেছে, তারা যায়নি।

কিন্তু বিজু কেন নর্থ কেবিনের কাল-আঁধারে, লাইনের উপরে এসে মরেছে? কেন বিজু?

জবাব পাওয়া যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাইনটায় কোন চিহ্নও

থাকবে না। কেবল অদূরের ক্রশ লাইনের কাছে, দু ফুট উঁচু সিগন্যালের ওই লাল আলোটা জ্বলবে। এই থিতিয়ে আসা অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওই রক্তাভ রেশটা চিররাত্রি ধরে দগদগ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মত।

কিন্তু তার পরদিন রহস্যের একটি গ্রন্থিমোচন হল। সকলের জিহ্বা আর একবার লক্‌লক্‌ করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এল, বিজলী গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শঙ্কর গণেশ কাফেরই 'ফর লেডীজ' খুপরিতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজ্বলিত ঘৃণা দপদপ করছে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কবুল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে মেরেছে?

কবুল খেতে হবে, কেননা, তারা তিনজন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিষ করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, তার সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনের কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিনজনেরই কাছে, বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা বীজাণুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মূল্যে, বিজু তার ভিতরদুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। রাখেনি কোন সদর অন্দর। তাদের তিনজনের পাশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজ-আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মত। তারই সুযোগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছে প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করবার জন্যেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোখ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকারী ও শিকার।

বাইরে গণেশ কাফে'র গুলতানি চলেছে রোজকার মতই। সেখানে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলায়, একটি খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

কুটিল সন্দেহে, চাপা রুদ্ধ গলায় হিসিয়ে উঠল শঙ্কর, "আমি নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ছিল তার আমরা ছাড়া?"

যেন ছোবল মারার আগে, কেউটের মত কাঁধ বাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল,

"আমিও তাই জানতে চাই। সে যে-ই হক্, আমি তাকে দু হাতে টিপে পিঁপড়ের মত মারতে চাই।"

মানুষ যখন ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তখন তার সবটাই নাটকীয় দেখায়। প্রভাত পকেট থেকে ওর সেই বিখ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে, খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার আজ রক্তলোলুপতায় যেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। বলেছে, "কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনে। রেখে দাও।"

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।

সে বলল দাঁতে দাঁত পিষে, "তাকে যখন আমি পাব, সে যতবড় বন্ধুই হক, তার বুকটা আমি উপ্‌ড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর?

ছুরিটার তীক্ষ্ণ ধার ওদের তিনজনের মুখেই যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বসেছে ওরা ট্রাইবদের মত।

আগে ওরা রাগে ও ঘৃণায় যখন কোন কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত। শান্ত না হলে বিজু রেগেছে। বিজু কেঁদেছেও।

আজ বিজু নেই। আজ ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে। নরেশ ওর সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে। শঙ্করের রক্তাভ বড় বড় চোখ দুটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোখ দেখলে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপটা মেরেছে। বলেছে, "এই, এই রাক্ষস, চোখ করেছে দেখ।" নরেশের পেশীশক্ত শরীর বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে কোনদিন নির্দয় দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উল্টে দেখছে, খুঁজছে, পরস্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার। প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল, কতখানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোন্‌দিন কে কতক্ষণ একলা ছিল বিজুর সংগে। বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের জড় লুকিয়ে ছিল হয়ত। কিন্তু তখন বিজু ছিল। রামধনুর মত সে কোন কালকূট মেঘকে ঘন হতে দেয়নি। বুক চেপে হাঁটা শ্বাপদ-অন্ধকার পারেনি ফিরে আসতে। আজ ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহে হিংস্র। সেই শ্বাপদ-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিনজনকে। তাই প্রতিদিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিজুর নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারে যাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলেছিল তিনজনে, সেটাও ভাবছে

ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্যে, ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু?

একসময়ে নিজেদেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে। যেখানে অনেকদিন বসেছে বিজু, আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতিদিনের স্মৃতি ওদের মাঝে মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকর হঠাৎ ডাকে, "প্রভাত।"

প্রভাত সন্দেহ করে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয়, "কী?"

নরেশ দুজনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে।

শঙ্কর বলে, "বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করতে চেয়েছিল, মনে আছে?"

প্রভাত ভ্রূ কুঁচকে বলে, "তাতে কী?"

"বেচু পাঠক তোকে দিয়েই খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ দু হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়ির গলাটা টিপে রেখে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর কিছুই নয়। এমন কি বেচু পাঠক পরে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধরবার কোন উপায় থাকত না।"

প্রভাত প্রায় চিৎকার করে ওঠে "কিন্তু তাতে কী হল?"

শঙ্কর যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, "তুই তা করিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল বলে।"

শঙ্করের গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। দুজনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা নিশি-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিজু প্রভাতকে যেতে দেয়নি বেচু পাঠকের দিদিকে খুন করতে। খুন করার ভয়াবহ নারকীয়তার রূপ ওদের অনুভূতি থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, ভেড়ার পালের মত সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হবার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আর ফিরে এসে হতাশায় অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন, একটিই সৎ ও সত্যিকারের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। খবরের কাগজের একটি শিরোনামাকেই ওরা বাড়াতে পারত, 'অনাহারের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা।'

কিন্তু তা করেনি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথগুলি বেছে নিয়েছিল। কেননা, ওরা দেখেছিল, এ-দেশে ওইটাই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুর আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আগলে দাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মত উপোসের ছাপ। তখন থেকে ওরা দু পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, দু গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙার মত ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "হ্যাঁ, বিজু বারণ করেছিল। বলেছিল, বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেন্না হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শঙ্কর। দাশু গাঙ্গুলি তোকে পাঁচ শ টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপজিট্ পার্টির লিডার কেদার ঘটকের নামে, একটা মেয়েমানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্যে। ঘটক মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তি ছিল দাশু গাঙ্গুলির। কিন্তু তুই যাসনি, বিজু বারণ করেছিল।" যেন মাতালের মত সুরহীন গলায় বলতেই থাকে প্রভাত, "বিজু তোকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে মাসে তিন শ টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্মারগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে, দলের বিশ্বাস-ঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিসনি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।"

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা কাঠের খুপরির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। বিজু তাদের ঘেন্না করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গ-গুলির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসে ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মত রোষে ও রাগে, কষ্টে ও কান্নায়।

আর তবু উপোসী বিজু, তাদের তিনজনের তিলে তিলে মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চাপতে পারেনি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মত বলেছে, হয়ত আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরছ। হয়ত আমার ভুল হচ্ছে। তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল সেই পথটাকে ওরা ঘৃণা করতে শিখেছিল। বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘৃণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই, রাজেন্দ্রাণীর শোক-বিমূঢ় চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে দপদপ করে আগুন জ্বালারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিলখিল হাসির ঝনঝনায় এ-বিশ্বসংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে।

সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যন্তও হেসেছিল বিজু। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়েছিল।

সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে!

আর কারা ছিল বিজুর জীবনের সব অন্ধিসন্ধির খবর জানতে? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধু বাঁড়ুজ্যেকে সপরিবারে, তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে রাধু বাঁড়ুজ্যে তার আইবুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাথা নত করেছিলেন। সেই সবচেয়ে বড় কলঙ্কের গুপ্ত তথ্য কী, তা ত শুধু তারা তিনজন আর বিজুই জানত। তারা চারজনেই শুধু জানত, সেই কলঙ্ক ছিল শুধু তাদের চারজনের হাঁত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্বের সেই সুযোগ নিয়ে কে মেরেছে বিজুকে?

তিন জোড়া চোখের কুটিল সন্দেহ, ঘৃণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।

কিন্তু শত অবিশ্বাস সন্দেহেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষ্ণধার চকচক্ করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথায় যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে। সর্বনাশীর মত কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।

'গণেশকাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও কমছে।

নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত চাপা গলায় বলল, "আমি বলব, একটা কথা বলব।"

শঙ্কর আর প্রভাত দুজনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।

নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে, বলল, "একদিন, সেদিন তোরা দুজনে ছিলিনে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু। বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হল, আমি জানিনে। বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম। সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন। আমি পাগলের মত দু হাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।"

বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দুজনেই স্থির তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।

নরেশ আবার বলল, "জড়িয়ে ধরে আমি বার বার ডাকতে লাগলাম, বিজু বিজু। বিজুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু দু হাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ?' আমার চোখে বুঝি তখন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুখে তার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যে আমার মাথায় হাত দিল, তখুনি আমার কেমন হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, 'নরেশ, বাবা কোনদিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল? তুমি যা চাইছ, তুমি নিতে পার। শঙ্কর আর প্রভাতকে আমি কী বলব? তুমি কী বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মত অবস্থা। আমি দু হাতে মুখ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্ষমা কর বিজু, ক্ষমা কর।' বিজু আমার দু হাত ওর কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এল আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেশ। তুমি, আমি, প্রভাত, শঙ্কর কেউই আমরা ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোনদিনই আর আমরা এসব পারব না।'"

নরেশ নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, "এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে, তোদের কাছে। এই—এই—।"

বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর শঙ্করও তখন নিশিপাওয়া জলের মত মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জায়গায় একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।

একইভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজুকে একা বাড়ি পোঁছে দিতে গিয়ে সেই গাছতলায় দু হাতে টেনে এনেছিল কাছে। একইভাবে, বিজুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে হয়েছিল বিজুর ঠোঁট যেন শবের ঠোঁট। ঠাণ্ডা, রক্তহীন, অনড়, শক্ত। পরমুহূর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশের মত মনে হয়েছিল, বিজুকে চিরদিনের জন্য হারাবে সে। কিন্তু বিজুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁটে কোন অকূল থেকে ভেসে আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দুজনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'

একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রীজের নীচে শঙ্কর বিজুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, যে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে দপদপ করে পতঙ্গ

পড়েছিল। বিজু শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল রেল লাইনের দিকে। একইভাবে সে শঙ্করকে শান্ত করেছিল। একই কথা বলেছিল, সে স্বৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুত্বকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।

বিজু বন্ধুত্বকে রক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটল প্রহরী বিজু। তবে? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছায়া আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি? ভেদ করে কোথায় যাবে? বিজুরই কাছে ত? যে-বিজু তাদেরই সংগে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।

রাত হয়েছে। ঠাস্ ঠাস্ করে গণেশ কাফের দরজা বন্ধের শব্দে ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।

কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।

বাইরের রাস্তা ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় আবছা। শীতার্ত পথটা নরকের মত জনহীন আর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারছে না। বিজুর যে কলঙ্কে শহর ধিক্কার দিয়ে হেসেছে, সেই একই ধিক্কার দিতে গিয়ে, আর সকলের মত বিজুর বাবার চোখের সামনেও এই ত্রিমূর্তিই হয়ত ভেসে উঠবে। চির কলঙ্কটা তাদেরই জন্য থেকে যাবে।

উত্তরদিকেই চলল ওরা। নিশিস্যাকরার আমবাগানের ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন হনহন করে তাদের পার হয়ে গেল হেঁটে। যেতে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহূর্তে। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উস্কোখুসকো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিকও চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্তমাত্র। তারপরেই, আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।

কে? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা? ব্রজেন না?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে গেল ওদের মধ্যে, আর সে মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে গিয়ে, ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে, টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন ঘিরে ধরল তিনজনে ব্রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটিমাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। প্যান্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে

এখনি। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মাদ অস্বাভাবিক চাহনি।

বেসুরো ভাঙা গলায় দ্রুত বলল, "কী, কী চাও তোমরা? বিজু, বিজুর খবর?" বিজু। বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখ থেকে আর শুনতে চায় না। দাঁতে দাঁত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোখে ওদের বিস্ময় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চকচক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা? বিজুর?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোখ দুটোতে হঠাৎ জল দেখা গেল। আর দু হাত বাড়িয়ে ধরল প্রভাতের হাত। প্রায় রুদ্ধ গর্জনের সুরে, বলল, "তবে মার, মার, আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিস্ময়ে একটা ভয়ংকর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে লাগল। তবু অস্থির গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমি, আমি সে-ই। আমাকে তাড়াতাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাত শ টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, তার মা-ভাইবোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। দু বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা সর্তে। যে-সর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মত ঘুরেছি। ছায়ার মত।"

ওরা তিনজনেই যেন ওত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, "মার, প্রভাত, শঙ্কর, নরেশ, মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, যার কাছে শুয়ে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোভীর মত ছিঁড়ে খেয়েছে, অনেকদিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মত মেরেছে। মার, মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তিরহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যুভিক্ষা করছে।

মৃত্যুভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনছে, কিন্তু এখনও যেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা আর পাঁশ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হল, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন দু হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাঁশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে, অম্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্বর মোটা আর স্পষ্ট শোনাল। বলল, "মারতে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত্রি আটটা থেকে চব্বিশ ঘন্টা বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি, সে বেঁচে থাকলে আজীবন তার পিছে পিছেই ঘুরতাম।"

আবার ওর চোখে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। প্যান্ট হেঁচড়ে হেঁচড়ে, টলতে টলতে চলে গেল। গেল সামনের ঝুপসি জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের নড়বার ক্ষমতা ছিল না। হয়ত ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল। যাক। ওরা ফেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের বুকের মধ্যে তখন ফেটে পড়ার একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিজুই তখন ফিস্‌ফিস করে যেন বলছে, কেন, কেন বিজু মরেছে ?

চোখের বালি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পুরুষ মানুষের নাকি চোখে সচরাচর জল দেখা যায় না। বিশেষ করে যে মানুষ রোজ সকালে কানে তুলো গুঁজে আর চোখে ঠুলি এ'টে তবে কাজে নামে।

কিন্তু সেদিন রাতের গভীরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে যে মানুষটার দু'চোখ বেয়ে জল গড়ালো নিঃশব্দে, সে যে শুধু পুরুষ তাই নয়, কালেজলে অবিচল পুরুষ।

কাহিনীর নায়ক আমি নিজে। নায়িকা আমারই শ্রীমতী। ঘটনাস্থল সহর কলকাতা। রঙ্গমঞ্চ, অসূর্যম্পশ্যা নীলমণির গলি সংলগ্ন নোনাধরা বাড়ির একতলার একটা ঘর।

আগে নায়িকার কথা বলি। মালবিকা নবনীতাদের কেউ নয়। বাপমায়ের আদরের হাসি নামটাই চল্‌তি। প্রগল্‌ভ নিভৃতে হাস্যমুখি বলে ডাকলে রাগ করে। অর্থাৎ খুশি হয়। সম্প্রতি মারমুখি নামটাও ওকে মানায় ভাল। কিন্তু ডাকে কে।

রূপগুণ—?

নিরাশ হবেন। এমনটি অন্তত আছে আমার চেনাশুনা সকল ঘরে। তেমন হাসি পেলে কুটনো ফেলে মেঝের ওপর গড়িয়ে পড়ে, আমার ওপরে রাগলে লাগাম ছেড়ে দেয় রসনার, অন্যের বেলায় শাড়ির আঁচল চোখে ওঠে।

তারপর পার্শ্ব-চরিত্র। তাঁরা আমার বাবা মা দাদা বৌদিরা, নিচের দিকের আরো পাঁচটি ভাইবোন, দাদাদের ছেলেমেয়েরা এবং নিজের ছেলে। এই প্রহসনের সবাক অথবা নির্বাক ভূমিকায় সকলেরই অংশ আছে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না। কিন্তু আমাদের ভাগের টাকা ছাড়া সংসার পতিতপাবনীর থৈ পাওয়া ভার। বাবার পেনসান এবং ভাইদের রোজগারের ভগ্নাংশের সমষ্টিতে সংসার-তরণী বহন করছেন মাতৃদেবী। অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁকে স্বয়ং অর্থ-সচিবের প্রতিস্পর্ধিনী বলে মানি।

আমার বরাদ্দ মাসিক প'চাত্তর টাকা। এবং যত গোলযোগ এইখানেই। মোট কথা, মাসে প'চাত্তর টাকা আমি প্রায়ই দিয়ে উঠতে পারিনে এবং সে জন্যে অপ্রিয়-ভাষিণী প্রিয়তমার মেঘ-মূর্তিরও পরোয়া করিনে। কারণ, মাতৃদেবী সহৃদয়া। আমাকে এক রকম বাদ দিয়েই তিনি মাসের বাজেট কষে থাকেন।

গোড়াতে নিজেকে চোখ-কান কাটার অপবাদ দিয়ে রেখেছি। বাংলা কাগজে নানা জাতীয় অর্ডারি লেখা সরবরাহ করেও পারিশ্রমিক আদায়ের ছলাকলা যে শেখেনি তাকে ভাগ্যহত বলব। তারপর টোট্‌কা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখেও চোখ-কানের পর্দায় আর এক দফা সংস্কার ঘটেছে। ওষুধের ধন্বন্তরিকে প্রতিবারই সবিনয়ে আশ্বাস দিই, বিজ্ঞাপনের দাপটে সমস্ত কলকাতায় তাঁর রোগীর ছড়াছড়ি পড়ে গেল বলে। কিন্তু মাসের শেষে ওই পঁচাত্তর টাকা আর তুলে উঠতে পারি নে।

প্রকাশকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বিনয়-নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, হবে?

ঝাঁঝিয়ে ওঠেন কেউ, এত ঘন ঘন তাগিদ দিলে হবে কেন, এই সেদিন না নিয়ে গেলেন কিছু?

সেদিন অর্থাৎ দু'মাস আগে।

কেউ বা বলেন, সের দরে আমার লেখা বেচে দিলে একবারে হিসেব দিতে পারেন, যত ঝামেলা, ইত্যাদি—।

আমি নির্বিকার। বিনয়ের হোমিওপ্যাথি সংস্করণ।

তারপর মাসিক এবং সাপ্তাহিকের পরিবেশ। এ পর্যায়ের কুলীন গোষ্ঠী-বর্গকে সভয়ে পরিহার করে চলি। শুনতে পাই, সেখানে অপ্রথিতযশার লেখা ছাপতে হলে তেলের কারখানা থাকা দরকার। আমার রাজত্ব পোষাকী-সম্পাদকের ছোট দপ্তরে। সেখানে দু'কথা শুনি, দু'কথা শোনাই এবং ঝগড়া তর্ক করে দু'পাঁচ টাকা আদায়ও করে নিয়ে আসি। টাকা দিয়ে ফেলে সেখানকার সম্পাদকরা রাগের মাথায় শাসিয়ে দেন প্রায়ই, আর আমার লেখা ছাপা হবে না, এই শেষ।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি। মুখহাতে বেশ করে জল দিয়ে চেষ্টা করি দিনের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে। লেখার কাগজপত্র এবং একমাত্র সঞ্চয় বইগুলির নিবাস ঘরের কোণের ছোট আলমারিটাতে। এ বাড়িতে ওটাও আমারই মত পঙ্‌ক্তি-হারা, ব্রাত্য। বেশি রাগ হলে হাসি ওর গায়ে তালা লাগায়। কিন্তু আমার বোবা ধড়ফড়ানি দেখে নিজেই আবার খুলে দেয় শেষ পর্যন্ত।

তারপর বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক, আমার কানে তুলো, পিঠে কুলো।

গোড়ায় গোড়ায় আমার লেখার প্রতি সকৌতুক আগ্রহ ছিল সকলেরই। হাসির ধৈর্য এবং স্থৈর্য বিড়ম্বিত হয়েছে অনেক পরে। কিছুকাল আগেও ছাপা অক্ষরে লেখা পড়ে ও সগর্বে ভাবত, রসসৃষ্টির যত কারিগরি এবং ভাষা-বণিকের যত চাতুরীর ফল্গুধারা আমারই কলমের ডগায়।

কিন্তু 'ফুরালো দিন কখন নাহি জানি...।'

নিরুপায় হয়ে এক এক সময় ঝগড়াও করি।—কি করব বলো. চাকরি? কেউ দেবে না।

ব্যবসা—? আমার একমাত্র মূলধন তো তুমি।

তবু মেজাজ ওর ক্রমশই বিগড়চ্ছে। শাড়ি না, গাড়ি না, গয়না না, সিনেমা না, নিয়মিত হাত খরচাও না। এর পরে একটু বকাবকি করতে না পেলে ওর অসুখ করাও তো বিচিত্র নয়। বিধাতার যোগাযোগ এমনি, এর জন্য সুযোগ খুঁজতে হবে না অতিবড় সুহৃৎজনেরও। লেখার ঝোঁকে হয়ত ওরই পরিত্যক্ত শাড়ির আঁচলে কলমের মুখ-উপছানো কালি মুছে রেখেছি, নয়তো ব্লেড-এ ছেলের নখ কাটতে গিয়ে আঙুল কেটে বসে আছি, অন্যথায়, তার সর্দি-জ্বর ভুলে বেশ করে তেল মাখাতে বসেছি, চান করাবো—। পরের সকরুণ অবস্থাটা পাঠকবর্গের অনুমানের ওপরে ছেড়ে দিলাম।

পূর্ব-ভাষণের এখানেই শেষ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাগ্‌বাদিনীর আরাধনায় প্রস্তুত হয়ে কাঠের আলমারির সামনে এসে দেখি তালা লাগানো। শ্রীমতী জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। অনুনয় করে বললাম, কৌতুক রাখো কৌতুকময়ী, আজ আমার তাড়া আছে।

বাতায়নবর্তিনী নির্মম, নিশ্চল।

কি হল—?

ঘুরে দাঁড়ালো, তুমি চাকরির চেষ্টা দেখবে কি না?

ঘাবড়ে গেলাম।—দাদারা কিছু বলেছে?

ও ঝাঁঝিয়ে উঠল প্রায়, কী—?

তাড়াতাড়ি সামাল দিলাম, তবে কি বৌদিরা?

এমন দাদা-বৌদি তোমার, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু ভাবতে লজ্জা করে না?

ভাবনায় পড়া গেল। মা কিছু বলবেন না জানি, দাদা বৌদিরাও লোক ভালো, আমিও আর যাই হই মানুষ খারাপ নই—তবে আলমারির গায়ে তালা কেন! কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে আর জিজ্ঞাসাবাদের সাহস হল না।

চৌকিতে অর্ধশয়ান। প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিধি নিতান্তই অপ্রসন্ন।

রাতের আহার সম্পন্ন করে আবার শয্যা নিলাম। আলমারির পুঁথিপত্র রোজ একবার করে নাড়াচাড়া করা ন'বছরের অভ্যাস। অস্বস্তি লাগছে কেমন। মনে হচ্ছে কোন্ কাজটা যেন বাকি।

রাত বাড়ছে। মাঝখানে ছেলে ঘুমিয়ে। ওপাশে তার মাও আশ্রয় নিয়েছে। থেকে থেকে এক একটা বড় নিঃশ্বাস এবং চুড়ির শব্দ শুনি। অনেকক্ষণ বাদে ছেলের মাথা ডিঙিয়ে একখানা নরম হাত বাহু স্পর্শ করল।

ঘুমুলে?

বললাম, না—।

রাগ করেছ?

না।

আচ্ছা, তুমি এমন কেন গো, আধ ঘণ্টায় আসর জমাতে পারো, আর একটা চাকরি যোগাড় করতে পার না?

নিদাঘ-রজনীর নিভৃত প্রহরে এক মুহূর্তে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল কোথা দিয়ে। অটুট সঙ্কল্পে রাত কাটালাম। প্রকাশক না দিক, প্রয়োজন হলে আলমারির পুঁথি-পত্র আমিই বেচে দেব সের দরে।

তৈল-সিঞ্চনে পাথর ভিজানোর ইতিবৃত্ত বাদ দেওয়া যাক। বিলিতি ল্যাম্প-ফ্যাক্টরীর ছোট ম্যানেজার মাসতুত ভাই। চিঠির সুপারিশে তাঁর ওপরওয়ালার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন সেলস্‌লাইন-এ চাকরির জন্য।

তারপর ধার করতে বেরুলাম। টাকা নয়, পোশাক। পায়ের জুতো থেকে মাথার টুপী পর্যন্ত।

হাসির কথামত আধ ঘণ্টায় আসর জমাতে চেষ্টা করেছি সাহেবের মুখোমুখি বসে। ছোট ম্যানেজারের সুপারিশে হোক অথবা যে কারণেই হোক অতিবড় সংশয়বাদীও ফলাফল সম্বন্ধে আশান্বিত হবেন। বিদায়ের আগে সাহেব জিজ্ঞাসা করে রাখলেন কলকাতার বাইরে যেতে রাজি আছি কি না। অম্লান-বদনে জানিয়ে এলাম, ভারতবর্ষের বাইরে যেতেও আপত্তি নেই।

ইতিমধ্যে আর এক কলমও লিখিনি। বইয়ের আলমারিটা অদৃশ্য আকর্ষণে টানে বার বার। কিন্তু না, ও-পর্বের যবনিকা টেনে দেবই। হাসি আর আমি সাহেবের প্রতিটা কথা ওজন করি বার বার, ওতে চাকরি হওয়া সম্ভব কি না। দু'টাকা খরচ করে দরজার গায়ে লেটার-বক্স লাগালাম একটা, নিয়োগপত্র না হারায়। মাসতুত ভাইয়ের কাছে ছুটি তিনবার করে।

অবশেষে, আয় ছুটে আয় চোখের বালি, চিঠি এসেছে—।

মাদ্রাজ প্রভিন্স-এর সেলস্‌ অর্গ্যানাইজার নিযুক্ত হয়েছি। একমাস কাজ শেখার পরে সেখানে রওনা হতে হবে। বেতন তিন শ'। ভবিষ্যতও সুবর্ণোজ্জ্বল।

বাবার মুখের দুশ্চিন্তা কাটল। মা প্রসন্ন হাসি হাসলেন। বৌদিরা উৎফুল্ল মুখে ঘোষণা করলেন তাঁরাও মাঝে মাঝে যাবেন বেড়াতে। মা বাড়িয়ে তুললেন শ্রীমতীকে, ভাগ্যে ওর মত মেয়ে সঙ্গে থাকবে, নইলে কি যে হত বিদেশে বিভূঁইয়ে, ইত্যাদি। রাত্রিতে হাসি একগাল হেসে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করল, দাদা বলছিলেন গায়ের রঙ্‌ কালো হয় মাদ্রাজে, মাগো—এমনিতেই তো রঙ্‌ তেমন ফরসা নয় আমার।

আশ্বাস দিলাম, সেখানে যাঁদের মনোহরণ করবে তাঁরাও কালোই হবেন বোধ করি।

শিক্ষানবিশীতে লেগে গেলাম। দাদারা চাঁদা তুলে কোট প্যাণ্ট নেকটাইয়ের খরচা যোগালেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্যাটালগ ঘেঁটে ল্যাম্পএর নাম মুখস্থ করলাম দিনকতক। কোম্পানীর গাড়িতে বাজারে ঘুরে ঘুরে দালালি রপ্ত করলাম সকাল সন্ধ্যা।

রাতে বাড়ি ফিরে প্রথম চোখ পড়ে কোণের আলমারিটার ওপর। এখন একাই পঙক্তিহারা ওটা। আমি জাতে উঠেছি। ক্রূর শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে থাকি ওটার দিকে। কতক্ষণ ঠিক নেই। হাসির ডাকে চমক ভাঙে, হাত মুখ ধোবে না?

ইলেকট্রিক ল্যাম্পের দালাল আমি এ মন্ত্র অনুক্ষণ জপ করি মনে মনে। কিন্তু কলম হাতে নিলেই হাত নিশপিশ করে কেমন। সেদিন আলমারিটা ঘর থেকে বার করে দিলাম। ন' বছরের অভ্যস্ততা জড়ানো ওটার সঙ্গে। হাসি দেখল চেয়ে চেয়ে। রাত্রিতে বলল, সেখানে গিয়ে কিন্তু তোমার লেখা ছাড়া হবে না বলে রাখলাম।

হাসি পেয়ে গেল। ও কি দুর্বল ভাবে আমায়! খবরের কাগজের আপিসে আর ঘণ্টা ধরে বসে থাকতে হবে না, টোট্‌কা ওষুধের বিজ্ঞাপন লিখে একজন অর্ধশিক্ষিতের মন যোগাতে হবে না, প্রকাশকের ভ্রূকুটির এখানেই শেষ, মাসিক সাপ্তাহিকের দরজায়ও আর হত্যা দিতে হবে না কোনোদিন। অখণ্ড মুক্তি। আবার লিখব!

কিন্তু কয়েক দিন বাদে নিজেই এসে আলমারিটা খুললাম। বইগুলি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করলাম। নিজের লেখাগুলির ওপর নিবিড় স্নেহে হাত বুলিয়ে গেলাম অনেকক্ষণ ধরে। ব্যথায় বুকের ভিতরটা টন টন করছে। ফিরে দেখি হাসি পিছনে দাঁড়িয়ে।

হেসে বললাম, এগুলো ভাগ্নের ওখানে পাঠিয়ে দিই, তার খুব ঝোঁক এ সবে।

হাসি ইতস্তত করে বলল, সঙ্গে নেওয়া চলে না?

পাগল! বাতির দালালির সঙ্গে এ জিনিস অচল। তাছাড়া লেখা এখানেই খতম, এ শুধু উপোস করাতে বাকি রেখেছে। হাসতে হাসতে আলমারি খোলা ফেলেই পালিয়ে গেলাম।

প্রবাস যাত্রার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে আমার ভিতরে ভিতরে একটা শুকনো টান ধরে যাচ্ছে কোথায় অনুভব করতে পারি। অন্তস্তলে দিনরাত এক নীরব হাহাকার শুনতে পাই। আলোর দাম মুখস্থ করতে গিয়ে অন্ধকার দেখি চোখে।

কি যে ঘটে গেল কোথা দিয়ে হুঁস নেই। সম্বিত ফিরতে দেখলাম কাজে ইস্তফা দিয়ে কোম্পানী থেকে বেরিয়ে আসছি।

আলমারিটার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে আছি স্থাণুর মত। মুখে স্তব্ধতার বর্ণ। ওদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে চোখে না দেখলেও অনুমান করতে পারি। বাবার মুখে খবরের কাগজ নেমে এসেছে আবার। মা পুজোর ঘরে ঠাকুরের পায়ে নির্ভর করছেন। দাদারা মাথা নিচু করে বসে।

আর হাসি...

ভাবতে পারিনে।

রাত বাড়ছে। উঠে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালাম এক সময়। চূড়ান্ত বোঝাপড়া এখনো বাকি। একদিনে নয়, দু'দিনে নয়—দিনে দিনে।

জানালার গরাদ ধরে হাসি দাঁড়িয়ে আছে। মুখ ফেরাল। আমি কি ভুল দেখছি? কান্নার দাগ মেলায়নি এখনো কিন্তু হাসির আভাসও স্পষ্ট। একটু অপেক্ষা করে চৌকিতে এসে বসল। আবার একটু চুপচাপ থেকে ঝপ করে বলে উঠল, আমি খুশি হয়েচি, বুঝলে মশাই—?

আমি অবাক। চেয়ে আছি।

ও আড়চোখে দেখল একবার।—লেখাটেখা ছেড়ে এ চাকরি নিয়ে বাইরে যাওয়াটা তোমার কেমন লাগত বলব...?

চেয়েই আছি।

ঘুমন্ত ছেলের গায়ে একটা হাত রাখল সে। বলল, অভাবের তাড়নায় ওকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথা মনে হলে আমার যেমন লাগে।

এবারে আমি দাঁড়িয়ে আছি জানালার গরাদ ধরে। নীলমণির গলির দেয়ালের ওধারে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। চেয়ে থাকি। হঠাৎ সচকিত হয়ে অনুভব করি দু'গাল বেয়ে ধারা নেমেছে। শশব্যস্তে মুছে ফেলি। ফিরে দেখি হাসি হাসছে মিটি মিটি।

গৌরকিশোর ঘোষ

পরিবেশটা মেনকার আর একেবারে সহ্য হচ্ছিল না। এই ঘর, ঘর ভর্তি জনতা, তাদের অশ্লীল কৌতূহল, সামনে বসা খাকি দারোগা দুজন, ভবেশবাবুর ক্রোধান্ধ কুঞ্চিত মুখ, কোথা থেকে ভেসে আসা তীব্র এক কটু গন্ধ (পাশে বোধ-করি বাথরুম আছে)—এই সবকিছুই যেন লম্বা লম্বা আঙুল বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। আসছে তার দিকেই। কেন, মেনকা তাও জানে। হ্যাঁ জানে। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে, জেনেছে, তার এখন দ্রৌপদীর অবস্থা। তার যা কিছু গোপন এরা তা এবার টেনে বের করবে। তারই উদ্যোগ সে চারদিকে দেখতে পাচ্ছে। তার লাজলজ্জা, মানসম্ভ্রম হরণে সবাই যেন উদ্‌গ্রীব। সভার মাঝে চরম লাঞ্ছনার জন্য তৈরী হয়ে থাকল মেনকা।

বাড়ি থেকে (অবশ্য এখন যদি তাকে বাড়ি বলা যায়) পালিয়ে আসবার সময় যে সাহস, যে উৎসাহ মেনকার সর্বশরীরে ভর করেছিল, এখন তা কোথায় উপে গেছে। বেশ ভয় করছে তার। বেশ অসহায় বোধ করছে সে। ট্রেনে বেজায় ভিড় ছিল। খুকু ছটফট করেছে সারা রাত। তার ঘুম হয়নি মোটে। সেই রাত জাগার ম্যাজম্যাজানি, মুখে হাতে জল না দেবার দরুণ একটা ঘিনঘিনে ভাব তো ছিলই তার উপর পেটের ভিতর থেকে কেমন এক অস্বস্তি ঠেলে উঠছে। একবার বাথরুমে যেতে পারলে বোধ হয় ভাল লাগত তার। কিন্তু তার ইচ্ছের বাঁধন সব বুঝি আলগা হয়ে গেছে। তাই উঠতে আর পারল না।

সুশীল পাশেই বসে আছে। খুকু দারোগাবাবুর টেবিলের উপর তোয়ালে জড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু সুশীলের উপরও এখন কেন সে আস্থা রাখতে পারছে না? মেনকা জানে, সুশীল প্রাণ থাকতে তার অসম্মান হতে দেবে না। সুশীলের ভালবাসা যে কত তীব্র তা-ও মেনকা জানে। সুশীলের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে জীবন কাকে বলে, যৌবনের অর্থ কি, মেনকা তা উপলব্ধি করেছে।

মেনকা আবার খুকুর দিকে তাকাল। অকাতরে ঘুমুচ্ছে খুকু। চোখ ভরা কাজল গালে নাকে ছড়িয়ে পড়েছে। বুড়ো আঙুলটি মুখে পুরে ঘুমের ঘোরে চুষছে।

সুশীল আমাকে অনেক দিয়েছে। মেনকা মনে মনে বলল। কিন্তু আশ্চর্য, এখন যেন সেই সুশীলের উপরও মাঝে মাঝে ভরসা হচ্ছে না। সুশীলের দিকে

মেনকা একবার চাইল। সে মুখ নিচু করে বসে আছে। বড় গম্ভীর। কিছু মতলব আঁটছে নাকি? তাকে ফাঁসাবার? ছিঃ! নিজের মনকেই নিজে ধমক দিল মেনকা। তার কি তবে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটতে শুরু করল নাকি?

সুশীল যদি তার জীবনে না আসত তাহলে ঐ বুড়ো শকুনটা—অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এবার সে ভবেশবাবুর দিকে চাইল। আর আশ্চর্য হয়ে দেখল, এত সত্ত্বেও লোকটাকে তো মোটেই শকুন বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে বেজায় চটেছেন। কিন্তু ভবেশবাবু ভবেশবাবুই আছেন। তার বেশীও কিছু না কমও না। মেনকা বলতে চেয়েছিল, সুশীল যদি তার জীবনে না আসত, তাহলে ঐ বুড়ো শকুন তার দেহটা ঠুকরে ঠুকরে খেত। এখন ভাবল, সত্যিই ওসব উপমার কোন মানে হয় না। ভবেশবাবু বুড়ো, সুশীল পুরো জোয়ান। দুজনের মধ্যে তফাৎ আছে। কিন্তু ভবেশবাবু যখন তার দেহটাকে ঠুকরেছেন, তখন সে কোন সুখ পায়নি, কখনো পায়নি, একথা হলপ করে কি বলতে পারে? কিন্তু এসব প্রশ্নই বা এই অদ্ভুত সময়ে তার মনে লাফ দিয়ে দিয়ে উঠছে কেন? মেনকার সে কথাও একবার মনে হল। কেন, তা সে জানে না।

বরং, এখন, এই অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে, মেনকার মনে হচ্ছে, সেই অল্প সুখে তুষ্ট থাকাই ছিল ভাল। ছিঃ! মেনকা আবার নিজেকে ধমক দিল। সে কি তবে সুশীলকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে? কেন, একথা এখন মেনকার কেন মনে উঠছে যে এই অপ্রীতিকর অবস্থার জন্য সুশীলই দায়ী?

না, সুশীল এর জন্যে বিন্দুমাত্র দায়ী নয়। সে তো নিজ দায়িত্বেই বেরিয়ে পড়েছে। বরং, ঐ বুড়োটাই দায়ী। ও সব জানত। জেনে শুনে না জানার ভান করে থাকত। সুশীল আর ও বেরিয়ে আসবার পর থেকেই পিছু নিয়েছে বুড়োটা। হাওড়ায় নেমে খবর দিয়েছে পুলিসকে।

দারোগা বাবু ধমক দিলেন জনতাকে, কি দেখছেন অ্যাঁ। কি মজা আছে এখানে? যান, যার যার কাজে যান।

মেনকা মাথা নিচু করে বসে রইল। চমকে উঠল দারোগাবাবুর ধমকে। মুখ না তুলেও সে বুঝতে পারল, সে ঘরে বহু লোকের ভিড় জমেছে। কে যেন পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, কথাগুলোর প্রত্যেকটি মেনকার কানে স্পষ্ট করে ঢুকল—চ, চ। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই মাইরী। কেউ মুখ খুলবে না। সব লজ্জাবতী লতা মেরে গেছে।

আরেকজন বললে, যা বলেছিস। কাল শালা, ওসব পেপারেই পড়ব। খুব রস করে লেখে মাইরী।

মেনকার কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ঘুরতে লাগল বোঁ বোঁ করে। সেই অস্বস্তিটা বিরাট এক মোচড় মেরে মেনকাকে যেন শূন্যে ছুঁড়ে দিল। মেনকা ঢলে পড়ল। পড়ে যাবার উপক্রম হতেই সুশীল শক্ত হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। ভবেশবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

ভবেশবাবুর সর্বশরীরে মুহূর্তের মধ্যে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিল। একটু আগে যাকে বুড়ো শকুন বলে মেনকার মনে হয়েছিল, জ্ঞান থাকলে সে দেখত, সেই শকুন এখন এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে হয়ে উঠেছে। চোখ দিয়ে তার আগুন ছুটছে। দেহের প্রতিটি কোষ যেন রাগে গরগর করে উঠছে।

টেবিলের উপর দুখানা থাবা পেতে, সামনে একটু ঝুঁকে প্রায় গর্জন করে উঠলেন ভবেশবাবু।

খবরদার! খবরদার তুমি ওর গায়ে হাত দিও না। নির্লজ্জ, বেহায়া কোথাকার।

সুশীল একটুও বিচলিত হল না তাতে। পরম যত্নে মেনকাকে ধরে রইল। ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে শুধু বলল, অসভ্যতা করবেন না। তারপর দারোগাবাবুকে বলল, দয়া করে একগ্লাস জল দিন। ও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছে।

ভবেশবাবু টেবিলে এক কিল মেরে বললেন, চোপ রও। পরস্ত্রীকে তার স্বামীর সামনে জড়িয়ে ধরবার দুঃসাহস কি তোমার!

সুশীল এবারও উত্তেজিত হল না। ভবেশবাবুর দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে শুধু বলল, আপনার স্ত্রী। হুঃ।

তবে কার রে রাস্‌কেল। দারোগাবাবু, ঐ বদমাসটাকে হাজতে পুরুন। আমার সর্বনাশ করে দিল।

সুশীল বলল, দারোগাবাবু, এক গ্লাস জল। প্লীজ্। জল্‌দি।

দারোগাবাবু হাঁক পাড়লেন, দরোজা!

একটা কনস্টেবল এসে দাঁড়াল।

এক গ্লাস পানি। জল্‌দি।

ভবেশবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন, দারোগাবাবু তাকে শাসিয়ে দিলেন। বললেন, চেঁচামেচি করবেন না। ভদ্রমহিলাকে সুস্থ হতে দিন।

তা দিচ্ছি, থতমত খেয়ে ভবেশবাবু বললেন, কিন্তু দোহাই আপনার, আমার স্ত্রীকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে আনুন।

ভবেশবাবু আবেগে অধীর হয়ে দারোগাবাবুর হাত দুটো চেপে ধরলেন।

দারোগাবাবু, আমি বৃদ্ধ। আপনার হাত ধরে বলছি, আপনি ওকে সরিয়ে দিন। আমি আর সহ্য করতে পারছি নে।

ছোট দারোগা তাঁর কাণ্ড দেখে হেসে ফেললেন।

বললেন, সরাবো কি মশাই, কার স্ত্রী, তারই তো ফয়সালা হয়নি। আপনি বলছেন, আপনার। উনি বলছেন, ওনার। রগড়টি জমেছে ভাল।

ভবেশবাবু তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমার আমার। মেনকা আমারই স্ত্রী। ওটা জোচ্চোর, পাজী, বদমাস। ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।

কনস্টেবল জল নিয়ে সুশীলের হাতে দিল। সুশীল পরম যত্নে মেনকার মুখে কয়েকটা ঝাপ্টা দিতেই সে চোখ মেলে চাইল। সুশীল যত্নে তার মুখ

মুছিয়ে দিতে দিতে বলল, মানু, ভয় কি। আমি তোমার কাছেই আছি। জল খাবে?

মেনকা কোন কথা না বলে দুঢোঁক জল খেল। তারপর তার ধৈর্যের বাঁধ যেন ভেঙেগ গেল। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, দুহাতে মুখ গুঁজে সে কাঁদতে লাগল।

দারোগাবাবু বললেন, দেখুন, আপনাদের মধ্যে একজন কেউ মিথ্যে কথা বলছেন। আপনারা ভদ্রলোক। এসব কেলেঙ্কারীর পরিণাম, কি হতে পারে, অবশ্যই জানেন। মিথ্যে বলার ফল কি, তাও আপনাদের অজানা নেই। তাই বলছি, এই ভদ্রমহিলার মান ইজ্জতের কথা ভাবুন। ঐ ঘুমন্ত নিষ্পাপ শিশুটির কথা ভাবুন, তার ভবিষ্যতের কথা—

দারোগাবাবুর সামনের টেলিফোন টিং টিং করে উঠল। তিনি ফোন তুললেন।

হ্যালো, ও ইয়েস স্যর, হ্যাঁ স্যর। এ স্যর, একটা অদ্ভুত কেস্। আজ সকাল সাড়ে এগারটায় এক ভদ্রলোক, বয়স হয়েছে, জনতা এক্সপ্রেস থেকে নেমে, প্ল্যাটফর্ম ইন্সপেক্টার কুণ্ডুর কাছে কমপ্লেন করেন যে, একটা লোক তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে। কি বললেন স্যর? ও। পাটনা থেকে। হ্যাঁ স্যর। তারপর তিনি ওদের সনাক্ত করলে, কুণ্ডু তাঁদের ধরে এনেছে। সে ভদ্রলোকও বলছেন, ও স্ত্রী আর মেয়ে তাঁরই। কি বললেন স্যর? বয়েস? বলছি স্যর।

দারোগাবাবু ফোনের মুখে হাত চাপা দিয়ে সুশীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বয়স কত?

সুশীল বলল, ঊনত্রিশ।

দারোগাবাবু ফোনে বললেন, স্যর ঊনত্রিশ। কি বললেন, স্যর? লাভ ট্র্যাঙ্গেল? হাঃ হাঃ হাঃ। সেই রকমই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যর, জবানবন্দী নিতে যাচ্ছিলাম। এক্ষুণি নিচ্ছি। আচ্ছা স্যর, নমস্কার।

ফোন রেখে দারোগাবাবু বললেন, দিন মশাই, একে একে জবানবন্দী দিন। কুণ্ডু জেনারেল ডায়েরীটাতে লিখে নাও। যা সত্যি তাই বলবেন মশাই, কোন রকম হাঙ্গামা করতে চাইনে।

ভবেশবাবুকে বললেন, আপনি ফরিয়াদী, আপনারই নালিশ। আগে আপনি বলুন।

ছোটবাবু খাতা বাগিয়ে বসলেন। ভবেশবাবু বড়বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কি বলব?

বড়বাবু বললেন, সবই বলুন। আপনি কে, কি করেন, কোথায় থাকেন, আপনার পিতা কে? ঐ মেয়েটা কে? ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গেই বা আপনার সম্পর্ক কি? সবই পরিষ্কার করে বলবেন। কিছু লুকোবেন না।

কেন লুকোবো। কি লুকোবার আছে আমার? ভবেশবাবু দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন। আমার বয়স হয়েছে। আমি অধ্যাপনা করি। মিথ্যে আমি বলিনে। শুনুন।

আমার নাম ভবেশ রঞ্জন মজুমদার। পাটনার ছাত্রমহলে বি আর এম। একডাকে সবাই চেনে। পিতা *প্রিয় রঞ্জন মজুমদার। পাটনাতেই দু'পুরুষের বাস। আমাকে নিয়েই দু পুরুষ।

ভবেশবাবুর আত্মবিশ্বাস ক্রমেই যেন ফিরে আসছে। এতক্ষণ তাঁর বেশ ভয় ভয় করছিল। উত্তেজনার ঘোরে পুলিস ডেকেছিলেন। রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে চেঁচামেচিও বেশ করেছেন। সুশীল তাঁর এই লম্ফ ঝম্ফ দেখে অবাক হয়েছে। হয়ত হেসেছেও মনে মনে। মেনকাও অবাক হয়েছে। এমন কি তিনি নিজেও।

কেলেঙ্কারীটা হয়ত বেশীই করে ফেলা হয়েছে। কিন্তু আর উপায়ই বা কি? তাঁর যে বয়েস হয়েছে, তাতে এ সব হয়ত শোভা পায়না।

কেন, শোভা পাবে না কেন? আমার বয়েস বেশী, সুশীলের কম। একমাত্র এই কারণেই ছোকরা টেক্কা মেরে বেরিয়ে যাবে? দুনিয়ার ডিক্রী কি জারী হবে শুধু যৌবনেরই অনুকূলে? বয়েসটা বেশী হয়েছে বলেই আমার স্বত্ব স্বামীত্ব, আমার প্রেম, আমার জীবন সব খারিজ হয়ে যাবে? ইয়ার্কি! সতেজে ভবেশ-বাবুর চোখ দুটো চকচক করে জ্বলে উঠল।

আমার বয়েস পঞ্চান্নো। ভবেশবাবু সুশীলের দিকে একবার চেয়ে সদম্ভে বললেন, তিন মাস হল পঞ্চান্নোয় পড়েছি।

কিছুমাত্র সঙ্কোচ হলনা তাঁর কথাটা বলতে।

ত্রিশবছর আগে একবার বিয়ে করেছিলাম। এক বছর না যেতেই বিপত্নীক হই। তারপর ও পথে আর পা বাড়াইনি। রসায়ন আর ল্যাবরেটোরী আর ছাত্র, এই নিয়েই তেত্রিশ বছর কাটিয়েছি। কলেজ আর বাড়ি, এই ছিল আমার জগৎ। দু বছর আগে ওঁকে বিয়ে করি। মেনকা ওঁর নাম।

ভবেশবাবু আপন বিশ্বাসে ভর করে অনায়াসে এগিয়ে চলেছেন। মেনকা, এই নামটা সকালের দিকেও উচ্চারণ করতে বেশ জড়তা বোধ করেছেন। কখনো প্রচণ্ড ঘৃণা বোধ হয়েছে তাঁর। জ্বলে উঠেছেন এক তীব্র জ্বালায়। কিন্তু এখন তো দিব্যি বললেন। কই, বাধো বাধো ঠেকল না তো। ভবেশবাবু দেখলেন, সুশীল আর মেনকা সাগ্রহে ওর কথা শুনছে। মেনকার গালে চোখের জলের দুটো মোটা দাগ চিকচিক করছে। একটু আগেই কেমন অসহায়ভাবে কাঁদছিল মেনকা। ভবেশবাবু দেখছিলেন, কান্নার দমকে শরীরটা তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল। আহা, ওর তেমন দোষ নেই। বদমাসটার কুহকে পড়ে গেছে। ব্যাটাকে জেলে পুরে ছাড়ব। মেনকা খুব লজ্জায় পড়েছে। কলঙ্কের বোঝা ওর ঘাড়ে চেপেছে। সত্যি, এত কেলেঙ্কারী করা হয়ত ঠিক হয়নি। কিন্তু

উপায় ছিল না যে। কলকাতার ভিড়ে একবার মিশে গেলে আর কি ওদের ধরা যেত। আর যদি ধরা না যেত! না না, সে কথা ভাবাও যায়না।

দুবছর আগে আষাঢ় মাসে, বোধ হয় ১৭ই আষাঢ়, আমি মেনকাকে বিয়ে করি।

বেশ জোর দিয়ে দিয়ে কথাগুলো বললেন। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে। বেশ ফুর্তি লাগছে ভবেশবাবুর কথাগুলো বলতে। সুশীলের কি বলবার আছে এর পরে? বদমায়েসিটি এবার ধরা পড়ে যাবে। হাতকড়া পড়বে হাতে। সুন্দর একটা আমেজ এসে গেছে তাঁর মনে। মেনকা হয়ত তাঁর জয়ে খুশী হবে না। সুশীলের হিতেই তার আনন্দ। সে হয়ত ঘৃণাই করে আমাকে, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। একটু আগে মেনকা যখন তাঁর দিকে চেয়েছিল, তখন তার দৃষ্টিই সেকথা ভবেশবাবুকে জানিয়ে দিয়েছে। মেনকা এখন তাকে ঘৃণা করে! তা করুক। ভবেশবাবু গরম হয়ে উঠলেন আবার। আরামদায়ক আমেজটি নষ্ট হয়ে গেল। ঘৃণা করে করুক। আমি অধিকার ছাড়ব না।

ভবেশবাবু শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, দুবছর আগে ওকে বিয়ে করি। এক বছর পরে এই মেয়ে হয়। আর কি শুনতে চান?

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার শ্বশুরের কি নাম?

শ্বশুরের নাম?

ভবেশবাবু বলতে গিয়ে থমকে গেলেন। তাইতো, মেনকার বাবার নাম তো তিনি জানেন না। কখনো তো মনেও পড়েনি সেকথা। প্রয়োজনও পড়েনি তার।

কি আশ্চর্য, পুরো চার বছর এক বাড়িতে মেনকার সঙ্গে তিনি কাটিয়েছেন। কখনও তো এই নামটাকে এত জরুরী বলে মনে হয়নি।

হঠাৎ ঘাবড়ে গেলেন ভবেশবাবু। মুখ শুকিয়ে এল। বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল। ছ্যাঁদা বেলুনের মত চুবসে গেল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

না, তিনি জানেন না। মেনকার বাবার নাম তিনি বলতে পারবেন না। মেনকার বাবার কোন অস্তিত্বই ভবেশবাবুর জীবনে ছিল না। মেনকার বাবার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?

কেন, তিনি যে শ্বশুর। শ্বশুর! মেনকার বাবা! শ্বশুর শ্বশুর মেনকার বাবা শ্বশুর শ্বশুরের নাম। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে যেন। কেমন এক অসহায় বোধ ভবেশবাবুকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

ভবেশবাবু বুঝতে পারছেন, কি শোচনীয় অবস্থায় পড়তে যাচ্ছেন তিনি। যে লোক এতক্ষণ জোর গলায় আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী করে চেঁচাচ্ছিল, টেবিলে চাপড় মেরে সবলে নিজের দাবী জাহির করছিল, সে একটামাত্র তুচ্ছ প্রশ্নে বেসামাল হয়ে গেল!

এখন কি জবাব দেবেন তিনি? বুঝতে পারছেন, দারোগাবাবুর ঐ ছোট্ট প্রশ্নটার জবাব দিতে তাঁর অনাবশ্যক দেরী হচ্ছে। এত দেরী হওয়া উচিত নয়। কত সময় লাগছে? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট? না কি ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল?

ভবেশবাবু এ-ও বুঝতে পারছেন, সুশীল তাঁর এই অসহায় অবস্থা বেশ উপভোগ করছে। বদমাস! বদমাস কোথাকার! ভবেশবাবুর ঘৃণা ফুঁসে উঠতে চাইল, কিন্তু আশ্চর্য, আগের মত জোর পেল না। তাঁর মনটা যেন স্যাঁতাধরা স্বদেশী দেশলাই বনে গেছে। কাঠি ঠুকলেন। কিন্তু ফস্‌স্। আগুন আর জ্বলল না। মেনকা কি ভাবছে? সে-ও কি খুশী হচ্ছে? নিশ্চয়ই হচ্ছে। সুশীলের জিত, মেনকারও। আর এখন ভবেশবাবুর মনে হল, সুশীলের জিতের পালা আরম্ভ হল। ভবেশবাবু এখন থেকে তিল তিল করে হারতে লাগবেন—যতটুকু হারবেন তিনি, ততটুকুই জিত হবে সুশীলের।

না না না না না। কিছুতেই না। কিছুতেই না। কিছুতেই তিনি তা হতে দেবেন না। মেনকাকে হারাতে তিনি পারবেন না। মেনকা নেই, খুকু নেই তো সংসারও নেই। তাহলে আর তাঁর জীবনের দাম কি? এক কানাকড়িও নয়। মেনকা আছে, খুকু আছে, তাই তিনিও বেঁচে আছেন। মেনকা তাঁর স্ত্রী। তিনি খুকুর বাবা। বাব্ বাব্ বাব্। এরই মধ্যে কি সুন্দর বোল ফুটেছে খুকুর মুখে! আর প্রথম ডাকেই সে বাবাকে ধরেছে। বাব্ বাব্ বাব্। খুকু খুকু খুকু।

সারা ঘর নিস্তব্ধ। বড় দারোগা, ছোট দারোগা, সুশীল, মেনকা—কারো মুখেই কথা নেই। খুকুও ঘুমুচ্ছে টেবিলের উপর। একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে। কথার খই ফুটছে ভবেশবাবুর মনে। মুখে তার শব্দ নেই। সারা মনের স্তব্ধতা ভেঙে কচ্ কচ্ করে নড়ছে শুধু নড়বড়ে পাখাটা।

আর ঐ বিরামহীন পাখার মতই ভবেশবাবুর মগজে বয়ে চলেছে কথার স্রোত। আমার নাম ভবেশরঞ্জন মজুমদার আমার পিতা ৺প্রিয়রঞ্জন মজুমদার নিবাস পাটনা আমার স্ত্রীর নাম মেনকা সন্তানের নাম খুকু আমার স্ত্রীর পিতার নাম—গোটা স্রোত সারা পথ তর তর বয়ে বয়ে এই শূন্যস্থানে এসে ধাক্কা খায় আর সব কিছু ওলোট পালোট খায়।

না, ওর বাবার নাম জানিনে। ভবেশবাবু একথা যদি বলেন, বলতেই হবে তাঁকে, তাঁর দাবী কেঁচে যাবে। মেনকা যে তাঁর স্ত্রী, সে কথা হয়ত বিশ্বাস করানো শক্ত হয়ে পড়বে। সুশীল হাসবে। দারোগাবাবুর অনুমতি নিয়ে ঐ স্পর্ধিত যৌবন মেনকার হাত ধরে তাঁর চোখের উপর দিয়েই বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ তাঁর চেতনায় ঠক করে আঘাত পড়ল।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি মশাই, চুপ মেরে গেলেন যে। চটপট বলে ফেলুন? আবার ওদের কথাও শুনতে হবে তো।

ভবেশবাবু ধীর নিষ্কম্প গলায় বললেন, আমার শ্বশুরের নাম আমি জানিনে।

না, সুশীল তো হাসল না। মেনকা তো উৎফুল্ল হয়ে উঠল না। এমন কি তাঁর দিকে ওরা চাইল না পর্যন্ত।

দারোগাবাবু ব্যঙ্গ করে বললেন, এতক্ষণে বেশ বোঝা যাচ্ছে—

না দারোগাবাবু...

কথা শেষ করতে না দিয়েই ভবেশবাবু বলে উঠলেন, না, আমার অবস্থা কিছুই বোঝা যায়নি।

দয়া করে আমার সব কথা শুনুন। ভবেশবাবু অথৈ জলে ডুবতে ডুবতে যেন ক্ষণেকের জন্য ভুস করে ভেসে উঠলেন।

ভবেশবাবু বলতে লাগলেন, গোড়া থেকেই বলছি। চার বছর আগে মেনকা আমার বাড়িতে আসে। কলেজের এক সহকর্মী ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে আনেন। মেয়েটি নিরাশ্রয়। পাকিস্তানে দেশ। নানা আশ্রয় শিবিরে ঘুরে পাটনায় উপস্থিত হয়েছে। একটি নিরাপদ আশ্রয় ওর চাই। তাই সহকর্মীটি ওকে আমার কাছে এনেছেন। আমি তো একা থাকি। প্রথম স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে একাই থাকি। দেখা শোনা সব চাকরে করে। সে কথা বন্ধুকে বললাম। বন্ধু কিছু জবাব দেবার আগেই মেনকা বলেছিল, তাতে আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

হ্যাঁ, সে কথা মেনকা বলেছিল বটে। কথাটা মেনকার মনে পড়ে গেল। শুধু কথাই নয়, সেই সঙ্গে সেদিনের ছবিটাও।

মেনকা বড় নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। পরনে ছিল শতছিন্ন একটা কাপড়। পিছনের অতীত তার শূন্য। অধিকাংশ উদ্বাস্তুর মেয়ের মতই। এমন কি চরম লাঞ্ছনার স্মৃতিগুলোও সেই শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানও তার কাছে এক আকারবিহীন অস্তিত্ব মাত্র। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

এইরকম এক অবস্থায় মেনকা উপস্থিত হয়েছিল ভবেশবাবুর বাড়ি। বাড়িটা বেশ বড়। পুরনো। বাড়িতে ঢুকতেই মেনকার নাকে পায়রার গন্ধ লেগেছিল। আর এক ধাক্কায় তাকে নিয়ে ফেলেছিল তার গ্রামে, তাদের ফেলে আসা বাড়ির দরদালানে। এই একই গন্ধ সেখানেও সে আকৈশোর পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মেনকার অন্তরাত্মা আকুলি বিকুলি প্রার্থনা করতে লেগেছিল ঈশ্বরের কাছে, ভগবান, ভগবান, এই বাড়িতে যেন ঠাঁই পাই। তাই ভবেশবাবু যখন তাঁর বন্ধুর প্রস্তাবে আমতা আমতা করে বললেন, এখানে তো মেয়েছেলে কেউ থাকে না তখন মেনকা অশোভন আগ্রহ দেখিয়েই বলেছিল, তাতে কোন রকম অসুবিধে হবে না তার।

শেষ পর্যন্ত আশ্রয় তার মিলেছিল সেখানে। কিন্তু কি রকম অদ্ভুত আশ্রয়। ভবেশবাবু পড়াশুনা নিয়েই রাতদিন মগ্ন থাকেন। ঐ যে প্রথম দিন চাকরকে ডেকে বললেন, হরি, ইনি আজ থেকে এ-বাড়িতে থাকবেন, একখানা ঘর খুলে দিস, ব্যস্, তারপর আর কোন খোঁজখবর নেননি ভবেশবাবু। দেড় মাসের মধ্যে তাঁর দেখাই হয়নি মেনকার সঙ্গে।

হরির তাকে ভাল চোখে দেখেনি। ঘর সে একখানা খুলে দিয়েছিল। তবে নিতান্ত অনিচ্ছায়। আর সে কী ঘর! রাজ্যের ছবি—সেই কোন্ আমলের—ঘরের মধ্যে ডাঁই করা। একটা বড় পালঙ্ক। রং চটে গেছে, কিন্তু শক্ত আছে। পালঙ্কের উপর তুলোর বড় গদী। এপাশে ওপাশে ছেঁড়া। উপরে একহাত পুরু ধুলো। ব্যস্, আর কিছু নেই। মেনকার চোখে সব ভেসে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, আর কিছু সে তো চায়ওনি সেদিন। যা পেয়েছে, মনে হয়েছিল তাই ঢের।

গদীর ধুলো ঝাড়ল মেনকা। ছবিগুলো দেওয়ালে দেওয়ালে টাঙ্গাল। ঘরখানা পরিষ্কার তকতকে করে ফেলল। তবুও হরির মন পেল না। হরি তাকে কোন কিছু ছুঁতে দেয় না। কোন কাজে হাত দিতে দেয় না। দুবেলা দুমুঠো খেতে দেয়, আর শাসায়, জিনিসপত্র ছুঁয়েছিস্ কি মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। ওসব চুরির মতলব আমার জানা আছে।

মেনকা মহা ফাঁপরে পড়ল। এরকম অদ্ভুত অবস্থায় সে আর কখনও পড়েনি। কাজ নেই। কথা নেই। দেড়টি মাস কথা প্রায় বলেইনি কারও সঙ্গে। বড় ভয়ে-ভয়ে থেকেছে সে। পরনের কাপড় ছিঁড়তে ছিঁড়তে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ওতে আর লজ্জা ঢাকে না। কদিন ধরে হরির কাছে অনুনয় বিনয় করছে একখানা পুরনো কাপড়ের জন্য। কিন্তু সে শুধু হাঁকিয়েই দিচ্ছে। অথচ কাপড় না হলেই নয়।

সেদিনটার কথা বেশ মনে পড়ল মেনকার। মরীয়া হয়ে সে ভবেশবাবুর একখানা ভিজে ধুতি পরে বসে রইল। তাই দেখে হরির কি রাগ। আর কি গালাগালই না দিচ্ছিল। হঠাৎ ভবেশবাবু খুব চটে উপর থেকে নেমে এলেন। সচরাচর এ-কাজ তিনি করেন না। তাঁর ধ্যান ভাঙানো খুব শক্ত। কিন্তু যদি একবার ভাঙে, তাহলে আর রক্ষে নেই।

নিচে এসেই চিৎকার করে উঠলেন, হরে, কি ভেবেছিস্ হারামজাদা। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করেছিস!

হরি ভয়ে গলা একেবারে নিচু করে ফেলল। বলল, বাবু, মাগীটা আস্ত চোর। ওকে বিদেয় করে দিন।

ভবেশবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কার কথা বলছিস?

মেনকা তাঁকে দেখেই ঘরে লুকিয়ে পড়েছিল। ঠক ঠক করে কাঁপছিল। ভবেশবাবু তার কথা বেমালুম ভুলে গেছেন দেখে সে এবার হতভম্ব হয়ে গেল। অদ্ভুত লোক!

সত্যিই অদ্ভুত। সেদিনকার ব্যবহারও যে রকম, আজকেরটাও তাই। ভবেশ-বাবু কত ধীর, কত স্থির। গত চার বছরে এই ভব্য লোকটাকে মেনকা কখনও বিচলিত হতে দেখেনি। আর আজ সেই লোক কি ছেলেমানুষীই না করছেন। ভবেশবাবুর জন্য তার কষ্ট হতে লাগল। গত চার বছরে ভবেশবাবু যে একেবারে শিশু হয়ে গেছেন, মেনকা তা টেরও পায়নি।

সেদিনও তিনি ধমকধামক দিচ্ছিলেন হরিকে।

কার কথা বলছিস্?

হরি বলল, সেই যে গণেশবাবু যাকে এনে রেখে গেলেন সেদিন। সেই মেয়েটা। বড্ড পাজি বাবু। আজ আপনার ধুতি কেচে নেড়ে দিয়েছি। দেখি সেই ভিজে ধুতিই পরে রয়েছে। কি সাহস, বলুন দেখি।

ভবেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটি মেয়ে আছে বটে। চল তো দেখি, ভিজে কাপড় চুরি করল কেন?

ভয়ে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল মেনকার। ভবেশবাবু ঘরে ঢুকতেই তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিল সে। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, নিরুপায় হয়ে আপনার কাপড়ে হাত দিয়েছি বাবু। আমার পরনের কাপড়খানা একেবারে ছিঁড়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, আমি চোর নই। চোর নই।

ভবেশবাবু থতমত খেয়ে বলেছিলেন, আরে পা ছাড়, পা ছাড়। সবই বুঝেছি। দোষটা আমারই। ছি-ছি, তোমার কাপড় নেই, আমাকে একটু জানাতে হয়।

খুব কোমল হয়ে এসেছিল ভবেশবাবুর স্বর। হরিকে বললেন, এক্ষুণি বাজারে যা, এর কাপড়-জামা যা লাগে, সব এনে দে। আর দ্বিতীয় কথা না বলে, যেন লজ্জা ঢাকতেই ভবেশবাবু আবার উপরে উঠে গেলেন।

আর মেনকা, এই প্রথম, বহু বছর পরে এই প্রথম, এমন একটা মানুষের সান্নিধ্যে এল, যার উপর সে নির্ভর করতে পারে। ভবেশবাবুর ঐ একটি কথায় তার মনের আশঙ্কা, আতঙ্ক, দুর্ভাবনা, সব দূর হয়ে গেল। সহানুভূতির একটি কোমল খোঁচাতেই সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল। কেঁদে কেঁদে অনেক দিনের জমানো ভার কমিয়ে ফেলতে লাগল। আর মেনকা, সেই প্রথম আবিষ্কার করল, নিশ্চিন্ত আশ্রয় না পেলে প্রাণভরে কাঁদাও যায় না।

মেনকা এও জানে, যে আশ্রয় সে পেয়েছিল, তা তার আশাতীত। নিজের হাতে সে-আশ্রয় সে যদি ভেঙে না দিয়ে আসত তো তা কিছুতেই ভাঙত না। ভবেশবাবু শুধু নতুন কাপড়ই দেননি, ধীরে ধীরে যাবতীয় সংসারই মেনকার হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

ভবেশবাবু বলছিলেন, দারোগাবাবু, মেনকা আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, যদি একথা বলি, তাহলে ভুল বলা হয়, আমাকেই ও আশ্রয় দিয়েছিল। এত সেবা, এত যত্ন, আমি আর কারো কাছ থেকে পাইনি। শুকনো অঙ্ক আর শাস্ত্রের নানা জটিল ফরমুলা—এই নিয়েই ভরেছিল আমার জীবন। তার রস গিয়েছিল শুকিয়ে। তাতে সার্থকতা পেয়েছি। কিন্তু এবার সুখ পেলাম। বুঝলাম, নারী জীবনের কত কাম্য। পুরুষের জীবনে সে কত অপরিহার্য।

দারোগাবাবু, বিশ্বাস করুন, মেনকাকে পেয়ে আমার বয়েস কমে গেল। পলাতক যৌবন, যা আমাকে ফাঁকি দিয়ে, আমার সঙ্গে বঞ্চনা করে, চলে

গিয়েছিল, প্রাণপণে তা ফিরে আসতে চেষ্টা করল। আমার কাজের ক্ষমতা বাড়ল, কুশলতাও বাড়ল। এই সময় ১৬।১৭ ঘণ্টা কাজ করেছি ল্যাবরেটারীতে। নিদারুণ ক্লান্ত হয়ে, কাজ চুকোবার পর, গভীর রাত্রে, যখন ল্যাবরেটারী ছেড়ে বাইরে বেরুতাম, তখন দেখতাম বাইরে একটা টুল পেতে সেখানে অসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষা করে আছে মেনকা। সব ক্লান্তি নিমেষে দূর হয়ে যেত। মেনকা সংসারের ভার নেবার পর থেকে কখনও ঠাণ্ডা খাবার খাইনি। গোটা সংসারই ও এক কোমল উষ্ণতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল।

মেনকাকে পেয়েছিলাম। ওকে নিয়েই মগ্ন ছিলাম। ওর বাবার তো ধার ধারিনি। তাই তার নাম জানিনে। ও-ও আমাকে কখনো বলেনি। তা ছাড়া জানতাম ওর অতীত ওর কাছে খুবই পীড়াদায়ক। তাই সে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাইনি। আমি জীবন শুরু করেছি ওর বর্তমান থেকে। তাতে কি আমার দাবী খারিজ হয়ে যাবে?

প্রশ্নটা যেন একটা চাপা আর্তনাদ। যেন এখনই দারোগাবাবু রায় দিয়ে দেবেন সুশীলের পক্ষে। দারোগাবাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। হয়ত একটা জবাবের আশায়। দারোগাবাবু কিছুই বললেন না।

ভবেশবাবু আবার শুরু করলেন, মেনকা আমাকে সব দিয়েছিল। দিয়েছিল উজাড় করে। তাই আমিও ভাবলুম, প্রতিদানে আমার যা কিছু দেবার আছে, সবই ওকে দেব। ওকে বিয়ে করলুম। বাচ্চাও দিয়েছি। স্বামী, সংসার, সন্তান—সবই পেয়েছে মেনকা। এই নিয়েই তুষ্ট ছিল। থাকতোও। যদি না, ঐ হতভাগাটা এসে গোলমাল পাকাতো। মেনকা বিগড়েছে ওরই ফুসলানিতে। ওরই প্ররোচনায় ঘর ছেড়েছে। দারোগাবাবু এই আমার কথা। এইবার আপনার বিচারে যা বলে করুন।

ভবেশবাবু চুপ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে বকার জন্যই হোক বা ভয় ভাবনাতেই হোক তাঁকে বেশ নির্জীব বোধ হতে লাগল।

দারোগাবাবু সুশীলের দিকে চেয়ে বললেন, এইবার আপনার পালা। সত্যিকথা বলবেন মশাই।

এই সময় খুকুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এক গড়ান দিয়ে উপুড় হতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল। সুশীল অনভ্যস্ত হাতে তাকে কোলে তুলতে গেল। খুকু তার কোলে ছটফট করতে লাগল। হঠাৎ তার নজর গেল ভবেশবাবুর দিকে। তৎক্ষণাৎ সে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ভবেশবাবুর নাকটা ধরে বলতে লাগল বাবু বাবু বাবু। ভবেশবাবু প্রবল আবেগে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তার সারা মুখে চুমুর পর চুমু খেলেন। তাঁর সারা গালে খুকুর চোখের কাজল লেগে গেল। কি এক পরম তৃপ্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। চোখ দুটো চিক চিক করতে লাগল।

খুকু ভবেশবাবুর কোলের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কত রকম খেলা করছে। হাসছে। বাব্ বাব্ বাব্। কি মিষ্টি মিষ্টি ডাকছে ভবেশবাবুকে। সুশীল এক মনে ছবিটা দেখতে লাগল। ভবেশবাবুর মনের গুমোট এর মধ্যেই অনেক কেটে গেছে। খুকুর চঞ্চল দৌরাত্ম্যে তা কেটে গেছে। ভবেশবাবুর চোখ মুখ দিয়ে বাৎসল্য যেন ঝরে পড়ছে। ভারি সুন্দর লাগল ছবিটা সুশীলের।

তার মনে পড়ল দারোগাবাবুর কথা। সত্য কথা বলবেন মশাই। সত্য সত্য করে এরা সব খেপে উঠেছে। সুশীল জানে তার সত্য ভাষণ এখানে না করবে মঙ্গল, না আনবে সুন্দর। ওর সস্তা সত্য কথায় ভবেশবাবু আর খুকুর এই স্বর্গীয় খেলাটি (হ্যাঁ স্বর্গীয় বটে, সুশীল আবার চেয়ে দেখল) চিরকালের জন্য ভেঙ্গে যাবে। সত্য কথা বলবেন মশাই। ফু!! সুশীল মনে মনে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। এক্ষেত্রে সত্য তো তাকে বলতেই হবে। তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই বলতে হবে। বিবেক তাকে অবশ্য মিথ্যে বলতেই প্ররোচনা দিচ্ছে। তার সৌন্দর্যবোধ পিতাপুত্রীর এই অনাবিল স্নেহের মালাটি ক্রুর নির্বোধ এক সত্যের আঘাতে ছিঁড়ে দিতে বিদ্রোহ করছে।

তার চেয়ে সুশীল মিথ্যেই বরং বলুক। বলুক ও মেয়ে তার নয়। ভবেশবাবুর। একবার এই রকম একটা ইচ্ছে তার মনে উঁকিও দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই তার হাসি পেল মনে মনে। এ সব মহত্ব নাটকে দেখালে কোনও ঝক্কি পোয়াতে হয় না। বরং হাততালি পাওয়া যায় প্রচুর। কিন্তু এটা স্টেজ নয়। জি আর পি পুলিসের অফিস। কি যেন একটা নাম বলেছিলেন ভদ্রলোক? মিসিং স্কোয়াড্। এখানে ওসব কেতাবী মহত্ব দেখাতে গেলেই হাতকড়া। তারপর সোজা শ্রীঘর।

আর এসব কথা ভাবছেই বা কেন সুশীল? তার মিথ্যে বলার ফলাফল কি সে জানে না? জেলের ভয় সুশীল করে না। তার চেয়েও মারাত্মক মেনকাকে হারানো। না, সেকথা সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। ভবেশবাবুর প্রতি তার কোন বিদ্বেষ নেই। অন্তত এখন। তাঁর অবস্থা সে বুঝতেও পারছে। বেচারা! বেচারা ভবেশবাবু! অনুকম্পা হল সুশীলের। কিন্তু মেনকার দাবি সে ছাড়তে পারে না। মেনকা তাকে প্রেম দিয়েছে। সন্তান দিয়েছে। সন্তানকে সে অবশ্য ভবেশবাবুর মত গুরুত্ব দেয় না। পিতার ভূমিকা ধাতস্থ হয়নি তার, মেনকার প্রেম তার কাছে বেশী দামী। মেনকা আছে তাই আছে তার বাঁচারও অর্থ।

কি হল মশাই, দারোগাবাবু বললেন, একেবারে যে ভাম মেরে গেলেন। মুখ-টুখ খুলুন।

৩

সুশীলের উৎসাহ অনেক নিভে গেছে। তার মনে হল, বলবার কিছু নেই। না, বলবার আছে, অনেক কিছু আছে। কিন্তু এই পরিবেশে তা নিতান্ত হাস্যকর

শোনাবে। যেমন ভবেশবাবুর কথাগুলো শুনিয়েছে। সুশীল জানে, ভবেশবাবু এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বলেছেন, তার প্রত্যেকটি তাঁর মনের কথা। মেনকা তাঁর জীবনে যে গভীর পরিবর্তন এনেছিল, সুশীল নিজেই তার সাক্ষী। দিনের পর দিন সে তা দেখেছে। দারোগাবাবু বিশ্বাস করুন, মেনকাকে পেয়ে আমার বয়েস কমে গেল। ভবেশবাবু কি প্রচণ্ড আবেগে কথাগুলো বলে গেলেন। সুশীল জানে, একবর্ণও মিথ্যে নয় তা। কিন্তু তবু তার মনে হল, ভবেশবাবু যেন কোন আয়ুর্বেদীয় সালসার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। যা খেলে যৌবন ফিরে আসে বার্ধক্যে, হারানো কর্মশক্তি লাভ হয়। বেশ, শুনতে শুনতে সুশীলের মনে হয়েছিল, মেনকা তাহলে এক বোতল আয়ুর্বেদীয় সালসা।

সুশীলের কিন্তু হাসি পায়নি মোটেই। বরং ভবেশবাবুর এই আকুলি-বিকুলি তার কাছে ওষুধের বিজ্ঞাপন বলে মনে হওয়ায় সে দুঃখ পাচ্ছিল। তারপর সে দেখল খুকুর সঙ্গে ভবেশবাবুর খেলা করার দৃশ্যটি। কি চমৎকার! চোখ ভরে গেল তার। খুকু তাঁর কি, মেনকা তাঁর কতখানি, তা ভবেশবাবুর মুখ-চোখ দেখে তখন নিতান্ত একটা নির্বোধও বুঝতে পারত।

সুশীল জানে, সে যদি কিছু বলে, তার জীবনে মেনকার অস্তিত্বের গুরুত্বের কথা সে যদি 'ফিলিং' দিয়ে বোঝাতে যায়, তো তার দশাও ভবেশবাবুর মত হবে। কথায় কি মনের ভাব বোঝানো যায়?

মেনকা তার পাশে বসে আছে। তার গায়ে সুশীলের গা ঠেকছে। আর সুশীলের সর্বশরীরে বয়ে চলেছে উন্মাদ রক্তের অস্থির স্রোত। সে যদি মেনকাকে হারায় এ-স্রোতের গতিও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে। নিমেষে তার জীবন বিস্বাদ হয়ে পড়বে মিয়ানো পাঁপরের মত। কি করে এসব তাৎপর্য সে ভাষায় ফুটিয়ে তুলবে? তার চেয়ে বেশি কথা না বলে, চাঁছা-ছোলা ভাবে তার দাবিটা পেশ করা অনেক ভাল বলে সে বোধ করল।

নড়ে চড়ে বসতেই মেনকার গায়ে আবার তার গা ঠেকে গেল। তীব্র এক অনুভূতির ঝাঁঝালো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ মুহূর্তের মধ্যে তার দেহে সাঁতার খেলে বেড়ালো। সুশীলের সত্তা পুলকের স্পর্শে চাঙ্গা হয়ে উঠল। আর কোন মেয়ের স্পর্শে তো এমনটি হয় না। মেনকাকে যতবার জড়িয়ে ধরেছে সুশীল, ওর দেহের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিয়ে দিয়েছে নিজের দেহ, ততবারই সে অনুভব করেছে যে তার ত্বকের কোষে কোষে রক্তের কণায় কণায় বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সমগ্র দেহে যেন ভাঙ্গা গড়ার খেলা শুরু হয়েছে ভয়াবহ বেগে। প্রতি মুহূর্তে মরে, প্রতি মুহূর্তে বেঁচে সে অনাস্বাদিত এক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এই প্রক্রিয়াকে কি বলবে সুশীল? তার ধারণা, এই হল প্রেম। জীবনকে প্রত্যহই এলোমেলো করে দিয়ে আবার সুন্দর এক সামঞ্জস্যে যা তাকে সাজিয়ে রাখে, তাই প্রেম। আর মেনকাই তাকে সে প্রেম দিতে পেরেছে। দিয়েছে দেহমন উজাড় করে। ফাঁকা রাখেনি, ফাঁক রাখেনি কোথাও।

যতদিন মেনকা ভবেশবাবুর আশ্রয়ে ছিল, ততদিন তারা কিছু মিথ্যার আশ্রয়, কিছুটা শঠতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছিল।

কিন্তু প্রেম তার পৌরুষকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সে কেন কাপুরুষের মত ব্যবহার করবে? তার জীবন, তার সন্তান পরাশ্রয়ে পালিত হচ্ছে আর সে সেখানে অভিসারে যাচ্ছে চোরের মত, এই দীনতায় সে প্রতিদিন ক্ষুব্ধ হয়েছে। এইরকম ছলনার আশ্রয় নিতে তার পৌরুষ বিদ্রোহ করেছে রোজ। কিন্তু মেনকার মুখ চেয়ে সে সব সহ্য করেছে। এ বরং ভালোই হয়েছে। আজ, সব প্রকাশ হবে। কিন্তু কি প্রকাশ হবে? সত্য? সত্যমেব জয়তে। এমন এক নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে সত্যকে বোধহয় কেউ ব্যবহার করেনি।

আমার নাম সুশীলকুমার মিত্র। দারোগার দিকে চেয়ে সুশীল নিরুত্তাপ গলায় বলল।

পিতার নাম অমরকৃষ্ণ মিত্র। নিবাস পাটনা। আমার কথা বিশেষ বলবার নেই। আমি মেনকাকে ভালবাসি। ঐ সন্তানটি আমারই।

মিথ্যে কথা। ভবেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। খুকু ভয় পেয়ে চমকে কেঁদে উঠল। ভবেশবাবু তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। খুকুর গালে মুখে চুমু খেয়ে তাকে শান্ত করলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, মিথ্যে কথা। এ আমার মেয়ে।

সুশীল বলল, না ভবেশবাবু, (এই প্রথম স্যর না বলে সুশীল তার নাম ধরে ডাকল) খুকু আমারই মেয়ে।

ভবেশবাবু কোন কথা না বলে অনেকক্ষণ ধরে সুশীলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আবার সারা ঘরে এক অসম্ভব ভারী নিস্তব্ধতা নেমে এল। নড়বড়ে পাখাটা যেন তার ভোঁতা ব্লেড দিয়ে কচ্‌কচ্‌ আওয়াজ তুলে সেই নৈঃশব্দ্য কুচিকুচি করে কাটতে লাগল। এক নিদারুণ অব্যক্ত ব্যথায় ভবেশবাবু একেবারে বোবা হয়ে গেলেন। খুকুর উপর তিনি আর নজর দিচ্ছেন না দেখে সে খুঁতখুঁত করতে শুরু করল।

সুশীলই প্রথমে স্তব্ধতা ভাঙ্গল। এক অস্বস্তির হাত থেকে রেহাই পাওয়ায় সে অনেক হাল্কা বোধ করল। গত দেড়টা বছর ধরে এই একটা চাপা অস্বস্তি ঘুষঘুষে জ্বরের মত তাকে তিলে তিলে দগ্ধে মারছিল। আঃ, সে জ্বর এতদিনে ছাড়ল।

সুশীল বলল, আমার আর মেনকার প্রেমের চিহ্ন ঐ খুকুই। আমি মেনকাকে আইনত এখনও বিয়ে করিনি, এবার করব। কলকাতায় আমরা সেইজন্যই এসেছি। এই হল আমার বক্তব্য।

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ভবেশবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?

উনি আমার প্রোফেসর। মেনকার সঙ্গে আমার পরিচয় উনি নিজেই করিয়ে দেন। আমাকে বিশ্বাসও করতেন খুব। মেনকার সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করবার সুযোগও উনিই করে দেন।

মেনকার মনে পড়ল, হ্যাঁ ভবেশবাবুই একদিন নিয়ে এলেন সুশীলকে। খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিল। ভবেশবাবু যখন বললেন, দ্যাখ কাকে এনেছি মেনকা, তখন চেয়ে দেখে সে লজ্জায় লাল হয়ে অন্যদিকে চেয়ে আছে। সেদিন হাসিই পেয়েছিল মেনকার। সুশীলকে সেদিন খোকা খোকা বলে মনে হচ্ছিল তার। ভবেশবাবু বললেন, এবার এম এস-সি পাশ করেছে। কেমিস্ট্রিতে। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হতে পারেনি। সেকেণ্ড হয়েছে তাই দুঃখ। অথচ ঐ আমার সব থেকে ভাল ছাত্র। তা আমি বলেছি, দুঃখ কি? পরীক্ষার ফল দিয়ে সব সময় মেরিট বিচার করা যায় না। কাজে নিজের ওয়ার্থ দেখাও। রিসার্চ কর আমার সঙ্গে। তা রাজী হয়েছে। এবার থেকে তোমার সংসারে আরেকটি পোষ্য বাড়ল। কথাটা বলেই ভবেশবাবু হা-হা করে এমন জোরে হেসেছিলেন যে তার ধাক্কায় সুশীলের লজ্জা আর তার সঙ্কোচ নিমেষে দূর হয়ে গিয়েছিল।

হ্যাঁ সেটা তখন মেনকার সংসারই বটে। সে তখন পুরো গিন্নী। ভবেশবাবুর আশ্রয়ে দু'বছর আগে, যেদিন মেনকা আসে সেদিন, এমন কি নিরুপায় হয়ে লজ্জা বাঁচাবার জন্য সে যেদিন ভবেশবাবুর ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে পরে, সেদিনও বুঝতে পারেনি, তার কপালে কোনদিন এত সুখ হবে। এক পুরো সংসারের কর্ত্রী সে কখনো হতে পারবে।

ভবেশবাবু তার হাতে শুধু সংসারই তুলে দেননি, দিয়েছিলেন নিজেকেও। ধীরে ধীরে। একটু একটু করে। মেনকা আশ্রয় পেল, নিরাপত্তা পেল। আর স্বস্তি পেল। উদ্বাস্তু শিবিরের নারকীয় দুঃস্বপ্নের গ্রাস থেকে সে মুক্ত হল। ভবেশবাবু তাকে মর্যাদা দিয়েই তাঁর সংসারে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তবুও আজ ঘণ্টা দুয়েক আগে ভবেশবাবু যে সময় পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দিলেন, তখন মেনকা এ সব কথা ভুলেই গিয়েছিল। পিশাচ বলে মনে হচ্ছিল ভবেশবাবুকে। কি বিশ্রী লাগছিল তাঁকে।

এখন মেনকা চেয়ে দেখল। হতভম্ব ভবেশবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছেন সুশীলের দিকে। কখন খুকুকে কোল থেকে নামিয়ে যে টেবিলের উপর শুইয়ে দিয়েছেন তিনি, তা বোধ হয় নিজেও জানেন না। খুকু ছটফট করছে। খুঁতখুঁত করে কাঁদতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু ভবেশবাবু নিশ্চল। অথচ এই খুকুর জন্য, মেনকার মনে পড়ল, ভবেশবাবু কাজকর্ম বিসর্জন দিয়েছিলেন। মেনকা বুঝতে পারল, ভবেশবাবুর মনের দরজা খুকুর জন্য চিরদিন বন্ধ হয়ে গেল। অথচ একে তিনি প্রায় আঁতুড় থেকেই মানুষ করেছেন। মেনকাকে কিছু করতেই দেননি। খুকু ভবেশবাবুর নয়, সুশীলের ঔরসে জন্মেছে। তাই খুকুর উপর সুশীলের দাবী। আর গত নয় মাস ধরে, কোটি কোটি মুহূর্তের দুর্ভাবনা,

দুশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে, গু-মুত ঠেলে যে ভবেশবাবু তাকে বড় করে তুললেন, তার কাছে খুকুর অস্তিত্ব সেই মুহূর্তেই খারিজ হয়ে গেল। কত সহজে।

সুশীল বলল, খুকুর জন্মের সম্ভাবনার পর থেকেই এই লুকোচুরিতে খুব বেশি করে গ্লানি বোধ করেছি। মেনকাকে কত বুঝিয়েছি। ও বুঝতে পারলেও ভবেশবাবুকে ছেড়ে আসতে রাজী হয়নি। খুকু জন্মাল। ভবেশবাবু উল্লসিত হয়ে ওকে নিজের মেয়ে বলে জাহির করতে লাগলেন। আমার পৌরুষে, আমার নীতিবোধে ঘা পড়ল। কেন এই ছলনা? আমি পিতা অথচ মেয়ের উপর আমার কোন দাবী থাকবে না। আমার উপাধি বয়ে বেড়াবে না? সারা জীবন ধরে কাটাবে একটা মিথ্যা দিয়ে গড়া জগতে? এ কিরকম কথা! আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে উঠল। তাই মেনকাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছি। ওকে বিয়ে করব। আমার মেয়ে আইনগত স্বীকৃতি পাবে। তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন যার ভালবাসা পেয়েছি এবার তাকে ষোল আনা পাব।

সুশীল আরো কিছু বলত কিনা কে জানে। খুকু এই সময় প্রবল কান্না জুড়ে দিল। কান্নার চোটে তার গলার শির ফুলে উঠল। সুশীল চুপ করে গেল। মেনকা তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। কিন্তু কান্না থামাতে পারল না।

অস্থির করে তুলল খুকু। কাঁদতে কাঁদতে তার শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল। সুশীল খুব বিব্রত বোধ করল। মেনকাও। সুশীল তাড়াতাড়ি তাকে কোলে তুলে নিল। চুপ চুপ কাঁদে না কাঁদে না বলে তার পিঠ থাবড়াল কিছুক্ষণ। কিন্তু সুবিধে হল না। নিরুপায় হয়ে খুকুকে পাঁজাকোলা করে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। খুকুর কান্না থামল না। মেনকার কোলে তখন চাপিয়ে দিল। দিয়ে বাঁচল সুশীল। এর মধ্যেই তার হাঁফ ধরে গিয়েছে।

মেনকার কোলে গিয়েও কোন পরিবর্তন হল না খুকুর। সে সমানে ককিয়ে ককিয়ে কেঁদে চলল। মেনকা অনেক রকমে তাকে ভোলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা।

ভবেশবাবুর চেতনা যেন ধীরে ধীরে ফিরে আসতে লাগল। সুশীলের কথা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল। ও মেয়ে সুশীলেরই। তাঁর নয়. খুকু সুশীলের মেয়ে। যেই একথা বিশ্বাস হল, অমনি কে যেন শক্ত শক্ত দুটো হাত দিয়ে তাঁর জীবনের উৎসটির টুঁটি টিপে ধরল। কেমন এক পঙ্গুত্ব তাঁকে অসাড় করে দিল। সব উষ্ণতা ধীরে ধীরে জমাট এক হিমে রূপায়িত হয়ে গেল। কোথা থেকে এল শান্তি। মৃত্যুর মত হিম-শীতল শান্তি। কারো উপর তাঁর আর রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই, আক্রোশ নেই। কোন কিছুতে আগ্রহও নেই ভবেশবাবুর। খুকুকে কোল থেকে টেবিলে নামিয়ে দিলেন। কখন, তাও তাঁর মনে রইল না। তাঁর চাঞ্চল্য, তাঁর অস্থিরতা, সব নিথর হয়ে গেল। কেউ নেই ভবেশবাবুর, কিছু নেই।

খুকুর কান্নায় ভবেশবাবুর চেতনার বন্ধ দরজায় ঘা পড়তে শুরু করল। ধীরে ধীরে কেমন এক অব্যক্ত অস্বস্তি, এক শারীরিক যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। খুকু খুব জোরে কেঁদে উঠল। ভবেশবাবু চমকে চেয়ে দেখলেন, মেনকার কোলে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। মুখ চোখ লাল। চোখের জল আর মুখের লালা একসঙ্গে বেরিয়ে বুক ভাসিয়ে দিচ্ছে তার। ভবেশবাবুর মন অভ্যাসবশে সসব্যস্তেই খুকুর দিকে এগিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তেই কে যেন এক গরম ছুরি তাঁর মর্মে বসিয়ে দিল। নিদারুণ যন্ত্রণায় তাঁর মন আর্তনাদ করে উঠল। খুকু সুশীলের সুশীলের খুকু সুশীলের খুকু সুশীলের সুশীলের সুশীলের সুশীলের। তাঁর মগজে কে যেন হাতুড়ি মেরে কথাগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

দুহাতে মাথা ধরে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়ে রইলেন তিনি। মনে হল তাঁর মাথা, বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

মেনকা কিছুতেই খুকুর কান্না থামাতে পারল না। তাই সুশীল আবার তাকে কোলে তুলে নিল। এবার অনিচ্ছায়। একটু বিরক্ত হল। কানের কাছে একটানা এই অবুঝ কান্না আর কাহাতক সহ্য করা যায়। ছোট দারোগা দু' একবার টেবিল চাপড়ে, ঠং ঠং আওয়াজ করে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা। বড় দারোগা বিরস হয়ে সুশীলকে বললেন, ওঃ লাইফ একেবারে হেল করে দিলে। থামান মশাই, আগে আপনার মেয়েকে থামান। কাজকর্ম পরে হবে। কুণ্ডু, আমি ওঘরে আছি। দারোগাবাবু উঠে গেলেন।

সুশীল বিলক্ষণ রেগে গেল। দারোগাবাবুর কথায় তার অভিমান আহত হল। মেনকা বুঝতে পারল, সুশীল রেগেছে। বিব্রত হয়ে সে খুকুকে নিতে গেল। সুশীল দিল না। খুকুকে শক্ত করে ধরে দুমদাম পা ফেলে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ভবেশবাবু মুখ তুলে সব দেখছিলেন। খুকুর দাপটে মেনকা আর সুশীল দুজনেই প্রায় কাত। সুশীল রেগেছে আর মেনকা বিব্রত হয়েছে। সুশীল খুকুর বাবা আর মেনকা মা। দুজনকেই জব্দ করেছে খুকু। তিনি যা পারেন নি, খুকুই তা পারল। বাঃ বেশ। বেশ বেশ বেশ। খুব মজা লাগল ভবেশবাবুর।

দেখ দেখ, সুশীলের কাণ্ড দেখ। নিজেকেই ডেকে ডেকে দেখাতে লাগলেন। বাপ হয়েছে! আমি বাপ! নিজের সন্তানকে সামলাতে পারে না, আবার এদিকে বাপ বাপ বলে জাহির করার সময় গলাটা লম্বা হয়ে যায়।

জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না। ভবেশবাবু মনে মনেই বললেন। জন্মদানই যদি পিতৃত্বের একমাত্র গুণ হত তাহ'লে বাঘ ভাল্লুকও এক একটা পিতা বনে যেত।

খুকুকে জন্ম দেওয়া ছাড়া সুশীলের সঙ্গে তার আর কোথায় সম্পর্ক। আঁতুড় ঘর থেকে বেরুবার পর সেই যে খুকু ভবেশবাবুর কোলে পিঠে চড়েছে

আর আজ পর্যন্ত নামেনি। খুকু কেন কাঁদছে, মেনকাও তা ভাল জানে না কিন্তু ভবেশবাবু জানেন। খুকুর খাবার সময় হয়েছে। এই সময়ে খুকু দুধ খায়। ভবেশবাবুকেই খাওয়াতে হয়। আর কারো কাছ থেকে সে খায় না। খাওয়ার পর ভবশবোবুর কোলে শুয়ে সে ঘুমুবে। আর সে সময় ছড়া বলতে হবে গুণগুণ করে। হাঁটু দুলিয়ে দুলিয়ে। সমস্ত ছবিটা ভবেশবাবুর মনে গাঁথা।

এই যে প্রতিদিনকার খেদমত, প্রতি মুহূর্তের সাহচর্য, আশঙ্কা, আতঙ্ক, ভয় (যদি অসুখ হয় খুকুর, যদি মরে যায়) হর্ষ, সুখ—এ-সবের বিনিময়ে তিল তিল করে খুকুর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেটা যদি পিতৃত্ব না হয় তবে পিতৃত্ব কি? ঘোড়ার ডিম?

কিন্তু তিনি করছেন কী? ভবেশবাবু নিজেকে যেন চাবুক মারলেন। কেঁদে কেঁদে খুকুর যে ওদিকে মরে যাবার অবস্থা হয়েছে। এক্ষুনি জ্বর এসে যাবে খুকুর। বেশী কাঁদলেই তার জ্বর হয়। ভবেশবাবু সে কথা তো জানেন।

তিনি আর বসে থাকতে পারলেন না। সোজা এগিয়ে গেলেন সুশীলের কাছে। বললেন, দাও ওকে আমার কাছে।

সুশীল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তৎক্ষণাৎ খুকুকে ভবেশবাবুর কোলে তুলে দিল। এত সহজে ঝামেলার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ায় সে ভবেশবাবুর উপর খুশীই হল মনে মনে।

ভবেশবাবু ছোট দারোগাবাবুকে বললেন, চট করে খানিকটা গরম দুধ আনিয়ে দিন।

ছোট দারোগা কনস্টেবল একজনকে হুকুম করতেই সে এক কাপ গরম দুধ এনে দিল।

ভবেশবাবু মেনকাকে বললেন, এই প্রথম তাঁর মেনকার সঙ্গে কথা, ঝিনুক বাটি আছে?

মেনকা বলল, আছে। ঐ ছোট থলেটায়।

ভবেশবাবু চটপট ঝিনুকবাটি বের করলেন, খুকুর মুখ চোখ থেকে জল লালা মুছিয়ে দিলেন। তারপর মেঝের উপর আসন পিঁড়ি হয়ে বসে অভ্যস্ত হাতে দুধ খাওয়াতে বসলেন। প্রথম ঢোঁক দুধ গিলে খুকু বিষম খেল। নাকমুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ভবেশবাবু আরো সাবধান হলেন। কয়েক ঢোঁক দুধ গিলেই খুকুর কান্না থেমে গেল। তখন শুধু ফোঁপাতে লাগল। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে খুকুর পিঠে চাপড় দিয়ে দিয়ে, গুনগুন করে ছড়া কেটে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ভবেশবাবু। যেন ম্যাজিক। দশ মিনিটের মধ্যে সব শান্ত হয়ে গেল। ভবেশবাবু টেবিলের উপর আবার তাকে শুইয়ে দিলেন। খুকু মুখের মধ্যে আঙ্গুল পুরে অকাতরে ঘুমুতে লাগল। শুধু পাখাটা খচ খচ শব্দ করে ঘুরতে লাগল।

বড় দারোগা ফিরে এলেন। চেয়ারে বসলেন। তারপর মেনকার দিকে চোখ চেয়ে বললেন, এইবার আপনার। মেনকার বুকটা ধড়াস করে উঠল।

৪

আমার নাম মেনকা। বাবার নাম ফটিকচন্দ্র চক্রবর্তী। পাকিস্তানে বাড়ি। কুষ্ঠিয়ার কাছে সেনহাটি।

মেনকা যতটা ঘাবড়েছিল, এখন ততটাই সহজ হয়ে এসেছে। বেশ বলে যাচ্ছে। কোথাও বাধছে না।

ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে বলল, উনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, একথা সত্যি। শুধু আশ্রয় দিয়েছিলেন, একথা বললে, ওঁকে ছোট করা হয়। উনি আমাকে নতুন জন্মে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওঁর কাছে যখন আসি, তখন আর আমার অবশিষ্ট কিছু ছিল না। মানুষ বলতে যদি হাড় মাংস দিয়ে গড়া একটা জীবিত অবয়ব বোঝায়, তবে তখনও আমি মানুষ ছিলাম। কিন্তু ঐ অবয়ব-টুকুই, তার বেশী আর আমার তখন কিছু ছিল না।

ওঁর আশ্রয়ে আসবার বছর পাঁচ ছয় আগেও আমার সব ছিল। বাড়ি, ঘর, আশা, ভবিষ্যৎ—সব। কিন্তু যে রাত্রে আমাদের বাড়ি লুঠ হল, বাবা খুন হলেন, ভাইয়েরা পালাল, আমার কুমারী দেহটা বারকয়েক ধর্ষিত হল দুর্বৃত্তদের হাতে, সেদিন থেকে তিলে তিলে আমার সব গেছে।

পালিয়ে এলাম ভারতে। নিরাপদ আশ্রয়ের আশা তখনও ছিল। শুনেছিলাম সীমান্ত পার হলেই নিশ্চিন্ত হতে পারব। ওদিকে আশ্রয় আছে। মান সম্ভ্রমের মূল্য আছে। সীতার দেশে, সাবিত্রীর দেশে সতীধর্ম অটুট রাখবার কাণ্ডারী আছে। তাই জীবন তুচ্ছ করে ছুটে এলাম পশ্চিমবঙ্গে। স্থান পেলাম উদ্বাস্তু শিবিরে। কিন্তু সেখানেও আমার রূপ আর যৌবন নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারিনি। নিরুপায় হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলি হয়েছি। দেহ দিতে বাধ্য হয়েছি নানাজনকে।

দেহটার জন্য আর ভাবনার কিছু ছিল না। অভিজ্ঞতায় জানলাম, সে ভাবনা নামগোত্রহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের কাছে শুচিবাই ছাড়া আর কিছু নয়। তবু উদ্বাস্তু শিবির ছেড়ে পালিয়েছি। কারণ থাকতে পারিনি। মৃত আর অথর্ব ছাড়া কেউ সেখানে থাকতে পারে না।

এমনি অবস্থায় আমি ওঁর কাছে আসি। আর উনি আমাকে আশ্রয় দেন। শুধু কি বাড়িতে থাকবার ঠাঁই? না, শুধু ঐটুকুই নয়, যদিও ওটুকু পেলেই আমি বর্তে যেতাম, উনি আমাকে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন, মর্যাদা দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন আস্ত একটা সংসার। আর সেই সংসার নিয়েই কাটিয়ে দিলাম দুটি বছর। এখন কেমন স্বপ্ন বলে মনে হয় সে কথা।

মেনকা সুশীলের দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, এই সময় সুশীল এসে হাজির হল আমাদের পরিবারে।

সেই সময় ওঁর মনে, মেনকা ভবেশবাবুর দিকে চেয়ে বলল, অশান্তি দেখা দিয়েছে। আমাকে পেয়ে উনিও তখন নতুন লোক হয়ে গেছেন। প্রথমদিকে কি বিশৃঙ্খলা ছিল ওঁর সংসারে। ওঁর নিজেরও যেন কোন দায় দায়িত্ব ছিল না। ধীরে ধীরে আমার হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলেন। সংসারটিই শুধু নয়। নিজেকেও। উনি বলতেন, এতদিন লক্ষ্মীছাড়া ছিলাম। এবার লক্ষ্মী এসেছে আর ভাবনা নেই।

সব লোক তাঁদের বিয়ে করা স্ত্রীকেও এত সম্মান, এত প্রতিষ্ঠা, এত স্নেহ ভালবাসা হয়ত দেয় না। প্রতিদানে আমি সর্বক্ষণ চেষ্টা করতাম, ওঁকে তৃপ্তি দিতে, সুখ দিতে। উনি সুখ পেলে আমি পরম সুখে ভাসতাম।

বছর দেড়েক এমনি কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন দেখি ওঁর খুঁতখুঁতানি বাড়ছে। এত পেয়েও ওঁর আকাঙ্ক্ষা মেটেনি। সবই যদি পেলেন তবে একটা সন্তানই বা পাবেন না কেন? সন্তানের ক্ষুধা দিনের পর দিন ওঁকে গ্রাস করে ফেলল। ওর সুখ শান্তি নষ্ট হতে বসল। সেই সঙ্গে আমারও। আমি অনেক-রকমে চেষ্টা করে দেখলাম। শেষে বুঝতে পারলাম, ওঁর ক্ষমতায় সন্তান আমার কোনদিনই হবে না। আবার এ-ও ঠিক, সন্তান একটা না দিলে, ওঁরও মনে শান্তি আসবে না।

ঠিক এমন মুহূর্তেই উনি একদিন সুশীলকে নিয়ে এলেন। সুশীল ওঁর সহকারী হয়ে এল। দুজনে প্রাণপণে শুরু করলেন গবেষণা। ল্যাবরেটরী আর ল্যাবরেটরী। আর অঙ্ক আর ফর্মুলা।

সুশীলের সঙ্গে আমারও এক সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠল।

মেনকার মনে পড়ল সেই দিনগুলোর কথা। তিনজনের হাসি, ঠাট্টা, ছেলে-মানুষীতে কি মধুরই না হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু, মেনকা বলল, প্রতিরাত্রে টের পেতাম, কি অসহনীয় এক আকাঙ্ক্ষা এক অতৃপ্তি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন উনি। ওঁর বুকটা যেন শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে। শ্বাস প্রশ্বাসে পর্যন্ত সন্তানের কামনা ঝরে ঝরে পড়ছে। আমার খুব কষ্ট হল। ঠাকুর দেবতাকে কখনও ডাকিনি। এবার থেকে প্রাণপণে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম। তারপর বুঝলাম, শুধু প্রার্থনা করলেই পেটে ছেলে আসবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এই সময় সুশীলের কথা আমার মনে পড়ল।

মেনকা বুঝতে পেরেছিল, তার সংস্পর্শে এসে সুশীলের পৌরুষ জাগ্রত হতে শুরু করেছে।

বলল, ধীরে ধীরে সুশীলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করলাম। ফলও পেলাম হাতে হাতে।

ভবেশবাবুর দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল মেনকা। তারপর বলল, যে রাত্রে ওঁকে জানালাম আমার বাচ্চা হবে, সে রাত্রে ওঁর কি উল্লাস! কি ফুর্তি! আমায় যেন মাথায় নিয়ে নাচবেন।

মেনকারও সেদিন খুব ভাল লেগেছিল। এই তার প্রথম মনে হল, সে তার বহুভোগ্য দেহটাকে এক পরম পবিত্র কাজে লাগিয়েছে। তার নারীজন্ম সার্থক হয়েছে। ভবেশবাবুর কামনা পূর্ণ করা যেন তার জন্মের ঋণ শোধ করা। ছেলে, ছেলে, ছেলে। ভবেশবাবু উল্লাসে যেন ফেটে পড়লেন।

ভবেশবাবু দ্বিগুণ ভালবাসতে শুরু করলেন মেনকাকে। তাঁর উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত রইল না। এই সময় মেনকাকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন ভবেশবাবু। একদিন গঙ্গায় চান করে কালী মন্দিরে এনে এক ছড়া গাঁদা ফুলের মালা তার গলায় ভবেশবাবু পরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, বুড়ো বয়সে টোপর পরতে আমার ভয়ানক লজ্জা করে, তবে তুমি যদি বল, আমি তাও করতে রাজী আছি। আর নইলে, এই বিয়েই পাকা হয়ে গেল।

মেনকা আগে হলে এতে রাজী হত কিনা, কে জানে? তবে ওর অভিজ্ঞতায় ও জানে, অনুষ্ঠান থেকে নিরাপত্তা অনেক বড় জিনিস। তাই খুশী হয়েই রাজী হল। কলকাতা থেকে ফিরে এসে সে সুশীলকেও সংবাদটা দিয়েছিল। সুশীল প্রথমটা যেন ঘাবড়ে গিয়েছিল। যেন কিছু ভয় পেয়েছিল। তারপর যখন মেনকা ওকে বোঝাল যে, সে ওটা ভবেশবাবুর সন্তান বলে চালিয়ে দেবে, সুশীল তখন চুপ করে গেল।

কিন্তু তার পরদিনই সুশীল এসে জানাল, এমন অন্যায় সে করতে দেবে না। তার সন্তান, তারই সন্তান। মেনকাকেও দাবী করল সুশীল। আর সে দাবীর কি জোর!

সেইদিনই মেনকা বুঝতে পারল যে হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। বুঝতে পারল, সুশীল তার গর্ভে সন্তানই শুধু দেয়নি, তার হৃদয়ে প্রেমেরও জন্ম দিয়েছে।

মেনকার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, এ এক আনকোরা নতুন আস্বাদ। মাধুর্য-ভরা এ এক নতুন যন্ত্রণা।

মেনকা বলল, গত এক বছর ধরে অনবরত এই যন্ত্রণার দাবদাহে পুড়েছি। সুশীলকে ঘিরে এই যন্ত্রণার উৎপত্তি। ওকে দেখলে আনন্দের আগুনে জ্বলি, না দেখলে দুঃখের তাপে জ্বলি। কাছে যখন আসে তখন অসহ্য এক কষ্ট ভোগ করি। দূরে যখন যায় তখনও এই কষ্ট। যেন নিদারুণ জ্বর হয়েছে আমার। সুশীলের দেখা পেলে, ওর কথা কানে গেলে সমগ্র শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে। এক তীব্র অনুভূতি গর্ভ থেকে পাক-খেতে খেতে উঠে আসে। অনেকদিন এ-যন্ত্রণা সহ্য করেছি। আমি প্রাণপণে ওঁর আশ্রয়, ওঁর সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকতে চেষ্টা করেছি। পারিনি। আর শেষ পর্যন্ত সহ্য করতে পারলাম না।

উপেক্ষা করতে পারলাম না সুশীলের দাবী। আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নেই। সুশীলের উপর নির্ভর করেছি। যেখানে নিয়ে যায় যাব।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, প্রেমে সুখ আছে। একথা মিথ্যে। সুখের জন্যে কেউ প্রেম করে না। ওটা নিদারুণ ভবিতব্য। মৃত্যু যদি যম-যন্ত্রণা হয়, প্রেম তবে জীবন-যন্ত্রণা। আর এই যন্ত্রণার আস্বাদ যখন থেকে টের পেয়েছি, সেইক্ষণ থেকেই আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। কিছু ভাবিওনে। আর কিছুতে ভয়ও পাইনে।

কি করব, মেনকা প্রাণপণে বলে উঠল, আমার কি হাত আছে?

সত্যিই খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে মেনকা। কথা বলতে গিয়ে হাঁফাচ্ছে। কথাগুলো কোনরকমে শেষ করে টেবিলে মাথা দিয়ে সে হাঁফাতে লাগল।

সুশীল ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল। ভবেশবাবু চুপচাপ বসে রইলেন। কেন জানি, তাঁর চোখ দুটো করকর করতে লাগল। দুবার রগড়ে নিলেন হাতের ওপিঠ দিয়ে। তবু সে চোখ-করকরানি থামতে চায় না।

বড় দারোগা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। যেন কর্তব্যটা মনে মনে ঠিক করে নিলেন।

তারপর বললেন, কুণ্ডু, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কানেকশনটা নাও।

কুণ্ডু কানেকশান নিয়ে বড় দারোগাবাবুকে দিল। তিনি বললেন, স্যর জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। কেসটা স্যর বেশ জটিল বলে মনে হচ্ছে। কি করব স্যর? ও আচ্ছা আচ্ছা। কাল হাজির করব। আর ও দুজনকে? আচ্ছা স্যর। বেশ, না স্যর, ওরা কেউ বাজে টাইপের নন। পালাবার লোক নন। আচ্ছা স্যর, নমস্কার।

ফোনটা রেখে বড় দারোগা বললেন, দেখুন মেনকাদেবী আর তার বাচ্চাকে আমরা আজ আমাদের হেফাজতে রেখে দিচ্ছি। আপনারা দু'জন কাল সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে এখানে এসে যাবেন। তখন কোর্টে নিয়ে যাব। সেখানেই ফয়শালা হবে। কি বলেন?

সত্যপ্রিয় ঘোষ

ঢাকের বাড়ির প্রথম আওয়াজটা যেন হৃৎপিণ্ডটার ওপরই এসে পড়লো বৃদ্ধ দুর্গাচরণের। পাঁজরা-বের-করা হাড়-জিরজিরে ছিয়াশি বছরের বার্ধক্যে জীর্ণ ভাঙাচোরা দেহের খাঁচাখানার তলে দুর্বল হৃৎপিণ্ডটার ধুকপুকোনি সংগেসংগেই ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো না বটে, কিন্তু হাতের সুচটা কেঁপে উঠে ফুটে গেলো আঙুলে। পুজোর এখনো একমাস দেরি—এরই মধ্যে বেজে উঠলো ঢাক!

বলির বাজনা! সংগে কাঁসি। কে বাজায় এমন বাজনা! তাঁর খা-খা পোড়া শ্মশানের মতো বুকটার মধ্যে ফাৎ-ফাৎ ক'রে ওঠে—এ নিশ্চয় বরিশালের কোন নর। গতসনের পুজোয় তো তিনি শুনেছেন এদেশী নরেদের বাজনা—ঢাকের এমন বোল তুলতে তারা জানে না।

উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন বৃদ্ধ। একদা যিনি ছিলেন মৈমনসিংহ জেলা জজ কোর্টের নাজির এবং বরিশাল জেলার চন্দ্রদ্বীপ পরগনায় ছিলো যাঁর বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি, চকমিলান বাড়ী ছিলো বাণারিপাড়া গ্রামে আর দুর্গাপুজোয় যাঁর বাড়ীতে বলিদান হ'ত চারটে পাঁঠার সংগে একটা মোষও, সেই তালেবর ব্যক্তি ইজ্জতাছার তালুকদার বাবু দুর্গাচরণ দত্ত এখন পাকিস্তানের গ্রাসে জোতজমা তালুক-মালামাল সমস্ত খুইয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন কলকাতার বৈঠকখানা বাজারের মধ্যে, বেঢপ লক্ষ্মীছাড়া গড়নের একটা তেতলা বাড়ীর তিনতলার এক ঘুপচির মধ্যে। সাত ছেলে তাঁর ডাক্তার এঞ্জিনীয়র মোক্তার পোস্টমাস্টার আর বাকি তিনটি বাটপাড়। পাকিস্তান হবার পরে ভিটেমাটি ছেড়ে সবাই যখন পালিয়ে এলো, একে-একে, তখনো যে দুর্গাচরণ গ্রাম ছাড়েননি সে-কেবল সাত-পুরুষের ভিটেমাটির মায়াবশতই নয়—আরো দুটি কারণ ছিলো অত্যন্ত নিগূঢ়। সারাটা জীবন টাকা কুড়োতে আর মামলা ফাঁদতে দুর্গাচরণ নিশ্বাস ফেলার সময় পাননি, কিন্তু তার পরিণতিতে এই শেষ জীবনেও দু-দণ্ড শান্তির নিশ্বাস ফেলবার জায়গা তিনি পাবেন না তাঁর ছেলেমেয়ে-নাতিপুতি দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড সংসারখানার মধ্যে কোথাও, তা কি আর তিনি বুঝেছিলেন! যদিও ছেলেমেয়েরা কিন্তু তাদের বাপ-মাকে ফেলে রাখতে চায়নি পাকিস্তানে, আর সকলের মতো তারাও ধমক-ধামক যুক্তি-উপদেশ এবং এমনকি অনুনয়-বিনয়ও ডাক ও তারযোগে পাঠিয়েছে উপর্যুপরি। এবং শেষ পর্যন্ত এক ছেলে গিয়ে যখন জোর ক'রেই বুড়ী মাকে নিয়ে এলো কলকাতায় তখনো কিন্তু অশীতিপর

বৃদ্ধের গোঁ ভাঙেনি—বুড়োহাবড়া এক চাকর সহায় ক'রে একাই থেকে গেলেন গাঁয়ে। কিন্তু সেই গোঁ ভাঙলো যখন গতসনের পুজোর আগে ওদিকটায় চালের দর উঠলো পঞ্চাশে এবং তাঁরই মতো গাঁয়ের আরেকজন গোঁয়ার যখন মহালে খাজনা আদায় করতে গিয়ে আর ফিরলেন না—শোনা গেলো প্রজারা তাঁকে টুকরো টুকরো ক'রে কেটে খালের জলে ফেলে দিয়েছে।

এসে উঠলেন দুর্গাচরণ এই শেয়ালদা বৈঠকখানা রোডে, তাঁর বড়োছেলের বাসায়।

পা মুড়ে বুকের সঙ্গে হাঁটু মিশিয়ে উবু হয়ে ব'সে পচা তুলো বেরিয়ে-পড়া তেলচিটচিটে পরিত্যক্ত একটা বালিশ মেরামত করছিলেন দুর্গাচরণ। বালিশের বড়ো অভাব ব'লে নয়—প্রথম কথা এক মুহূর্ত তিনি নিষ্কর্মা ব'সে থাকতে পারেন না—আর তাছাড়া এমনি সব কাজ যেমন ছেঁড়া সেলাই করা, ঝামা দিয়ে ঘষে ঘষে ড্রেন-কলতলার শ্যাওলা তোলা, নর্দমা-পায়খানা পরিষ্কার করা, দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটা, পাই পয়সার হিসেব লেখা আর কেউ কিছু বললেই খ্যাঁকখ্যাঁক কুৎসিত গালিগালাজ করা—এ ছাড়া তিনি অন্য কিছু করার খুঁজে পান না কলকাতার এই দম-আটকানো ইঁদুরের গর্তের মধ্যে।

বেলা বাজে এখন চারটে। একফালি হলদে রোদ প'ড়ে আছে দোরগোড়ায়। পিচুটিমাখা ছানি-পড়া চোখদুটো বৃদ্ধের দেখলে অন্ধ ব'লে মনে হয়, পিঠের শিরদাঁড়াটা এমনি ব'সে থেকে-থেকে যেন দুমড়ে ভেঙে-ভেঙে গেছে, হাঁটুর ওপর ঝুলে-পড়া মাথাটা থেকে-থেকে ঝেঁকে ওঠে আর ফাৎ-ফাৎ দীর্ঘনিশ্বাস উঠে আসে পাঁজরা কাঁপিয়ে—কিন্তু হাতের সূচ দুর্গাচরণের কাঁপতে-কাঁপতে বড়ো-বড়ো ফোঁড় তোলে ঠিক। তাই চলছিল—এমনি সময় বাজারের দিক থেকে ভেসে এলো ঐ ঢাকের আওয়াজ, চমকে কেঁপে উঠে সূচটা ফুটে গেলো দুর্গাচরণের কড়া-পড়া ঠান্ডা একটা আঙুলে।

পাগলা বাজনা! রুদ্ধ নিশ্বাসে বৃদ্ধ কাল জপেন—কখন্ ঢাক রামদার কোপ পড়ার সঙ্গেসঙ্গে তীব্র উল্লাসে নেচে উঠবে! তিরতির ক'রে কাঁপতে থাকে দু হাতের পাতা। আর সত্যিই, যখন সত্যিই ঢাকটা উন্মাদ উল্লাসে বেজে উঠলো বলি হ'য়ে যাবার—স্তম্ভিত বিমুগ্ধ বুকের মধ্যে বৃদ্ধের শীর্ণতোয়া শিরা-উপশিরাগুলি স্ফীত হ'য়ে উঠলো, ছলাৎছলাৎ ঢেউ লাগলো রক্তে, আর গলদশ্রু-ধারে অস্ফুটে কারা যেন সব ধ্বনি দিয়ে উঠলো তাঁর বুকের মধ্যে—দুর্গা প্রীতে হরিবোল! দুর্গা প্রীতে হরিবোল!

উত্তেজনাটা কেটে গেছে, এখন আবার শান্ত হয়েছে ঢাক। কিন্তু থামছে না কেন? ও, বলি বাকি আছে আরো! নবমী পুজো অ্যাঁ! আচ্ছাঃ! সহসা বৃদ্ধ বেশ একটা কৌতুক বোধ করেন। ছানি-পড়া অদৃশ্যপ্রায় চোখদুটি তাঁর হেসে ওঠে আপন মনে।

বাইরের ঘর থেকে তাঁর নাতিপুতিদের সোরগোল আর হার্মোনিয়মের প্যাঁ-পোঁ শোনা যাচ্ছে, ভেতরের ঘর থেকে কানে আসচে ছেলে-বৌয়ের টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কর্কশ কথাকাটাকাটি আর এই মাঝখানের ঘরটায় তিনি ঠায় ব'সে আছেন তাঁর কাজ নিয়ে। পেছনে দেয়ালের কোণে, যেদিকটায় প্যাকিস্তান থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসা তিন বস্তা বাসন-কোসন আর মস্ত মস্ত তিনটে ট্রাঙ্ক ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা আছে, সেইখেনে, সহসা আবিষ্কার করা শক্ত, জবুথবু নিঃসাড় হয়ে ব'সে রয়েছেন বাণারিপাড়া গ্রামে যিনি নাজির-গিন্নী ব'লে পরিচিত ছিলেন—দুর্গাচরণের স্ত্রী, ছিয়াত্তর বছরের এক অনড় বুড়ী। আর, দু-হাতে দুই বালতি নিয়ে একতলা থেকে জল তুলে-তুলে নিয়ে এসে জলের ড্রামটা বোঝাই করছে বিপিন, গাঁয়ের ছেলে ব'লে আশ্রিত হবার সুযোগ পেয়েছে যে এ-বাড়ীতে, কিন্তু কুলীন সে, এ'দের চাইতে পর্যায়ে বড়ো, সুতরাং চাকর বলা যাবে না বিপিনকে, সংসারের-একজন হ'য়ে চাকরের কাজগুলি করতে হয় এইমাত্র ! এবং জলের ড্রামটার ওপাশে নর্দমার পাশে ব'সে যে-ষোড়শীটি বাসন মাজছে তাকেও ঝি বলা উচিত হবে না, কেননা বাণারিপাড়ারই এক বামুনের ঘরের মেয়ে সে, আশ্রিতা হ'য়ে আছে, নাম মালতী।

'ও মণি! ও!'—দুর্গাচরণ ডাকেন মালতীকে—'দ্যাখছেন কয়ডা বাজে।'

'কয়ডা আবার বাজবে। এই তো জল আইলে কলে। চাইরডা।'

বুড়োর মেজাজ কেন-যে সঙ্গেসঙ্গে খিঁচড়ে যায়। খ্যাঁকখ্যাঁক ক'রে ওঠেন একেবারে। কিন্তু কী ব'লে তিনি গালাগালি দিলেন তার কিছুই বোঝা যায় না। মালতী বুঝবার চেষ্টাও করে না। একটুও মলিন হয় না তার মুখের লক্ষ্মীশ্রী।

'আরে ও বিপিন্যা'—জলের বালতি নিয়ে বিপিন আবার ঢুকতেই দুর্গাচরণ বলেন : 'মণি দ্যাখছেন কাঞ্চন আইছে নাকি হাইতনায়।'

বাইরের দিককার ঘরকে তিনি এখনো 'হাইতনা'-ই বলেন। কাঞ্চন তাঁর নাতি, মেজো ছেলের সন্তান।

'এত্তিবারি!'—অর্থাৎ, এক্ষুনি আসবে কাঞ্চন!

বালতি দুটো নামিয়ে বিপিন একটু হাঁফ ছেড়ে নেয়।

দুর্গাচরণের ইচ্ছে হয় ওর মুখটার ওপর একটা লাথি মারেন। কিন্তু এবার দমন করলেন নিজেকে। বলতে গেলেন : 'দেইখ্যা তারপরই কও না মণি'—কিন্তু হঠাৎ গলা আটকে যায় শ্লেষ্মায়।

বিপিন বোঝে। বলে : 'না ঠাউরদাদা, আয় নাই। আইলে আমি ট্যার পাইতাম না? ওহানে পোলাপানরাও তো অস্থির হইয়া পড়ছে হের লইগ্যা।'

এমন সময় বাইরের ঘরে ছেলেমেয়েদের সোরগোল উঠলো।

'ঐ আইছে বুজি'—বলতে বলতে বিপিন এগিয়ে গেলো বাইরের ঘরের দিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে দুর্গাচরণকে শুনিয়ে কাঞ্চনকে বলে : 'ও কাঞ্চন ভাই, তোমারে ডাকে তোমার দাদু—এট্টু শুন্‌ইয়া যাও।'

'না-না-না-না!' একযোগে তুমুল প্রতিবাদ ওঠে ছেলেমেয়েদের।

তা সত্ত্বেও কাঞ্চন দাদুর কাছে আসে। পিছে পিছে ছেলেমেয়েগুলিও। সংখ্যায় ওরা দশ-বারোটি। সাত থেকে সতেরো নানান্ বয়সের। কিচিরমিচির করে।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে তর্জনী তুলে রণং-দেহি মূর্তিতে লীলা এসে বসলো দাদুর মুখোমুখি। যেন সে ছেলেমেয়েদের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবার দায়িত্ব নিলো। বললে : 'না দাদু ঐসব চলবে-টলবে না। মেজদায় এখন গান শিখাইবে আমাগো। পূজা তো আইয়া পড়লো, আর সময় কই কও তো। রোজ রোজ তুমি ইতিহাস ল্যাখাবা, আর আমাগো ই লাগবে না—না!' -বলতে বলতে লীলার গলায় অভিমান ক্রন্দিত হয়ে ওঠে।

'তয় যাঃ'—দুর্গাচরণ ব'লে দেন। মনের বিরক্তি তাঁর আদুরে নাতনীর আব্দারের মুখে হাল ছেড়ে দেয়।

অমনি হৈ-হৈ উল্লাস ছেলেমেয়েগুলির। কাঞ্চনকে ধ'রে টানাটানি লাগিয়ে দেয় বাইরের ঘরে চলবার জন্যে।

'রাগ অইলা দাদু?'—দাদুর থুতনিতে হাত দিয়ে স্নেহে করুণায় সিক্ত হয় লীলার চোখ, মুখ। বলে : 'আমাগো গান শিখানের পর তুমি ইতিহাস লেখাইও, কেমন? এই মেজদা, আইজ রাত্তির দশটা পর্যন্ত থাকবা তুমি। অন্য আর কোথাও যাওন-টাওন নাই আইজ, এই কইয়া রাখলাম।'

চলে যায় ছেলেমেয়েগুলি কলরোলে বাইরের ঘরে। গান শিখতে। যে-গান গাইতে হবে তাদের বিজয়া সম্মেলনে রামমোহন লাইব্রেরী হলে। হবে যা বাণারিপাড়া সম্মিলনীর উদ্যোগে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে হারিয়ে গেছে যে গ্রাম, সেই গ্রামের ছায়া কলকাকলী মর্মরিত হবে সেদিন কলকাতার ছোট্ট এক হলঘরের মধ্যে। সোনালী অক্ষরে 'বাণারিপাড়া সম্মিলনী' লেখা লাল শালুটা টাঙিয়ে দেয়া হবে বাইরে। ভেতরে মন্থিত হবে কত স্মৃতিসমুদ্র। কয়েক ঘণ্টার জন্যে রাজধানীর থেকে বিচ্ছিন্ন ওটা একটা আলাদা জগৎ হয়ে যাবে। তা যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্যে সমবেত উদ্বোধন সংগীতটা এদের গাইতেই হবে। তারই জন্যে এই প্রস্তুতি। কলকাতার এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত থেকে এসেছে দুর্গাচরণের পাঁচ-ছটি নাতনী আর এসেছে গাঁয়ের আরো কয়েকটি মেয়ে। কদিন পর্যন্ত চলছে এমনি। হৈ-হল্লার অন্ত নেই, আসা-যাওয়ার খরচা দুর্গাচরণের পঞ্চম পুত্র শশাঙ্কমোহনের—যিনি এ বাড়ীতেই থাকেন এবং যাঁর নিজের কোন চালচুলো না থাকলেও বর্তমানে প্রকাণ্ড এক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত—কলকাতা বা কোন শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি কয়েক-শো বিঘা জমি নিয়ে নব-বাণারিপাড়া গ্রামের পত্তন করা যায় কি না।

শশাঙ্কর ওপর দুর্গাচরণ হাড়ে-হাড়ে-চটা। 'আধা পয়সার ক্ষ্যামতা নাই,

চ্যাটাং চ্যাটাং বাত মারেন! পোড়াকপাল্ইয়া কথাকার! দ্যাশোম্ধার করেন! দ্যাশোম্ধার!'—এমনি সব কথা তাঁর মুখ থেকে প্রায়ই শোনা যায়।

অথচ সেই শশাঙ্কই সাত বছর পর্যন্ত বাণারিপাড়া সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক। আর সেইজন্যেই কিনা বলা কঠিন, সম্মিলনীর কথায় দুর্গাচরণ রি-রি ক'রে ওঠেন। আবার এই যে বিজয়া-সম্মেলনের ধুমধারাক্কা—এত হা-হা হি-হিঁ, দেখেশুনে তাঁর পিত্তি জ্ব'লে যায়, আপন মনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন, কখনো কখনো বড়ো ছেলেকে ডেকে বলেন : 'এই যে তামসা হওনের লইগ্যা রাইজ্যসুম্ধা মাইয়াগুলানরে লইয়া আসথে আছে রোজ, এয়ার ট্রাম বাসের পয়সা লাগে না? মানা কর্ইয়া দিতে পারো না তুই...সম্মিলনী করেন! সম্মিলনী! গেরামের কপালে মারলি পিছা, এহন এইহানে বইয়া গ্রামোম্ধার করেন! আ—ন্দলন করেন! পোড়াকপাল্ইয়া দমবাজ কথাকার!'

'ওঃ কত বড়ো হুরমুন্দার মাতবর আমার!'—বালিশটা সেলাই করতে করতে গজরাতে থাকেন দুর্গাচরণ : 'লাট-বেলাটের সঙ্গে বাতচিত করেন! আর এদিকে এক মাসের মধ্যেও এট্টা পাসপোর্ট করাইয়া দিতে পারলি না! লক্ষ্মীছাড়া! আধা পয়সার ক্ষ্যামতা থাকলেও বোজ্দাম—'

একমাসের মধ্যেও পাসপোর্ট করিয়ে দিতে পারেনি কথাটা মিথ্যে নয়। বাণারিপাড়া ফিরে যাবার জন্যে দুর্গাচরণ অস্থির হ'য়ে পড়েছেন, পাসপোর্ট করিয়ে দেবার জন্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেছিলেন ছেলেদের। বুড়োকে পাইখানায় যেতেও ধ'রে নিয়ে যেতে হয়, কিন্তু ট্রেন-স্টীমার-নৌকো মেরে গ্রামে ফিরে যেতে পারবেন তিনি একাএকাই! অষ্টপ্রহর খিচখিচ গালি-গালাজ শুনে শুনে বড়ো ছেলে মৃগাঙ্কমোহন শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে শশাঙ্ককে বলেছিলেন : 'দে কর্ইয়া পাসপোর্ট। যাউক মরুক। রাস্তায় পড়্ইয়াই মরুক, তাইলেই ষোল কলা পূর্ণ হয়!' শশাঙ্ক কিন্তু তখন অভিনব এক প্ল্যান কষেন—বুড়োকে বললেন পাসপোর্টের দরখাস্ত করা হয়েছে এখন ফোটো চাই পাস-পোর্টের জন্যে—এক ক্যামেরা এনে ছবিও তোলা হয়ে যাবার পর মনে-মনে যখন বুড়ো একটু আশ্বস্ত হয়েছেন তখন শশাঙ্ক একদিন তাঁকে বললেন : 'কাঞ্চন তো ইতিহাস নিয়া এম্.এ. পড়ে, ওদের একটা পেপার আছে—যার যার নিজের গ্রামের ইতিহাস লিখতে লাগবে। তো কাঞ্চন কইতে আছিল, ও তো বাড়ীর ইতিহাস-টিতিহাস বিশেষ কিছু জানে না—তো আপনে যদি...বাড়ী যাওনের আগে...মুখে মুখে কইয়া গেলেই ও লেইখ্যা লইতে পারবে—'

দুর্গাচরণ কথাটা প্রথমে বুঝতে পারেননি, বার পাঁচ-সাত বলার পর যখন বুঝলেন তখন আরো খিচমিচ ক'রে উঠলেন। অবোধ উত্তেজনার ধমকে বুকের ব্যথাটা এতই চড়ে গিয়েছিল যে সোডা-স্বর্ণসিঁদুর খেয়ে শেষে সুস্থ হন। কিন্তু আশ্চর্য, একটু পরেই যখন কাঞ্চন এসে এ বাড়ীতে হাজির, বুড়ো

কাঞ্চনকে কাগজ-কলম নিয়ে আসতে বললেন। কাঞ্চন তো অবাক—শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন।

সেদিন থেকেই বাণারিপাড়ার ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে।

আশ্চর্য সে ইতিহাস। পাঁচ পুরুষ আগে বাণারিপাড়া গ্রামে তাঁদের বসতি স্থাপন থেকে দুর্গাচরণ শুরু করেছেন। কিন্তু দত্ত বংশের ইতিহাসই শুধু নয়, বাণারিপাড়ার প্রতিটি বংশের ইতিহাস এখনো—এই ছিয়াশি বছর বয়সেও, জ্বলজ্বল করছে তাঁর স্মৃতিতে! শুনেশুনে মাঝে মাঝে কাঞ্চনের কলম থেমে যায়, অবাক তাকিয়ে থাকে দাদুর দিকে—ভাবে, কী ক'রে এটা সম্ভব হয় যে বাণারিপাড়ার দুই বাজারের স্বত্ব নিয়ে শরিকে-শরিকে খামচাখামচি খাওয়া-খায়ির যে বিচিত্র শতাব্দীব্যাপী ইতিহাস, তার বহু মামলার ফলাফল এখনো দাদুর নখদর্পণে? কী ক'রে এটা সম্ভব হয় যে যে-মানুষ জীবনে কোনদিন 'বাণারিপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী'র ছায়াও মাড়াননি, কেননা ওখানে স্বদেশী হয় রাজনীতি হয়—সেই মানুষটিরই ঐ লাইব্রেরীর প্রতিটি নাড়ীনক্ষত্রেরও ইতিহাস জানা আছে? এবং এখনো?

আর আশ্চর্য দুর্গাচরণের পরিবর্তন। বাড়ী ফিরে যাবার জন্যে যাঁর আহার নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল, এই ইতিহাস লেখা শুরু হবার পর থেকে তাঁর আর যাবার তাড়া নেই! বরং এখন তাঁর অস্থিরতা এই-ইতিহাস সম্পূর্ণ করা নিয়ে। তাঁর বড়ো ভয় হয়েছে এখন, পাছে লেখা শেষ হবার আগেই পট ক'রে ম'রে যান।

মাঝেমাঝে আসে না কাঞ্চন, কি দেরী হয় আসতে—আর তখনই বুড়োর পাসপোর্টের কথা মনে প'ড়ে যায়। খ্যাঁকখ্যাঁক গালিগালাজে উৎকট হ'য়ে ওঠে ঘরের আবহাওয়া আর পিকদানিটা ভ'রে যায় থুতু আর গয়ারে।

আর আজকে? কাঞ্চন এলো, কিন্তু এসেও 'তামসা' করতে গেলো 'হাইতনায়'!

'গান শিখায়, গান! স-স্মিলনী হবে! বেহায়া বেলাহাজ কথাকার! আপদ আইয়া জোটছে যত! যা—আমার কী! গোল্লায় যা! কী অইবে ইতিহাস লেইখ্যা—গেরামের কপালে মারলি পিছা, সাতপুরুষের ভিটামাটিরে বানাইলি মরকখোলা—ইতিহাস ল্যাহে ইতিহাস! পোড়াকপাল্ইয়া আদাড় কথাকার!'

'কী সুন্দর পাঠাবলির বাজনা বাজাইলে, ঠিক য্যান আমাগো বাড়ীর মত।'

কথাটা কানে যেতেই দুর্গাচরণের কেমন একটু চমক লাগে। চমকে মুখ তুললেন তিনি মালতীর দিকে। ধোয়া বাসনের পাঁজা নামিয়ে রেখে কথাটা বলেছে সে বিপিনের কাছে।

উৎকর্ণ হলেন দুর্গাচরণ। নাঃ, থেমে গেছে ঢাকটা। কখন্ থামলো কে জানে। আর থামাই ভালো। কী হবে ও-বাজনা বাজিয়ে। বুঝবে কে!

রাগে গর্গর্ ক'রতে থাকেন বুড়ো। সুচটা বালিশে ফুঁড়ে ঠেলে সরিয়ে দেন—এখন আর হবে না সেলাই। ঠেসে নস্যি নিলেন দু-নাকে। ঘনঘন থুথু-কাশি ফেলতে লাগলেন পিকদানিটায়। মেঝেতেই গোটানো তাঁর বিছানাটার

মধ্যে বালিশের তলায় আছে খাতাটা, যার মধ্যে লেখা হচ্চে ঐ-ইতিহাস, সেটা টেনে বের করলেন। কাঁপতে লাগলো খাতাটা তাঁর হাতের মধ্যে। অঙ্গারের মতো জ্বলছে চোখ দুটি তাঁর, সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির তাপে যেন পুড়ে পুড়ে যেতে লাগলো কাঞ্চনের লেখা গোটা-গোটা কালো-কালো অক্ষরগুলো! তাঁর নিজের লেখা অক্ষরও কিছু আছে! যেখানে-যেখানে লিখতে ভুল করেছে কাঞ্চন, অবসর-সময়ে ব'সে-ব'সে সেগুলো তিনি সংশোধন করেছেন! কোথাও কোথাও আবার সংযোজন! দাগ টেনে তারকা-চিহ্ন দিয়ে কাঁপা-কাঁপা অস্পষ্ট অক্ষরে পাশে '—পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য' লিখে পরে সেই-পৃষ্ঠায় সংযোজনগুলো নিজেই লিখে রেখেছেন!

গর্‌গর্‌ করতে করতে বুড়োর বুকের বেদনাটা চাড়া দিয়ে ওঠে।

'আমারে এট্টু সোডা দেছেন। ও মণি!'

কিন্তু কথাটা মালতীর কানে যায় না। সে তখন তন্ময়। কাঞ্চন গান শেখাচ্ছে বাইরের ঘরে—যাদের শেখাচ্ছে তারা এখনো তুলতে পারেনি সুরটা পুরোপুরি, কিন্তু এঘরে ব'সে মালতীর তা তোলা হয়ে গেছে। বাণারিপাড়া থাকতে তো গাইয়ে বলেই নাম ছিলো মালতীর। কিন্তু তাই ব'লে তো সে-ও গিয়ে বসতে পারে না ঐ-দলে। হোক না সে 'বাণারিপাড়া সম্মিলনী'র সম্মেলন! উনুনটায় আঁচ দিতে দিতে ওদের সুরে সুর মিলিয়ে গাইছে মালতী গুনগুন ক'রে :

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী?
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে! ওগো মা!...'

আর এই শুনতে-শুনতে একটা আগুনের গোলা যেন ফাটলো দুর্গাচরণের বুকটার মধ্যে। হাতের কাছে আর কিছুই পেলেন না, ছিলো একটা বাটি। সেইটেই ছুঁড়ে মারলেন তিনি।

অব্যর্থ লক্ষ্য! মালতীর ঠিক মাথাটায় এসে লাগলো। চমকে দুর্গাচরণের দিকে তাকাতে আতঙ্কে শিউরে উঠলো মেয়েটা। ধ্বক্‌ধ্বক্‌ জ্বলছে বুড়োর চোখদুটো।

'গান গায়! গান! পোড়াকপাল্‌ইয়া অজাত কথাকার...এট্টু সোডার লইগ্যা চিক্‌খৈর দিয়া মরতে আছি—আর উনি গান গায়েন! পাজী বদমাইস কাঁহাকা—'

মালতী উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি। হাতটা ধুয়ে ফেলে এসে কাগজে ক'রে সোডা দেয়, জল দেয় এক গ্লাস।

সোডাটা খেয়েই দুর্গাচরণ চিৎ হয়ে শুয়ে প'ড়ে গোঙাতে থাকেন।

'বুক-পিঠটা এট্টু ডল্‌ইয়া দ্যাও না মণি'—বলেন নাজিরগিন্নী।

'তুই চুপ কর মাগী'—কুৎসিত মুখে দুর্গাচরণ ধমকে ওঠেন : 'দরদ দেহাইতে আইছে, দরদ! পিছা মার্‌ইয়া—'

মালতী এসে বসে দুর্গাচরণের কাছে। দু-হাতে ডলতে থাকে বুক।

বুড়ো গোঙাতে থাকেন।

'এট্টু স্বর্ণসিন্দুর মার্‌ইয়া দিতে কমু বড়ো-মা'রে? ও ঠাউরদাদা—'

বড়ো কোমল শোনায় মালতীর গলা! আর এই কোমলতার ছায়ায়, বেদনায় যন্ত্রণায় অধীর হ'য়ে ওঠে যেন লোলচর্ম বৃদ্ধ মুখখানা, দু-চোখের কোণ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে জল, দন্তহীন মুখটায় ঠোঁট দুটো হঠাৎ এমনি সেঁটে যায় যে কিছুতেই আর তিনি মুখ খুলতে পারেন না।

'বড়ো-মা?'—ভয় পেয়ে মালতী ডাক দেয়।

'আসি'—সাড়া আসে ভেতর থেকে। একটু পরেই সুরমা এসে দাঁড়ান স্বর্ণসিঁদুর হাতে।

চেটেপুটে সেটা খেয়ে নিয়ে দুর্গাচরণ খলটা দিলেন মালতীর হাতে : 'যা মণি, যা, তুই তোর কামে যা। চা বানাইলে দিস এট্টু আমারে।'

উঠে গিয়ে মালতী উনুনের কাছে বসলো ফের।

দুর্গাচরণ উঠে ব'সে আবার সেই ইতিহাসের খাতাটায় হাত দিলেন।

বাইরের ঘরে গানের মহড়া চলছে সমানে।

কেৎলিতে জল চড়িয়ে দিয়ে মালতী হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে থাকে উনুনের সামনে। থাকতে থাকতে আবার কখন্ ডুবে গিয়েছিলো গানে তার হুঁশ ছিলো না—হুঁশ হ'ল তখন যখন আবার সে বুড়োর চিৎকার শুনলো।

হাঁ, তাকেই তো বলছেন। কী বলছেন?

'দে পোড়া। পোড়া দে এইডারে চুলাডার মধ্যে। দে—'

ইতিহাসের খাতাটা দুর্গাচরণ বাড়িয়ে ধ'রে আছেন মালতীর দিকে। ঠকঠক কাঁপছে হাতখানা। ঝিকিয়ে উঠছে সর্বদেহ।

ব্যাপার দেখে মালতীর রক্ত জল হ'য়ে যায়। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে দৌড়ে যায় বাইরের ঘরে, ব'লে ফেলে : 'ও কাঞ্চনদা, শীগগীর আয়ন ভিতরে—ঠাউরদাদা য্যান কেমন করতে আছে।'

হুড়মুড় ক'রে সবাই ছুটে আসে ভেতরে।

লীলা এসে জড়িয়ে ধরে দাদুকে। শুইয়ে দেয় জোর ক'রে। বলতে থাকে : 'ও দাদু, দাদু? এইরকম করতে আছ ক্যান—'

দুর্গাচরণ আর শব্দ করেন না। নেতিয়ে প'ড়ে থাকেন চোখ বুজে। লীলার ডাকের উত্তরে থেকে-থেকে ঠোঁটটা একটু উল্টে দেন শুধু, আর অস্থিচর্মসার বাঁ হাতখানার লম্বালম্বা আঙুলগুলোয় ফুটিয়ে তোলেন বিতৃষ্ণার মুদ্রা।

কলেজ স্ট্রীটের মানবক

অমল দাশগুপ্ত

সেনেট হলের উঁচু চত্বরে দাঁড়িয়ে একবার তাকিয়ে দেখো। সামনে এক চিলতে খুশির মত কলেজ স্কোয়ারের টলটলে জল। শেষরাত্রি থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই খুশিকে ঘিরে নানা বয়সের ও নানা ধরনের মানুষ ঘুরপাক খায়। অজস্র বেঞ্চি ছড়ানো চারদিকে। দিন রাত্রির সব সময়েই কেউ না কেউ বসে আছে বেঞ্চিতে। বিকেলের দিকে ঘাসের জমির উপরেও এসে বসে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ। তিন দিকের রেলিং জুড়ে ফেরিওলার দল। ঝুলছে ছিটের কাপড়, স্তূপীকৃত হয়ে আছে ধুতি আর শাড়ি, থাক্ দেওয়া রয়েছে তোয়ালে, গেঞ্জি, ছেলেমেয়েদের জামা-ইজের-প্যাণ্ট। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে ফুটপাথের উপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে হরেক রকম জিনিসের বেচাকেনা। চুলের কাঁটা, রিবন, সেফ্‌টিপিন, সস্তা দামের ফাউণ্টেনপেন, পেনসিল এবং আরো অসংখ্য টুকিটাকি জিনিস। ফুটপাথের ধারে ধারে একটা চারচাকার গাড়িতে পুরো এক একটি স্টেশনারি দোকান সাজানো। এখানে দাঁড়িয়ে পাওয়া যায় না এমন জিনিস নেই আর এখানে দাঁড়িয়ে কিনতে ইচ্ছে করে না এমন জিনিসও বোধ হয় নেই। ওপারে প্রায় আকাশ ছোঁয়া একটা দেবদারু গাছ। উৎসবের দিনে দেখা যায় এই দেবদারু গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লাল-নীল আলো জ্বলছে। বর্ষার বিকেলে যখন ঘন মেঘে আকাশ কালো হয়ে যায় তখন তাকিয়ে দেখো এই দেবদারু গাছের চুড়োর দিকে। সেই থমথমে সবুজ থেকে কিছুতেই চোখ ফেরানো যায় না।

বিকেল চারটের সময় একটু অবসর পেলেই চলে এসো এই কলেজস্ট্রীট পাড়ায়। এক প্রাণ-চঞ্চল কলকাতা চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হবে। শুধু বইয়ের দোকান আর ফেরিওলার পশরা দেখেই ফিরে যেও না। যে-কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে একবার শুধু তাকিয়ে থেকো জনস্রোতের দিকে। হাফপ্যাণ্ট আর ফ্রকপরা ছেলেমেয়েরা ছুটির খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে। চলেছে বৃহৎ এক বইখাতার বোঝা বুকের উপর চেপে বেণীধরা ছাত্রী, প্লাস্টিকের মোড়ক দেওয়া একটিমাত্র খাতাকে দু-আঙুলে চেপে ধরে ধুতি বা ট্রাউজার পরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, থলে হাতে স্কুলের মাস্টারমশাই, পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হাতে কলেজের অধ্যাপক। আর চারদিকে শুধু বই আর বই। ফুটপাথে বই, রেলিংয়ের গায়ে বই, দোকানের শো-কেসে বই, কুলির মাথায় চুবড়ি বোঝাই বই, কর্মচারীদের হাতে প্যাকেটভর্তি বই, ঠেলাগাড়ি বোঝাই বই।

সামনে তাকিয়ে দেখো—সেনেট হল আর আশুতোষ বিল্ডিং। এগিয়ে এসো। প্রেসিডেন্সি কলেজ, হেয়ার স্কুল আর সংস্কৃত কলেজ। এগিয়ে এসো। এলবার্ট হল। অবশ্য সেই এলবার্ট হল আর নেই। এখন হয়েছে কফিহাউস। ভয় পেও না। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসো দোতলায়। ডানদিকে বাঁক নাও। সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝিম্‌ঝিম্‌ গন্ধ এসে মাথার ভিতরটায় নাড়া দিয়ে যাবে। মস্ত এক হলঘর। সারি সারি টেবিল। সারি সারি চেয়ার। সারি সারি পাখা। নানা বয়সের অনেক মানুষ। নানা উচ্চারণের অনেক ভাষা। নানা অঙ্গবিক্ষেপের অনেক ভঙ্গি। ফিসফাস কথাবার্তা একসঙ্গে মিশে গিয়ে একটানা একটা গুঞ্জনধ্বনির মত শোনাচ্ছে। ভয় পেও না। যে-কোন একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ো। তারপর তাকিয়ে দেখো চারদিকের মানুষগুলোর দিকে।

কিন্তু ইতিমধ্যে যে লোকটি তোমাকে সেলাম ঠুকে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তার দিকেও একবার তাকিয়ে দেখো। পরিষ্কার ঝকঝকে সাদা পোশাক। পরিষ্কার মার্জিত চেহারা। পারিপাট্য ও শুচিতা এক সঙ্গে ফুটে উঠেছে যেন। কী দৃপ্ত রাজকীয় ভঙ্গি অথচ কী নম্র! আর আশ্চর্য, তোমারই হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে ভালো লাগবে তোমার। উঠে আসবার সময় দু-আনা বকশিশ দিও। এই হচ্ছে এখানকার রীতি। দু-আনা পয়সা হাতে নিয়ে আরো লম্বা একটা সেলাম ঠুকবে তোমায়।

কিন্তু তোমাকে এ পাড়ায় ডেকে এনেছি কলেজ স্ট্রীটের অন্য এক চেহারা দেখাবার জন্যে। বাইরে থেকে এসে এপাড়ায় দু-একদিন বেড়িয়ে গেলে কলেজ স্ট্রীটের এই চেহারা চোখে পড়ে না। পাড়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে হবে। বড় বড় বাড়ি আর খুশিভরা মানুষজনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাতে হবে মাটির দিকে।

চা খাবেন?

কফি-হাউসের সেই সুপরিচ্ছন্ন ও সুমার্জিত চেহারা নয়। বছর দশেক বয়সের একটি ছেলে। পরনে ছেঁড়া-হাফপ্যান্ট ও ছেঁড়া হাফশার্ট। ময়লা। আধো-আধো গলার স্বর। চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই কোন দিন স্নান করে কি করে না।

খান না এককাপ চা!

সেই আধো-আধো গলার স্বর ভিক্ষে চাওয়ার মত করুণ হয়ে ওঠে। ছোট্ট মুখখানা প্রতীক্ষায় উদগ্র, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল। যদি সম্মতি পায় তাহলে বিরাট এক রাজ্যজয়ের মত আনন্দে মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। চোখের পলক না ফেলতে ছুটতে শুরু করে, চোখের পলক না ফেলতে ফিরে আসে।

সারা কলেজ স্ট্রীটে এরা ছড়িয়ে আছে। যদি পঙ্গপাল বলতে চাও তো বলো। পঙ্গপালের মতই উদ্ব্যস্ত অতিষ্ঠ করে ছাড়বে। এক কাপ চা খাবেন? খান না এক কাপ চা! কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। শেষ কালে বাধ্য হয়ে বলতে

হবে, আচ্ছা নিয়ে আয়। বকশিশের প্রত্যাশা করে না। মালিকের এককাপ চা বিক্রি হলেই এরা খুশি। এবং প্রথম কাপ চা শেষ হবার পরেই আবার শুরু হয় দ্বিতীয় কাপের জন্যে যাতায়াত। আধো-আধো গলার স্বর ভিক্ষে চাওয়ার মত আবার তেমনি করুণ হয়ে ওঠে।

কিংবা পঙ্গপাল না বলে বলতে পারো বৃষ্টির ফোঁটা। অত্যন্ত অনায়াস আবির্ভাব, অত্যন্ত সহজ গতিবিধি। প্রতীক্ষিত মুহূর্তটিতে অবধারিত ভাবে পাওয়া যায়। প্রতীক্ষা না করলেও অজস্র ধারায় নেমে আসে। মাঝে মাঝে মনে হবে, সারা কলেজ স্ট্রীট পাড়া জুড়ে কে যেন এক টেলিভিশন যন্ত্র বসিয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলেছে ইলেকট্রন পরমাণুর অশ্রান্ত ছুটোছুটি। সুইচ টিপতে হয় না, স্থান পরিবর্তন করতে হয় না, শুধু একটি মুখের কথা, কিংবা একবার শুধু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়া—সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুটন্ত ইলেকট্রন পেয়ালাভর্তি ধূমায়মান চা নিয়ে হাজির হবে। সিগারেট বা পান আনতে দাও, তাও ছুটে গিয়ে নিয়ে আসবে; একটা চিঠি পোস্ট করতে দাও, তাতেও কোন আপত্তি নেই। এমন আশ্চর্য আনুগত্য আর কোথাও নেই।

এত ছুটোছুটির পরেও আবার তেমনি হাসিমুখে এসে দাঁড়াবে সামনে। আধো-আধো গলার স্বর করুণ হয়ে উঠবে ভিক্ষে চাওয়ার মত : এক কাপ চা খাবেন? খান না এক কাপ চা!

কলেজ স্ট্রীটের রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ চলাফেরা করে। কলেজ স্ট্রীটের দোকানে বাজারে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকার কেনাবেচা হয়। এখানে অনেক আলো, অনেক সমারোহ। কিন্তু সকাল নটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত এই যে একদল শিশু অক্লান্ত ভাবে ছুটোছুটি করে, তারা কলেজ স্ট্রীটের ধুলোমাটির মতই এপাড়ার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিশে আছে যে আলাদা করে ওদের উপরে কিছুতেই চোখ পড়ে না। অযাচিত ভাবে আসে, ধমক দিলেও এতটুকু মুখ ভার করে না। ফাইফরমাশে ছুটোছুটি করতে পারলে প্রায় কৃতার্থ হয়ে যায়। ছোট্ট মুখখানা প্রতীক্ষায় উদগ্র, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল। মাত্র এককাপ চা। মালিকের দোকানের এককাপ চা বিক্রি হলেই ছোট্ট মুখখানা হাসিতে ভরে যায়।

কলেজ স্ট্রীটে এসে হাজার হাজার বই আর ফেরিওয়ালাদের চোখ ঝলসানো পশরা দেখে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে হয়। সেই চারচাকার মস্ত গাড়িতে একটা পুরো স্টেশনারী দোকান। দেখলেই কিনতে ইচ্ছা করে। বইয়ের দোকানে এলে মনে হবে এক আশ্চর্য রূপকথার দেশ। কত মানুষ! কত বিচিত্র মানুষ! মানুষের গোটা ইতিহাস একটুখানি ছোঁয়ার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে যেন। শুধু একটুখানি ছোঁয়া!

কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের এই মানবকদের দেখা পেতে হলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও চোখ নামাতে হবে মাটির দিকে। মাত্র দশ বছর বয়স। বা তারও কম।

অস্নাত অভুক্ত চেহারা। সারা গায়ে ঝলঝল করছে ছেঁড়া প্যান্ট আর ছেঁড়া শার্ট। আধো আধো গলার স্বর। কিন্তু কোন বইয়ের পৃষ্ঠায় এদের দেখা পাওয়া যায় না। কলেজ স্ট্রীটের ধুলোমাটির মত এরা এই পাড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে আছে।

বয়সে বাড়ে না। আগে যা ছিল, এখনো তাই। পরেও তাই থাকে। দশ বছর বা তার কাছাকাছি। আর বরাবর তেমনি আধো-আধো গলার স্বর। উচ্চারণটুকু পর্যন্ত কখনো স্পষ্ট হয় না।

কত মাইনে পাস রে তুই?

আগে এককাপ চা খান, তারপর বলব।

একমাত্র চিন্তা কি করে এক কাপ চা বেশি বিক্রি হতে পারে। সবসময়ে ফন্দিফিকিরে থাকে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এককাপ চা গছিয়ে দিয়ে যায়।

কত মাইনে পাস রে তুই?

দিনে ছ-আনা।

রোজেরটা রোজ দিয়ে দেয়?

এসব প্রশ্নের জবাব সহজে দিতে চায় না। মুখটা চিনে নিয়ে পর-পর কয়েকদিন সেই একজনের কাছেই চা খেতে হবে আর একটু একটু করে জানতে হবে। সহজে ওরা মুখ খোলে না। এবং এমনও হতে পারে রোজেরটা রোজ দেয় কিনা, এই প্রশ্নের জবাব পাবার আগেই সেই বিশেষ মুখটি হারিয়ে যায় একেবারে। অনেক খোঁজখবর করেও হদিশ পাওয়া যায় না আর কোন।

রোজই নতুন নতুন মুখ।

সেই ছেলেটা কোথায় গেল রে?

জিজ্ঞেস করলেও সহজে কেউ বলতে চায় না। বিশেষ রকমের অন্তরঙ্গ হলে জানা যায়, দিন সাতেক কাজ হবার পর ছেলেটিকে প্রচণ্ড রকমের ঠ্যাঙানি দিয়ে মালিক তাড়িয়ে দিয়েছে।

কেন? ঠ্যাঙানি দিয়েছে কেন?

কেন, কেউ জানে না। এইটেই রীতি। সাত দিন, দশ দিন, পনেরো দিন কাজ হবার পরে অতি তুচ্ছ একটা কারণে বা কোন কারণ না থাকলে অতি তুচ্ছ একটা কারণ সৃষ্টি করে মারধোর করে ভাগিয়ে দেওয়া হয় এক একজনকে। তখন আর সেই কয়েক দিনের রোজ চাইবারও সাহস থাকে না সেই মানবকের। পরদিন থেকেই আবার একটি নতুন মুখ। তেমনি বয়স, তেমনি ভাবভঙ্গি, তেমনি চলাফেরা। এক সপ্তাহ, দু-সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ। এক মাস, দু-মাস, তিন মাস। আবার হারিয়ে যায় সেই মুখটি।

সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সকাল নটার সময় কাজে আসতে হয় আর রাত নটায় ছুটি। শনিবার সন্ধ্যা ছটার পরে আর কোন কাজ থাকে না। রবিবার কাজও নেই, রোজও নেই। এক একজনের এক একটা এলাকা ভাগ করা থাকে।

সেই এলাকায় বারবার গিয়ে তাগিদ দিতে হয় প্রত্যেককে। এবং একদিন যত কাপ চা বিক্রি হয়, পরের দিন তার চেয়ে কম বিক্রি হলে প্রচণ্ড ধমক খেতে হয় মালিকের কাছে।

হতভাগা তুই কাজ করিস না ঘুরে ঘুরে বেড়াস?

আজ্ঞে, আজ কেউ চা খেল না।

কিন্তু মালিক বিশ্বাস করতে চায় না একথা। আগের দিন বেলা পাঁচটার মধ্যে কোন একটি এলাকায় যদি চল্লিশ কাপ চা বিক্রি হয়ে থাকে তো পরের দিনেও তাই হওয়া চাই। যদি না হয় তো বুঝতে হবে, ছেলেটা নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে, নিশ্চয়ই সবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেনি, নিশ্চয়ই অন্য দোকানের লোক এসে আগে থেকেই অর্ডার নিয়ে চলে গেছে। এমনি ধরনের গাফিলতি একদিন দু-দিন বা তিন দিন সহ্য করা হয়, তারপর কচি কচি গালে ঠাস-ঠাস করে চড় মেরে দূর করে দেওয়া হয় একেবারে। রোজের পাওনাটুকু চাইবারও সাহস থাকে না তখন। যার দোষে দোকানের জমাট ব্যবসাতে এমন একটা ফাটল ধরে গেল, সে আবার রোজের পাওনা চাইবে কোন্ সাহসে?

হয়তো ঢং-ঢং করে স্কুল-ছুটির ঘণ্টা বেজেছে। সেদিন স্কুলে যার ডিউটি তাকে ছুটতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। এই সময়ে মাস্টারমশাইরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন। বিশ্রাম ঘরে এসে পৌঁছবার আগেই চায়ের অর্ডার নিতে হবে প্রত্যেকের কাছ থেকে। অন্য কোন দোকানের লোক এসে পৌঁছবার আগেই সেরে ফেলতে হবে এই কাজটুকু। যদি কেউ চা না খেতে চান তো কাকুতি-মিনতি করতে হবে তাঁকে। খেয়াল রাখতে হবে, আগের দিন যত কাপ চা বিক্রি হয়েছে, পরের দিন কিছুতেই তার চেয়ে এক কাপও কম না হয়।

আর ঘণ্টা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে এক সেকেণ্ড দেরি হলে বা চায়ের অর্ডার এক কাপ কম হলে প্রচণ্ড ধমক খেতে হয় মালিকের কাছে।

দূর করে তাড়িয়ে দেব বলছি! দু-বেলা রাক্ষুসে গেলা বন্ধ হয়ে যাবে! প্রতিবাদ করা চলবে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। রাক্ষুসে গেলা মানে দুপুর দুটোর সময় এক কাপ চা ও দু-টুকরো রুটি আর বিকেল পাঁচটার সময়ও তাই। বারো ঘণ্টা ডিউটির মধ্যে দু-বার। এই হচ্ছে রাক্ষুসে গেলা।

দুপুরবেলা ভাত খাস না?

জিজ্ঞেস করলে মুখ ফুটে জবাব দিতে পারে না। শুধু ঘাড় নেড়ে জানায় —না।

সকালবেলা কি খেয়ে কাজে আসিস?

এ প্রশ্নের জবাবে মাথাটা আরো নিচু হয়ে যায়। শুনলে অবাক হতে হবে, অনেকে সকালবেলাও বাড়ি থেকে কিছু খেয়ে আসে না এবং বরাদ্দ চার টুকরো রুটি থেকেও দুটো বা তিনটে টুকরো বাঁচিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায়।

তোর বাড়িতে কে আছে রে? বাবা কোথায়? মা আছে তো? ইত্যাদি হাজার রকমের প্রশ্ন মাথা নিচু করে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। আর তারপরেও যদি একই প্রশ্ন বার বার করা যায় তাহলে হঠাৎ এক সময়ে মুখ তুলে সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে শুধু বলবে, এক কাপ চা খান তাহলে বলব। ছোট্ট মুখখানা প্রতীক্ষায় উদগ্র, প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কোন দিন বেড়াতে এলে বড় বড় বাড়ি আর খুশিভরা মানুষজনের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একবার তাকিয়ে দেখো মাটির দিকে।

এখানে দিনরাত্রির সব সময়ে অজস্র মানুষ চলাফেরা করে। এখানে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চিতে দিনরাত্রির সব সময়েই অজস্র মানুষ অলস ভাবে বসে বসে সময় কাটায়। এখানে মস্ত বড় বড় বাড়ি আর মস্ত বড় দেবদারু গাছ। এখানে অসংখ্য জামা-কাপড়-জুতোর দোকান। এখানে অসংখ্য বইয়ের দোকান। যখনই সময় পাবে বেড়াতে এসো এ পাড়ায়। আর যদি সময় পাও যে-কোন একটা দোকানে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো। একটু পরেই শুনতে পাবে আধো-আধো স্বরে কে যেন জিজ্ঞেস করছে :

এক কাপ চা খাবেন?

যদি বলো, না—তাহলে আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে আবার বলবে : খান না এক কাপ চা!

আধো-আধো গলার স্বর ভিক্ষে চাওয়ার মত করুণ হয়ে ওঠে।

ভালো করে তাকিয়ে দেখো, ছুটির খুশিতে উদ্ভাসিত হাফপ্যাণ্ট বা ফ্রক পরা ছেলেমেয়ে নয়। মস্ত এক বইখাতার বোঝা হাতে কোন এক বেণীধরা ছাত্রী নয়। দু-আঙুলের ফাঁকে প্লাস্টিকের মোড়ক দেওয়া একটি মাত্র খাতা হাতে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের ছাত্র নয়। থলে হাতে মাস্টারমশাই নয়। পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে অধ্যাপক নয়। বইয়ের প্যাকেট হাতে দোকানের কর্মচারী নয়। বইয়ের চুবড়ি মাথায় দপ্তরীখানার কুলি নয়। এমন কি কফি হাউসের বেয়ারা পর্যন্ত নয়।

কলেজ স্ট্রীটের ধুলোমাটির মত এপাড়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে থাকা নেহাতই এক মানবক।

প্রশ্ন করো : তোর নাম কি রে?

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দেবে : আগে এক কাপ চা খান তারপরে বলব!

ছোট্ট মুখখানা প্রতীক্ষায় উদগ্র আর প্রত্যাশায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

 অমল দাশগুপ্ত

প্রফুল্ল রায়

আধডুবন্ত জলঘাসগুলোর উপর দিয়ে সর সর করে চারমাল্লাই নৌকাটা এসে চরের মাটিতে আটকে গেল।

কালো কুটিল শেষ রাত্তির। আকাশের গায়ে বিবর্ণ তারাগুলি এতক্ষণে নিকষ কালো মেঘের আড়ালে মিলিয়ে গিয়েছে। মেঘনার মত্ত ঢেউগুলোর উপর একটা মাতাল গোঙানি গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চিহ্নহীন দিগন্তের দিকে।

একজন মাঝি বলল, গলার স্বরটা আশঙ্কায় কাঁপছে, কামটা ভাল হইল না তমিজ। মহাজন জানতে পারলে ঘরের টুয়ায় আগুন লাগব। আমার বড় ডর করতে আছে, এই খবর কাণে গেলে বীজধান বন্ধ কইর‍্যা দিব নিঘঘাৎ। তখন ফসল ফলামু কি দিয়া?

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে তারাভরা কালো আকাশটার দিকে অর্থ-হীন নজর ছড়িয়ে এতক্ষণ বসেছিল তমিজ। কথাগুলো শুনবার সঙ্গে সঙ্গে তার গলায় তীক্ষ্ম বিরক্তি ফুটে বেরুলো, তুই মানুষ না আর কি! মহাজনে জানব ক্যামনে, তারে না কইলেই হইল। না না, নিজের হাতে আমি মেয়েমানুষ খুন করতে পারুম না। তা ছাড়া ও প্যোয়াতি। তার থিকা এই চরে নামাইয়া দিয়া যাই। ওর বরাতে যা আছে তাই হইব।

কি জানি, আমার বড় ডর করে।

আবছা অস্পষ্ট গলায় কথাগুলো বলল সেই মাঝিটা।

হ-হ তোর অমুন আল্‌গা ডরই আছে, সে আমি জানি। তুই মেয়ে-মানুষেরও বেহদ্দ হালিম। খুন করতে ডরাস না কিন্তু মেয়েটা বেঁচে থাকলেই তোর ডর!

তমিজের গলাটা অসন্তোষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফিস্ ফিস্ করে বলে, নে, তাড়াতাড়ি কর; রাইত পোহাইয়া আইল। মেয়েটারে নামাইয়া দে ছইয়ের থিকা।

আধডুবন্ত সেই ঘাসবনের পাশে বর্ষাস্নিগ্ধ নরম চরের উপর মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে নৌকাটা তর তর করে অনেক দূরের ঘন অন্ধকার চক্ররেখায় মিলিয়ে গেল।

সুখীর চেতনাটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণা পাক খেতে খেতে, পেটের নরম মাংস কখনও মুচড়ে, ভিতরের নাড়িগুলো মুঠো পাকিয়ে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। একটু একটু করে যন্ত্রণাটা

সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। একটা ঢেউয়ের মত হাড়-মাংস-চামড়ার মধ্যদিয়ে ছুটাছুটি করতে লাগলো।

পুবের আকাশে জলো আলতার মত ইতস্ততঃ ছোপ ধরল এক সময়। সকালের মৃদু আভাস মেঘনার জলে ফুটি ফুটি করে দোল খাচ্ছে। দূরের কোন মুসলমান বাড়ী থেকে এক ঝাঁক মোরগ ডেকে উঠলো।

এতক্ষণে চেতনাটার উপর বাদুড়ের কালো ডানার মত পর্দা নেমে এসেছিল। সমস্ত কিছু আবছা অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে থেকে।

চোখ মেলবার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ঙ্কর আতঙ্কে চমকে উঠল সুখী। এখন আর সে একলা নয়; তার পাশে রক্তমাখা এক নবজাতক। তার নির্জীব দুটো ছোট ছোট চোখের পাতায় সকালের ঝলমলে আলো ঠিকরে পড়েছে। আর কি আশ্চর্য; একটুও কাঁদছে না শিশুটা। নরম মুঠো দুটো পাকিয়ে চুপচাপ পড়ে রয়েছে তারই পাশে।

সুখীর দুর্বল ক্ষীণ স্মৃতির মধ্যে একটা রাত্রি যেন একটু একটু কেঁপে উঠল। সে রাত কতদিন আগের? ঠিক ঠাহরে আসছে না। তবু ছেঁড়া ছেঁড়া একটা ছবি এখনও দেখতে পায় বৈকি সুখী? সেই রাত্রিটা—

সদ্‌গোপদের তল্লাটে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গ্রামের শেষ প্রান্ত থেকে নারীকণ্ঠের মর্মবিদারী চিৎকার; সব ছাপিয়ে শিশুর গলায় মৃত্যু তীক্ষ্ণ কান্না কি একটা নিশ্চিত অশুভের, ভয়ানক অশুভ ইঙ্গিত দিচ্ছে। ঘরে খিল দিয়ে ভয়ে আতঙ্কে শরীরটা কুঁকড়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সুখী। বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা ধড়াস ধড়াস করছে। একটা কাঁপুনির বেগ শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে ছুটছে। তাকে কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। সারাদিন তাঁতের মাকু চালিয়ে সমস্ত শরীরটা বেদনায় টনটন করে উঠছিল, কিন্তু ঐ চিৎকার, ঐ আগুণ, ঐ হিংস্র শোরগোল, সব মিলিয়ে তার ভাবাভাবির শক্তিটাকে অসাড় করে দিয়েছিল।

সেই রাত্রিটা! কতদিন আগের? এখনকার দুর্বল স্মৃতিতে ঠিক ধরতে পারছে না সুখী।

কিন্তু, কিন্তু, এক সময় ঐ আগুন, ঐ শোরগোল একেবারে তারই ঘরের সামনে এসে উঠল।

কদর্য অট্টহাসি শুনতে শুনতে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে ফেলতে একটা চেনা চেনা গলা শুনেছিল সুখী, ভারি খুবসুরৎ দেখতে সুখীরে; জবর খুবসুরৎ, দরজাটা ভাইঙ্গ্যা ঘরে ঢোক সব।—

তার পরের ছবিগুলো ধারাবাহিকভাবে এই অথর্ব অশক্ত মনে ঠিক ধরতে পারছে না সুখী।

এক বছর আগে সুখীর জীবনের পরিচয় ছিল আলাদা। সে তাঁতির ঘরের সন্তানহীনা বিধবা। সারাদিন মাকু চালিয়ে গামছা বোনে। মোটা বনাতের কাপড় বোনে। হাট বাজারে পাইকারের কাছে বিক্রী করে আসে। স্বাবলম্বী জীবন। কারো তোয়াক্কা করে না সুখী।

কিন্তু এখন, এখন এই সকালের ঝলমলে আলোতে চরের চিকচিকে বালুর কণাগুলো যখন আয়নার মত দেখাচ্ছে কিংবা আধডুবন্ত জলঘাসগুলোর মধ্য দিয়ে হু হু করে বয়ে আসছে মেঘনার উজানী হাওয়া, কিংবা দূরের হেউলি ঝোপটা যখন উথল পাথল হয়ে উঠেছে, তখন আলো আর বাতাসের মত একটা সত্য, ভীষণ সত্য পরিচয় সুখীকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল। সে মা।

অদ্ভুত ভাবে বুকের ভিতরকার হৃৎপিণ্ডটা নাড়া খেয়ে উঠল সুখীর। সে মা! আর তারই পাশে সেই রক্তমাংসের ডেলার মত শিশুটা বর্ষার ঠাণ্ডা বাতাসে কুঁকড়ে রয়েছে।

মুখের বিচিত্র রেখাগুলোর উপর একটা নিষ্ঠুর হিংস্রতা নেমে এ'ল সুখীর। হাতটা বাড়িয়ে শিশুটার গলার ওপর এনে রাখলো সুখী। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, কেউ কোথাও নেই। একটু ইতস্ততঃ করলো। ভাবলো, না, না—এই রক্তকলঙ্কের পরিচয়কে সে বাঁচিয়ে রাখবে না।

আর সেই মুহূর্তেই চরের আধডোবা ক্ষেতটা, যেখানে জলের ওপর মাথা তুলে ধানচারাগুলো একটু একটু দোল খাচ্ছে তারই পাশ থেকে একটা মিষ্টি ও স্বপ্নাচ্ছন্ন গানের গলা এগিয়ে আসতে লাগল।

বাজার সুন্ধা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিমু পায়,
এট্টুখানি হাস কইন্যা পরাণ জুইল্যা যায়।
আতর গোলাপ ইসেন্স দিমু.........

এই চর তবে নির্জন নয়! গানটা নির্ভুল ভাবে শুনতে শুনতে সুখীর হাত শিশুটির গলার কাছে থমকে গেল। সকালের এই প্রসন্ন আলোতে পৃথিবীর নতুন আগন্তুকটার দিকে আর একবার তাকিয়ে চমকে উঠল সুখী। কই, ওর মুখে ছদন শিকদারের অপরাধ তো লেগে নেই। বরঞ্চ তার নিজেরই আদলটা যেন পরিষ্কার ভাবে ফুটে রয়েছে।

হাতটা গুটিয়ে এ'ল সুখীর। একটু আগের সঙ্কল্পটা মন থেকে ছেঁটে বাতিল করে দিল। না না, ওকে খুন করে আত্মহত্যা সে করতে পারবে না; এই একটা বছর ধরে সে পারেওনি। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটার পর অনেকগুলো পাশব মুহূর্ত তার উপর দিয়ে বয়ে বয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও সে পারে নি। শিশুটাকে আর একটু বুকের কাছে টেনে আনল সুখী।

এতক্ষণ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে গানটা ভেসে আসছিল। এবার গানের মানুষটা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে। বছর পনর বয়স রমজানের; একটা

রাংগা ডোরাকাটা লুঙ্গি পরনে। কয়েকটা টোন বড়শি নিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে এই সকালেই বেরিয়ে পড়েছিল মাছের সন্ধানে।

সুখীর সংগে চোখাচোখি হয়ে গেল। চারিদিক রক্তের ছোপ এবং রক্তমাখা নবজাত শিশুটার দিকে তাকাতে তাকাতে অবাক হয়ে গেল রমজান। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে বলল, আপনি কে? আপনে চরে আসলেন ক্যামনে?

আমি তোমার বুইন, কি নাম তোমার?

সেই আদিম ভয়ঙ্কর রাত্রিটার পর এই প্রথম মিষ্টি করে হাসল সুখী।

ড্যাব ড্যাবে দুটো চোখে পলক পড়ছে না রমজানের। আর একটু সামনে এগিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমার নাম রমজান।

পেটের মধ্যে যন্ত্রণাটা আরো তীক্ষ্ণভাবে আঁচড় কাটছে সুখীর। বিকৃত গলায় সে বলে উঠল, আমার বড় কষ্ট হইতে আছে ভাই, ভীষণ কষ্ট—

আপনে একটু একলা থাকেন, আমি আসতে আছি।—বলতে বলতেই চলতে শুরু করল রমজান। টোন বড়শিগুলো একপাশে ফেলে দূরের হেউলি ঝোপটার কিনার ঘেঁষে একসময় আধডুবন্ত ধানক্ষেতটার আড়ালে মিলিয়ে গেল রমজানের ডোরাকাটা রাঙা লুঙ্গিটা।

নির্জীব চোখের মণিদুটোর উপর পাতাদুটো কখন যেন নেমে এসেছিল সুখীর। অনেকগুলো কৌতূহলী পায়ের আওয়াজে চেতনাটা নাড়া খেতে খেতে সজাগ হয়ে গেল।

রমজান কয়েকজনকে সংগে করে নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে একজন বুড়ীও রয়েছে। চুলগুলো পাটের ফেঁসোর মত রুক্ষ; চোখের উপর এক আস্তর ছানি পড়েছে। সমস্ত দেহের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে।

রমজান বলল, নানী, এই যে, যার কথা কইতে ছিলাম। দেখছ তো—

ঘোলাটে চোখে সুখীকে দেখতে দেখতে বুড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, দেখিস কি তোরা! যত বেকুব নিয়া আমার সোংসার। যা, সইর‍্যা যা। মেয়েমানুষের এই সময়ে পুরুষের থাকতে নাই কাছে। এলেম, যা তো ভাই, একটা ডিঙি নিয়া আয় গাঙ দিয়া। মেয়েটারে ঘরে নিতে হইব।

ইজেম, ওসমান এবং রুস্তম হেউলি ঝোপটার আবডালে সরে গেল। রমজান আর এলেম ডিঙির তল্লাসে বালুচরের উপর দিয়ে হন হন করে পা চালিয়ে ধানবনের ওধারে মিলিয়ে গেল।

বুড়ী নানী রক্তমাখা শিশুটার নাড়ী ধারাল ছুরি দিয়ে কেটে দিল। সুখীর চোখ দুটো ক্লান্তিতে যন্ত্রণায় আপনা থেকেই বুজে এলো।

বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতে নিতে বুড়ী নানী বলল, গাঙের উজানী বাতাসে ছাওটার শরীল একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেছে। ইস্, কি কষ্টটাই না হইতে আছে পোয়াতির। সবই বরাত।

একটা জীর্ণ শীর্ণ হাড়সার হাত সুখীর পিঠে রেখে আস্তে আস্তে বুলোতে থাকে বুড়ী নানী। নবজাতক এসেছে পৃথিবীর মাটিতে। এ উৎসব তো মানুষের আদিম। এই পবিত্র মুহূর্তে সব মানুষের সমান অধিকার।

একটু পরে নদী ঘুরে নৌকা নিয়ে এলো রমজানেরা। এলেম আর বুড়ী নানীর কাঁধে ভর দিয়ে নৌকার পাটাতনে এসে উঠল সুখী। রমজান শিশুটাকে কোলে তুলে পাশে গিয়ে বসল।

বর্ষার লালাভ সকাল মৃদু কৌতুকে মেঘনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে।

হেউলি ঝোপ, হিজল বন, শরজঙ্গল পরিষ্কার করে অতি নগণ্য একটা জনপদের সৃষ্টি হয়েছে। কয়েকখানা মাত্র হোগলার ছাউনি দেওয়া দোচালা। হোগলাবনের ফাঁকে ফাঁকে সর্বহারা মানুষের ঘামঝরানো পরিশ্রমের হরফ হয়ে ফুটে রয়েছে। একটা দোচালা ঘরে নৌকা থেকে সুখীকে নামিয়ে আনা হ'ল।

বুড়ী নানী পুরান ছে'ড়া বেতের ঝাঁপি থেকে একটা সিকি বের করে ফিস ফিসিয়ে বলে, শিগগির যা ভাই, গাঙের ঐ পার থিকা একটু দুধ নিয়ে আয়।

রমজান বলল, এই পয়সা দিয়া তুমি না ইমান ফকিরের দরগায় সিন্নি দিবা কইছিলা।

যা যা ভাই, এখন আর দেরি করিস না। দেখিস না মা-টা কেমুন মড়ার মত পইড়্যা আছে। ওদের যদি বাঁচাতে পারি, তা হইলেই আমার সিন্নি দেওয়ার থিকা বড় কাম হইব। আমার বেহেস্ত যাওয়ার পুণ্য হইব।—বুড়ী নানীর গলাটা ধরে এলো। একটু থেমে, কেশে বলল, তাড়াতাড়ি যা ভাই, তোরে আইজ এক দব্য খাইতে দিমু।

রমজানের লোভাতুর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কি খাইতে দিবা?

তুই আগে দুধ নিয়া আয়, তার পরে কমু।

রমজান ছোট ডিঙিটা নিয়ে মেঘনার মাতলা ঢেউগুলোর মাথায় দোল খেতে খেতে ধু ধু পারের দিকে মিলিয়ে গেল এক সময়।

ঘরের ভিতর ঢুকে বুড়ী নানী বলে, তোমার নাম কি বুইন?

আমার নাম! আমার নাম!—আচমকা চিৎকার করে উঠল সুখী।

থাউক থাউক বুইন। পরে হইব উইসব। কাঁচা পোয়াতি অমন চিল্লায় নাকি? নাড়ীতে বেদনা হইব। সারা রাত ঘুমাইতে পারবানা।

পৃথিবী এখানে নিরাবরণ, আকাশ চিহ্নহীন দিগন্ত পর্যন্ত ছড়ানো। বাতাস অবাধে বয়ে আসে হু-হু করে। প্রতি মুহূর্তে এখানে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম। মানুষের জৈবিক দাবী পূরণের জন্য অবিরাম লড়াই।

আজ একবারে উল্টাপাল্টা বাতাস।

সন্ধ্যার সময় সুখীর ঘরের উপর এক আঁটি হোগলা বিছিয়ে দিতে দিতে রুস্তম বলে, নানী, মহাজন সওয়ারী বাওয়ার নৌকা দিতে চায় না। তিরিশ

টাকা জমা চায়, তবে নৌকা দিব। সোংসার যে ক্যামনে চলব, বুঝতে আছি না। গত সন যে বীজধান কর্জ দিছিল, দুই সপ্তার মধ্যে তা ফিরত চাইছে।

না দিক নৌকা, আমি একটা ধর্মজাল বুইন্যা দিমু পরশুর মধ্যে। তুই খালে খালে মাছ ধইর্যা হাটে বেচতে যাবি। আর বীজধান দিমু কোথা থেকে। সবই আউশ আর আমন বুনতে গেছে। বাকীগুলি তো খাইতেই লাগছে। আউশ ধান উঠলে কিছু শোধ করুম। ধীর, শান্ত গলায় বুড়ী নানী বলল।

রুস্তমের মুখখানা কেমন যেন দেখায়। ভীরু ভীরু গলায় বলে, গোরু আর লাঙ্গল কেনার লেইগ্যা যে টাকাটা ধার আনছিলাম মহাজনের থিকা, তারপর সিরাজদীঘার হাটে যে হারাইয়া গেছিল, সেই টাকাটাও দিতে হইব। তা না হইলে—বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল রুস্তম।

ডরাস ক্যান ক' দেখি রুস্তম! মনে নাই সেই দিনগুলির কথা? ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারছিল ভূঁইঞা। তবু আমরা মরছি না কি? আমরা সেই সময় যখন বাঁইচ্যা গেছি, তখন আর মরুম না, কিছুতে না। সুখের দিন আমাগোও আসব।

এই সবহারানো মানুষগুলির অভাব হতাশা দারিদ্র্য এবং বিপদভরা জীবনে বুড়ী নানীই একমাত্র ভরসা; সব মুশ্কিলের একমাত্র আসান, একমাত্র আশ্বাস। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সকলে নতুন করে বাঁচার দাবীগুলোর কথা ভাবে। সব সমস্যার সুরাহা খুঁজে পায়।

কয়েকটা বছর আগেও তারা অন্য মানুষ ছিল। তাদের জীবনের পরিচয় ছিল আলাদা। ধু ধু ঐ দিগন্তে, যেখানে বনভূমির একটা ক্ষীণ রেখা দেখা যায়, সেখানেই ছিল তাদের গ্রাম। হিজল আর মাদার বনের ছায়ায় ছায়ায় একটি টিনের চালা এবং কয়েক কানি ধানের ক্ষেত, এ ছাড়া তাদের প্রত্যাশা খুব বেশি ছিল না। কিন্তু সেই প্রত্যাশাটা একদিন মাটির বাসনের মত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এ'ল আকাল, এ'ল যুদ্ধ, এ'ল দাঙ্গা। আর এরই ফাঁকে একসময় খাজনা দিতে না পারার অজুহাতে ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিল ভূঁইঞার লোকেরা। ঘরের ভিতর পুড়ে মরল রহিমুদ্দির অন্তঃসত্ত্বা বউটা আর কাসেমের তিন মাসের বাচ্চাটা।

তারপর এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায় ডিঙি নৌকায় করে মেঘনা পাড়ি দিয়ে এই চরে চলে এ'ল রমজান, বুড়ী নানী, রুস্তম, ওসমান, এমনি অনেকে। ঐ ধু ধু গ্রামের আধপোড়া ঘা-খাওয়া জীবনকে এই নির্জন ভূখণ্ডে নতুন করে সতেজ সবল করে তুলবার একাগ্র সাধনায়, পরিশ্রমে এবং ঘামঝরানো আনন্দে মানুষগুলো বুঁদ হয়ে রয়েছে।

অনেকগুলো দিন গেল। অনেকগুলো রাত গেল। চরের উপর বর্ষার অনেক জল ঝরল। হু-হু করে ঝড়ো বাতাস বইল।

বুড়ী নানী সেই শিশুটাকে পায়ের উপর রেখে মৃদুমৃদু দোলা দেয়।

দূরে বসে নতুন ধান সিদ্ধ করতে করতে সুখী ভাবে, কি অসাধারণ প্রাণশক্তি শিশুটার। জল-বাতাস-ঠাণ্ডার ঘা খেয়ে খেয়ে, সেই ঘা সামলে এখনও বেঁচে রয়েছে। তাজ্জব হয়ে ভাবে সুখী, কেন বাঁচবে না? আস্ত শয়তানের বাচ্চা যে!

বুড়ী নানী বলে, তোর ছাওটা বড় দুষ্টু হইছে লো বুইন। কেমুন সোহাগ বোঝে এতটুকু মানুষটা। একেবারে তাজ্জাব কইর‍্যা দিল আমারে। ওর বাপও বুঝি দুষ্টু, তা না হইলে বউ-ছাওয়ের একটা খবর নেয় না। বড় দেখতে ইচ্ছা করে ওর বাপটারে।

ভয়ানক চমকে ওঠে সুখী। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করে রক্ত আছাড় খায়। চোয়াল, চোখ মুখের ভঙ্গি কঠিন হয়। স্মৃতির আরশিতে অনেকগুলো সাঙ্ঘাতিক দিনরাতের ছায়া পড়ে। সেই রাত্রিটা—একটা লোভী, কামার্ত গলা শুনতে শুনতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল। তার পরের দিনগুলোর কথা ভাবতে গেলেই বুকের মধ্যে বাতাস আটকে আসে। হৃৎপিণ্ডটা থেমে যেতে চায়। শিরায় শিরায় রক্ত আছাড়ি পিছাড়ি খেতে থাকে। ভয়ে আতঙ্কে চামড়া মাংস কুঁকড়ে আসতে থাকে।

একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছিল। রাতের পর রাত, আবার কোন কোন দিনের বেলাতেও আসত সেই লগ্নী লহনার কারবারী মহাজনটা।

বুড়ী নানীকে সব কথাই বলেছে সুখী। এমনকি তমিজ এবং হালিমকে যে হুকুম দিয়েছিল মহাজন, তা-ও বাদ যায়নি। মহাজন বলেছিল, এই পাপ আর রাখনের কাম নাই। পরশু আমবস্যার আন্ধারে মেঘনার জলে কাইট্যা লাসটা ভাসাইয়া দিবি। কেউ টের পাইব না।

সবই বলেছে সুখী, কিন্তু এই শিশুটার কলঙ্কিত জন্মের কথা বলেনি। সে কথা কিছুতেই বলতে পারবে না সে।

সুখীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ী নানী খনখনে গলায় বলে, বুঝেছি, অভিমান তো হওনের কথাই। ওর বাপ আসলে আমি কি ছাইড়া কথা কমু না কি? নাতিন জামাই হইলে হইব কি, কিছুতেই ছাড়ুম না। বউ না হয় চুরি হইছিলই, কিন্তুক খোঁজ তোল্লাস করে না এ কেমুন স্বোয়ামী!

স্বোয়ামী! সুখী ভাবে, মনগড়া একটা কাল্পনিক বস্তুকে নিয়ে বুড়ী নানী যখন খুশী হয়েছে, নিঃসন্দেহ হয়েছে, তখন হোক। মনে মনে সে নিজেই জ্বলুক। পুড়ে পুড়ে খাক হোক। চুপচাপ ধানের ভাটের পাশে বসে রইল সুখী।

চরের আউশ পেকে এসেছে। সোনার মত ঝিকঝিক করছে শ্রাবণের সকাল। চাষীকৃষাণের পরিশ্রমের পরশপাথর লেগে আষাঢ়ের সবুজ প্রান্তর মধুগন্ধি ফসলের লাবণ্যে ভরে গিয়েছে এই শ্রাবণের শেষ দিনগুলোতে।

বুড়ী নানী বলে, এইবার সব ক্ষেতে নামবিতো! ধান তুলবি কবে? আর

একটা সস্তা যাউক। তারপরে দেখা যাইব। উত্তরের চকটা তো এখনও কাঁচাই রইছে।—ওসমান জমির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে।

সন্ধ্যার সময় ওপারের হাট থেকে রুস্তম ফিরে এল। বুড়ী নানী একখানা ধর্মজাল বুনে দিয়েছে তাকে। সারাদিন চরের খালে খালে বর্ষার নতুন মাছ ধরেছে। বিকেলে নৌকা দিয়ে ওপারের কমলাঘাটের হাটে পাইকারের কাছে বিক্রী করে এসেছে। গোটা তিনেক কাঁচা টাকা কোমরের গেঁজে থেকে বের করে বুড়ী নানীর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, নানী, আজ একটা নয়া খবর শোনলাম।

কি খবর?

মহাজনের মানুষ আইস্যা আউশ ধান নিয়া যাইব। সেই বীজধান আর নৌকা লাঙগলের টাকার লেইগ্যা একেবারে ক্ষেইপা গেছে মহাজন।—ফিস ফিস গলায় বলতে বলতে কেমন যেন ভীরু নজরে তাকায় রুস্তম।

ইতিমধ্যে ওসমান রমজান ইত্তিমালি—সকলে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সুখীও এসেছে শিশুটাকে নিয়ে। সকলের চোখে মুখে আশঙ্কা এবং উত্তেজনা।

কে যেন বলল, কি উপায় হইব নানী?

আর একজন বলে, আউশ ধান নিলে সারা ভন্নার দিনগুলি না খাইয়া মরতে হইব যে।

বুড়ী নানী আশ্বাস দিল, তোরা একটুতেই বড় ভাইংগা পড়িস। মনে নাই ঘরে আগুন দিছিল ভূঁইঞা? তবু আমরা মরছি নাকি? তোরা মরদ না? কলিজায় রক্ত নাই? নদীর ঐ পার থিকা মহাজন আইস্যা ধান নিয়া যাইব আর তোরা চাইয়া চাইয়া দেখবি?

ভীরু গলায় একজন বলে, তুমি কি কাজিয়ার কথা কও নাকি নানী?

প্রয়োজন হইলে কাজিয়া করতে হইব। তোরা যদি করতে ডরাস তবে ঘরে বইস্যা থাকিস। আমিই যামু আগাইয়া। ঐ যে রমজানের বাপ, আমার ছেলে, ভূঁইঞার মার খাইয়া মরল, সেই শোধ তুলুম। ঐ ভূঁঞারই তো ভাই মহাজন।

এবার ওসমানের গলাটা উত্তেজনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, মরতে আমরা ডরাই নাকি? কও কি তুমি নানী? আমরা না মুসলমানের ছাও! কাজিয়া আমাগো রক্তে আছে। না না, ঐপার থিকা আইস্যা আমাগো ঘরের ধান নিয়া যায় কেমুন, কেরামতি দেখুম মহাজনের।

ধীরে ধীরে রাত্রিটা কালো, ঘন কালো হয়ে যায়।

বুড়ী নানীর কথা জমায়েত মানুষগুলোর সামনে কঠিন প্রতিজ্ঞার মত, আশ্বাসের মত জ্বলতে থাকে। প্রয়োজন হইলে কাজিয়া করতে হইব না?

তোমার ছেলেটা দেখতে জবর সোন্দর হইচে। ঠিক তোমার মত নাক মুখ চোখা হইব। দেইখো, আমি একটা খাঁটি কথা কইলাম।—রমজান শিশুটাকে কোলে তুলে নাচাতে নাচাতে বলে।

সুখী চমকে ওঠে। তীক্ষ্ম নজরটা শিশুটার মুখের উপর রেখে ছদন শিকদারের আদল খুঁজতে থাকে। ছদনের রক্ত-কলঙ্কের কোন চিহ্ন কি লেগে আছে ওর মুখে? সেই আদিম কুৎসিত রাত্রিগুলো কোন অপবিত্র ছায়া ফেলেছে কি? দেখতে দেখতে উজ্জ্বল হাসিতে মুখখানা ভরে গেল সুখীর। না না, ঐ নিষ্পাপ মুখে ছদন শিকদারের অপরাধ লেগে নেই।

সুখী বলে, না রে ভাই, ওর মুখ ঠিক ওর মামুর মত হইছে। এদের সঙ্গে নিজের জীবনকেও এই চরের মাটিতে একাকার করে মিশিয়ে দিয়েছে সুখী। অনেক দূরের একটা ছায়াভরা মিষ্টি গ্রাম, সেখানে ছোট্ট ঘরের মধ্যে সাদা থান পরা কে এক বিধবা সারাদিন খটখট করে তাঁতের মাকু চালাত, সেই ছবিটা আজ অসত্য, অবাস্তব মনে হয়। আজ তার পরিচয়, অন্তত এই চরের ছোট্ট পৃথিবীটা জানে, এই জনপদ সেই পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়েছে; সে মা, সে সন্তানের জননী।

ঝকমকে চরের উপর দিয়ে খবরটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এই নগণ্য জনপদটা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়ে উঠল। মহাজন এসেছে চরে।

পড়ন্ত বিকেল। ঈশানী আকাশে সাপের চোখের মণির মত কালো মেঘ জমেছে। মেঘনা মেতে উঠছে।

ঘরের ভিতর বসে বুড়ী নানী শিশুটার জন্য একটা কাঁথা সেলাই করছিল। বাইরে বেরিয়ে উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, ওসমান, রুস্তম,—তোরা এখনও বইস্যা রইছিস। ব্যাপার কি?

রমজান নদীর ঘাট থেকে ফিরে এসেছে। সে হেসে বলল, ডর নাই নানী, ধান নিতে আসে নাই মহাজন। কুটুম বাড়ি যাইতেছিল তিন বিবি নিয়া। আসমানে মেঘ দেইখ্যা চরে নামছে। মেঘনা যা ক্ষেপেছে!

বুড়ী নানী সন্দিগ্ধ গলায় বলে, ঠিক তো?

"হু হু—"

মেঘের ছায়ায় এই পড়ন্ত সোনাঝরা বিকেলটা কেমন যেন আবছা, অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

ইতিমধ্যে রুস্তম মহাজন এবং তার তিন বিবিকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে এসেছে। জলচৌকি পেতে বসিয়েছে।

এ ঘর থেকে সুখী মহাজনের গলাটা নির্ভুল শুনতে শুনতে চমকে উঠল। ঐ গলাটার সঙ্গে তার পুরোপুরি এক বছরের পরিচয়। ছদন শিকদারকে এত তাড়াতাড়ি ভোলা যায় না। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা বাদুড়ের কালো ডানার মত মনের মধ্যে দুলতে লাগল। সুখীর চোখজোড়া হিংস্র হয়ে উঠল। জ্বলতে

লাগল। ঘুমন্ত শিশুটাকে জাগিয়ে বুকে তুলে মহাজনদের ঘরের ভিতর চলে এল সুখী।

ছদন শিকদার তখন বলছিল, কর্জের টাকা আর বীজধান আমার আউশের আয়ামেই চাই—বলতে বলতে গলাটা আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল। নজরটা আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে সুখীর কোলের সেই ছোট্ট শিশুটার মুখে আটকে গেল।

তমিজ আর হালিম মহাজনের নৌকার মাল্লা। তারাও এসেছে। দুজনে উঠে সুখীর পাশে এসে দাঁড়াল। বিস্মিতগলায় বলল, তুমি এখনও বাঁইচ্যা আছ সুখী বুইন, কি আশ্চর্য!

হ, আছি তো। এই দেখ, তোমাগো কেমুন সোন্দর ভাগনে হইছে। শিশুটা ফিক করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে অনেকগুলো গোক্ষুর সাপের উদ্যত ফণা একসঙ্গে যেন দেখতে পেল ছদন শিকদার। আড়চোখে তিন বিবির দিকে তাকাল। বড় বিবির মেজাজ বাঘিনীর মত। মেজো বিবির মেজাজ নেই কিন্তু নখের ধার শিকারী বিড়ালের মত বিষাক্ত আর ছোট বিবিকে এই সেদিন সাদী করেছে ছদন। বুড়ো বয়সের কাঁচা বিবি। গোঁসা হলে কাছেই ঘেঁষবে না। এই মুহূর্তে শিশুটার জন্মের ইতিহাস জানতে পারলে তিনজনেই তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভয়ে আতঙ্কে ছদনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। ফিস ফিস গলায় বলল, কর্জের টাকা আর বীজধান দিতে হইব না তোমাদের। আমি এখন যামু।

সুখী ছোট্ট শিশুটাকে ধারাল হাতিয়ারের মত সামনে তুলে ধরে বললে, আমাগো আরো পাঁচশ টাকা দিতে হইব।

আড়ষ্ট গলায় ছদন বলল, দিমু।—তারপর তমিজ এবং হালিমের দিকে তাকিয়ে বলে, নৌকা খোল, আমি এই মেঘের মধ্যেই গেরামে ফিরুম।

একটা বাজ পড়ল যেন আচমকা। তমিজ এবং হালিম—তারাও নিরন্ন মাঝি মাল্লা। মাত্র কয়েকটা টাকার জন্য ছদন শিকদার তাদের দিয়ে মানুষ খুন করায়। সেই মানুষ-মারা রক্তাক্ত টাকাও আবার ঠিকমত দেয় না। সহজ আদায়ের অধিকার ছেড়ে তারা যাবে না।

হালিম বলে, আমরা এখন যামু না মহাজন।

কখন যাবি?

রবিবার। সুখী বুইনের লগে একেবারে টাকাটা আনতে যামু। আপনেই যান বিবিজানগো নিয়া।

ছেলেটাকে সুখীর কোল থেকে একেবারে বুকের উপর তুলে নিল তমিজ। আদায়ের পথটা কি চমৎকার ভাবেই মসৃণ করে দিয়েছে শিশুটা।

আগামী রবিবারই শুধু তারা যাবে না। শিশুটাকে শাণিত হাতিয়ারের মত সামনে তুলে নির্ভুল পা ফেলে ফেলে তারা যাবে আরো, আরো অনেকবার।

মতি নন্দী

দীপু, তোর বাবা এখনো আসছে না যেরে। একবার গেটের কাছে গিয়ে দ্যাখনা।

মেটারনিটি ওয়ার্ডের গাড়ি বারান্দার তলায় তখন একটাই মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। দীপু তার বাম্পারে বসে দেখছিল, ঠিক উত্তর-পূব কোণার লালবাড়িটার সিঁড়িতে দুটো ছেলে-মেয়ে কথা বলছে। দুজনের হাতেই বুক দেখবার যন্তর। মেয়েটা হেসেই কুটিকুটি। হাসি থামিয়ে সিঁড়িতে উঠছিল। আবার কি শুনে আবার কুটিকুটি। ডাক্তার হ'লে জামার মত ঝোলা কোট পরা থাকত। তাহলে স্টুডেন্ট। মেয়েটা আটকা পড়ে গেছে। ছেলেটা কি খুব হাসির গল্প জানে, নাকি এখনো খিদে পায়নি মেয়েটার!

—অ দীপু—

—বলেছি তো, অফিস থেকে ছুটি করিয়ে তবে আসবে।

—তোকে একলা পাঠাল কি বলে শুনি? ছেলে-মেয়েগুলো বাড়িতে এতক্ষণ কি কাণ্ড করছে কে জানে।

—শিকলি দিয়ে এসেছি।

—তাতে কি হয়েছে, ঘরের জিনিস ভাঙবে। এত বেলা হল ওদের খিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটা লালবাড়িতে ঢুকে গেল। সোজা পূব মুখো রাস্তা ধরে ছেলেটা চলে যাচ্ছে। হাতের নলটা দোলাচ্ছে। দীপু পূব দিকে তাকিয়ে রইল।

কমলা দেখছে সবুজ শাড়ি-পরাটিকে। গাড়িবারান্দার নিচে আরো তিনটি বৌ বসে আছে। সবাই মাঝ-বয়সী। শুধু একে দেখেই মনে হচ্ছে প্রথম পোয়াতি। চোখে-মুখে ভয় এখনো কাটেনি। বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ভরসা ক'রে কোলে নেয়নি। নাতি কিংবা নাতনিকে কোলে নিয়ে দোলাচ্ছে বুড়িটা, অথচ বাচ্চাটা মোটেই কাঁদছে না!

ঘস্ করে ট্যাক্সিটা থামল। তর সইছে না ছেলেটার। নেমেই তাড়া দিল ওঠার জন্য। হাসপাতালের বুড়ো দারোয়ান ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরেছে। বৌকে দু'হাতে ধরে তুলল। দু'পাশে তাকিয়ে বৌটা স্বামীর হাতদুটো সরিয়ে দিল।

বুড়ি ট্যাক্সিতে উঠতে পারছে না। হাত-জোড়া বাচ্চা। মাথা নিচু করে ঝুঁকলে, খাড়া থাকার মত জোর আর কোমরে নেই।

—আপনি ছেলেকে ধরুন না। উনি উঠলে পর কোলে দেবেন।

কমলার পরামর্শ শুনল ছেলেটা। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল দরোয়ান। একটা টাকা বখশিস পেল।

—জানলি দীপু, তোকে নিয়ে ওঠবার সময় ট্যাক্সির দরজায় মাথা ঠুকে গেছল। খিঁচিয়ে উঠেছিল তোর বাবা। এমন রাগ ধরেছিল তখন, মনে হয়েছিল দিই তোকে ফেলে, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাই।

—বাবার স্বভাবটা বড় বিচ্ছিরি।

—তোর ঠাক্‌মা খুব বকেছিল তোর বাবাকে। হ্যাঁরে, মনে আছে ঠাক্‌মাকে? আমায় খুব ভালবাসতো।

—তুমি ট্যাক্সি ক'রে গেছলে!

—এর থেকে বড় ছিল ট্যাক্সিটা। তোর মেজ মামা, সোনাপিসী, সব্বাইকে ধরে গেছল।

—নীপু, অপু, বাচ্চু ওরাও ট্যাক্সিতে গেছল?

—শুধু নীপুটা গেছল, আর সব রিসকোয়।

কমলা তার বাচ্চাকে কোল থেকে ছড়ানো-পায়ের ওপর শুইয়ে দিল। নাপিত নখ কাটছে ফর্সা বৌটার। ওর গায়ে জামা নেই, শরীরেও মাংস নেই। একলা বসে আছে। স্বামী গাড়ি ডাকতে গেছে। নাপিতটা নতুন। মাথায় টিকি আছে। টিকিওলা নাপিত কমলা কখনো দেখেনি। আগেরবার, মিচুর সময়ে ছিল বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা এক নাপিত। পোয়াতিরা খালাস হয়ে যাবার সময় এখানেই নখ কেটে যায়। পয়সা নিয়ে সেবার ঝগড়া হয়েছিল। দু'আনার জন্য দীপুর বাপ হাতাহাতি শুরু করতে গেছল।

—হ্যাঁরে দীপু দেখনা ক'পয়সা নেয়।

—কি হবে দেখে।

—তাহলে এখানেই কেটে নোব।

দীপু উঠে গেল। একটা রিক্সা নিয়ে এল বৌটার স্বামী। দারোয়ান গাড়ি-বারান্দার তলায় রিক্সাকে দাঁড়াতে দিল না। বৌকে ধরে নিয়ে গেল লোকটা। কোমর ভেঙে গেছে। ধুকতে ধুকতে হাঁটছে। হঠাৎ কাপড়টা আলগা হয়ে খসে পড়ছিল, একহাতে বাচ্চাকে ধরে আর এক হাতে কাপড়টা চেপে ধরল।

—অ দীপু, ভাইকে একটু ধরতো।

বাচ্চাকে দীপুর কোলে দিয়ে কমলা গিয়ে বৌটাকে কাপড় পরিয়ে দিল। হাঁটতে পারছে না। হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে। কমলা ওকে ধরে নিয়ে গেল রিক্সা পর্যন্ত। উঠতে পারছে না। রিক্সাগুলো এমন গড়ানে হয় যে কমজোরি লোক উঠতে গেলেই টলে পড়ে। বাচ্চাকে চেয়ে নিল কমলা। হামাগুড়ি দিয়ে বৌটা রিক্সায় উঠল। ওর স্বামীও উঠল। কমলা বাচ্চাকে কোলে তুলে দিল।

—আসি দিদি।

—নাববার সময় সাবধানে নেবো।

রিক্সাটা চলে গেল। আবার একটা ট্যাক্সি এল। হাত-আয়নাটা বাস্কেটে রেখে বাচ্চা কোলে বৌটা উঠে দাঁড়াল। বেশ শক্ত সমর্থ গড়ন। কোন ফাঁকে বুকটাকে আঁট-সাট করে নিয়েছে। বাচ্চাকে স্বামীর কোলে দিয়ে গটগটিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

চলে গেল ট্যাক্সিটা। দরজা বন্ধ করে বখশিস পেল দরোয়ান। এখন গাড়ি-বারান্দার তলায় বাড়ি যাবার জন্য রইল শুধু কমলা।

দীপুর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে নিয়ে মোটরের ধার ঘেঁষে কমলা মেঝেয় বসল। দীপু বসল বাম্পারে। দরোয়ান বসেছে তার টুলে, আর নাপিত সিঁড়িতে। হাসপাতালের ভেতর থেকে টুকটুক করে একটা বেড়াল নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে একজন মাঝবয়সী দাই নেমে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে গেল। থিলেনের কার্নিসেও দু'তিনটে কাক উড়ে এল। অনেক দূরে, পাঁচ-ছটি গোলাপি বেল্ট-আঁটা সাদা কাপড়ের টুপি পরা মেয়ে, খাতা হাতে চলে গেল। উত্তরের ছাই রঙের বাড়িটার তিনতলার বারান্দায়, টেবিল ঘিরে তাস খেলছে ক'জনে।

—নাপিতটা কতো নিলরে?

—আট আনা।

—তোর বাবা ভোলাকে বলে রেখেছে তো?

—কি জানি। ভোলাতো বারটা পর্যন্ত পাড়ায় থাকে। এখন গেলেও হয়তো পাওয়া যাবে।

—দ্যাখনা একটু তোর বাবা আসছে কিনা।

—দেখলেই কি বাবা তাড়াতাড়ি আসবে?

দীপু ঝেঁঝে উঠল। বাতাসে হল্‌কা আসছে। বাচ্চাকে আঁচল দিয়ে কমলা ঢেকে দিল। উত্তর-পূবের সেই লাল বাড়িটা থেকে তরতরিয়ে দুটি মেয়ে নেমে গেল। দীপু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে রইল। একটু গিয়েই ওরা বেঁকে গেল।

—মা তোমার কাছে পয়সা আছে?

—ছ'টা পয়সা আছে, কেন?

—কতক্ষণ বসে থাকব?

—উনি কখন আসেন, কে জানে।

হেসে উঠল নাপিতটা। আর খদ্দের নেই তবু বসে গল্প করছে। দারোয়ানকে খুশি না রাখলে এখানকার পসার বন্ধ হয়ে যাবে। দীপু উঠে গিয়ে দরজার পাশে টাঙানো রুগী দেখবার নিয়ম পড়তে শুরু করল। কমলা তাকাল বাগানের দিকে। হাওয়া আসছে, তবু গলগলিয়ে ঘাম নামছে। হঠাৎ চমকে উঠে হাত ছুড়ল বাচ্চাটা। স্বপ্ন দেখছে। গত জন্মের কথা ভাবছে। ঠোঁট নড়ছে। হাসছে। নাকি খিদে পেয়েছে। মোটরটার দিকে পিছন ফিরে মুখে মাই গুঁজে দিল কমলা। চনমন করে মুখ সরিয়ে নিল। চোখ বুজেই আছে। বড্ড আলো। কচি চোখ সইবে কেন। আঁচল দিয়ে বাচ্চাকে আবার ঢেকে দিল কমলা। আঁচলের

নীচে নড়ছে। আঁচল ফাঁক করে দেখল। হাত পা কুঁকড়ে গুটিয়ে রয়েছে। কালো ঠোঁট দুটো নড়ছে। কি ছিল ও আগের জন্মে, রাজার ছেলে? গত জন্মের কথা মনে পড়ে হাসছে?

—হ্যাঁরে দীপু ট্যাক্সির ভাড়া বুঝি কম? সবাই যে ট্যাক্সিতে গেল।

দীপু সাড়া দিল না। ঘাড় তুলে সে নিয়ম পড়ছে।

—এখান থেকে আমাদের বাড়ি যেতে কত নেবে রে?

দীপু এবারও সাড়া দিল না। কমলা দীপুর থেকে চোখটা সরিয়ে ফড়িংটার ওপর রাখল, ওটা এইমাত্র মোটরের টায়ারে এসে বসল, তারপর রাখল বাচ্চার ওপর। বাচ্চাকে দুহাতে দোলাল। বড্ড হালকা। কালো বেল্ট পরা নার্সটি হেসে হেসে বলেছিল, কি সুন্দর বেবী। আহা, বড় ভাল মেয়েটি। বলেছিল দেখা করবে।

কমলা দূরের বারান্দায় তাকাল। একটাও মানুষ নেই। কে থাকবে এই গরমে। তাছাড়া ওর ডিউটি তো ওধারে দক্ষিণের বারান্দায়। কালকে এমন সময় দেখা হয়েছিল। কাঁদ কাঁদ মুখ করে ছুটে আসছিল। কে একজন নাকি বাড়ি যাবার সময় হাতে আট আনা পয়সা গুঁজে দিয়েছিল।

—দীপু একটু নজর করিসতো, সেই কপালে কাটা দাগ আমাদের নার্সটিকে যদি দেখতে পাস্। আমাকে খুব যত্ন করেছিল।

—তাকে দেখব কি করে, সেতো ওয়ার্ডে এখন।

—তবু যদি এদিকে এসে টেসে পড়ে। এক জায়গায় বসে তো আর কাজ কর্তে হয় না।

দীপু বাগানের দিকে সরে গিয়ে তিন তলাটা নজর করে ফিরে এল। আগের মত বাম্পারে বসে ঝক্ঝকে গাড়ির পিঠে মাথা রাখল।

—আর গোটাকতক পয়সা থাকলে বাসে চলে যেতুম।

কমলা মুখ ফিরিয়ে নিল। পা দুটো ছড়িয়ে দিল রোদ্দুরে। পায়ের নিচের সিমেণ্টটুকু তেতে উঠেছে। ওখানে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকলে সেঁকের কাজ হয়ে যাবে। দেয়ালে ঠেশ দিয়ে সে চোখ বুজল।

—এই ওঠো, ওঠো।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দরোয়ান। যার মোটর গাড়ি সে এসে গেছে। উঠে দাঁড়াতে ভুলে গেল দীপু তার দিকে তাকিয়ে।

লেডি ডাক্তার দীপুকে নজর না করেই গাড়িতে উঠে বসল। শেল্ফ স্টার্টারের বোতাম টিপল। খর খর করে উঠল ইঞ্জিন, স্টার্ট হল না।

গাড়ি ঘেঁষে কমলা বসেছিল। লেডি ডাক্তারের মুখটুকু শুধু দেখতে পাচ্ছিল সে। সুন্দর কপাল, সুন্দর রঙ, সুন্দর চুল।

আবার শব্দ হল স্টার্টারের। বিচ্ছিরী শব্দ। এত সুন্দর গাড়িটা যেন

ক'কাচ্ছে। বার কয়েক এমন হবার পর লেডি ডাক্তার গাড়ি থেকে নামল। নিচু হয়ে গাড়ির তলা দিয়ে কমলা শুধু গোড়ালি আর সায়ার লেশ দেখতে পেল।

নাপিত আর দরোয়ান এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে যেন গাড়ি স্টার্ট না হবার দোষটুকু তাদেরই। দীপু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, তার পা দুটো খুব সরু আর লোমগুলো বড্ড ঘন। থুতনিতে বড় বড় চুল মুখটাকে কুচ্ছিত করে রেখেছে। মোটরের আড়ালে সরে এসে সে গালে হাত বুলোল। আঙুলে একটা ব্রণ ঠেকল।

—গাড়িটা একটু ঠেলে দেবে?

বলার ভঙ্গিটা আবদেরে। স্বরটা ঠিনঠিনে। নাপিত আর দরোয়ান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। গাড়িটা মস্ত। ওরা দুজনেই বুড়ো। জায়গাটা গড়ানে। ওদের পিঠ বেঁকে গেল, পায়ের ডিম শক্ত হল, তবু গাড়িটাকে গড়ানো গেল না।

—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, গিয়ে ঠেল না।

—আমি কেন ঠেলব?

—আহা মানুষ বিপদে পড়েছে সাহায্য করবি না। একটুখানি ঠেলে দিলেই বুঝি মান-ইজ্জত খোয়া যায়!

দীপু গিয়ে হাত লাগাল। নড়ে উঠল গাড়িটা। মুগ্ধ কমলা তাকিয়ে রইল দীপুর কনুইয়ের কাছের গুড়ি গুড়ি পেশীর দিকে। উঁচু দিকটা কাবার হয়ে, ঢালুতে পড়েই গাড়ির গতি বাড়ল। ঝকাং করে ক্লাচ পড়ল। গরগরিয়ে উঠল ইঞ্জিন। গাড়িটা কিছুটা ছুটে গিয়ে থামল। হাত নেড়ে লেডি ডাক্তার ডাকছে। দরোয়ান আর নাপিত ছুটে গেল। ওদের হাতে কি যেন দিল, বোধ হয় বখশিষ।

দীপুর হাঁটুর কাছের নুনছাল উঠে গেছে। ক্লাচ দিতেই আচমকা থমকে গেছল গাড়িটা, তখনই মাডগার্ডের ধারটা লেগেছিল।

সামনের বাগানটা চক্কর দিয়ে গাড়িটা পূর্বদিকে চলে গেল। কমলা তাকিয়ে রইল ওইদিকে। সুন্দর মুখটা চলে গেল। অল্প অল্প ধোঁয়ার গন্ধ আসছে। বেশ লাগে শুঁকতে।

—ওরা পয়সা নিল।

—দিল বুঝি?

—হুঁ।

—ওরা তো নেবেই!

—আমায় দিলে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

—তোকে দিতই না। শিক্ষিত তো মানুষ চেনে। কাকে দিতে হয় না-দিতে হয় বোঝে।

—পয়সাটা দুজনে ভাগাভাগি করে নেবে।

—তাতো নেবেই!

—আমায় যদি দিতে আসে।

—আসবে না।

—আমি না ঠেললে গাড়ি চলত না কিন্তু।

নাপিত আর দরোয়ান এতক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। নাপিত চলে গেল। দরোয়ান ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

—আপনারা যাবেন কখন?

—এই তো এক্ষুনি যাব।

—দেরি করলে আরো গরম পড়বে, বাচ্চার কষ্ট হবে। কাল একশ পাঁচ ডিগ্রি হয়েছিল।

অবাঙ্গালি দরোয়ান। অনেক দিন এদেশে আছে তাই কথাগুলো শুনতে মিষ্টি লাগে। ওরা দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে রইল। দরোয়ান অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে টুলে গিয়ে বসল।

—কি বলেছিল রে, আসবে তো?

—হ্যাঁ, ছুটি করিয়ে চলে আসবে বলেছিল, বোধ হয় কাজের তাড়া পড়েছে।

—জানি, তোকে আর বোঝাতে হবে না। যত কাজ ওর আজকেই।

—বোধহয় ছুটি পায়নি। অফিসে খুব গোলমাল চলছে বলছিল। বার-জনের চাকরি গেছে, সবাই ভয়ে ভয়ে রয়েছে।

—একটা দিন ছুটি নিলে কি এমন চাকরি যেত শুনি?

উবু হয়ে বসল দীপু। মুখ ফিরিয়ে রয়েছে কমলা। খুব রসালো লেবু চুষলে অমন হয় ঠোঁট দুটো। ছেলে মানুষের মত দেখতে হয়ে গেছে। দীপু বাচ্চাটার গালে আঙুল ছোঁয়াল। কনুই দিয়ে ঝট্‌কা দিল কমলা।

—মা, তোমাকে বাচ্চুর মত লাগছে কিন্তু।

উঠে পড়ল কমলা। কাপড়ের পুটলিটা এক হাতে নিয়ে গেটের দিকে চলতে শুরু করল। দীপু পিছু নিল।

—কোথায় যাচ্ছ?

কথা বলল না কমলা।

—বারে, বলবে না কোথায় যাচ্ছ?

গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল সে। এধার ওধার তাকিয়ে দিশা করতে পারলনা কোন দিকে যেতে হবে।

—বাড়ি যাবে নাকি।

—হ্যাঁ।

—কি করে যাবে!

—হেঁটে যাব।

—সেতো অনেকখানি।

—তবে কি সারাদিন হাঁ করে বসে থাকব! কোনদিকে যাব বল?

থ্যুতনি ঘ্যুরিয়ে দীপ্যু উত্তর দিক দেখাল। হাঁটতে শ্যুরু্যু করে দিল কমলা। ঠিক এক্ষ্যুণি কি করা উচিত দীপ্যু ভেবে পেল না। রাস্তা অনেকখানি, অথচ বসেও থাকা যাচ্ছে না। লক্ষ্য করল সে কমলার হাঁটা। এক একটা পা ফেলছে আর আঙ্যুলগ্যুলো কুঁকড়ে যাচ্ছে। চটি থেকে পা বার করে ফ্যুটপাথে রেখেই চমকে তুলে নিল।

—ওই বারান্দাটার তলায় দাঁড়াই।

মাথা নামিয়ে চলছিল কমলা। চলতেই লাগল। ওর হাত ধরে দীপ্যু ছায়ায় টেনে আনল।

—হেঁটে বাড়ি যাওয়া যাবে না।

—এই তো যাচ্ছি।

—রেগে গেছ বলে কষ্ট লাগছে না। সারা রাস্তাতো আর রাগতে রাগতে যাওয়া যায় না।

—তবে কি করবো?

—ফিরে যাই। হয়তো বাবা এসে পড়েছে এতক্ষণে। তাহলে ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কমলা। রাগ করে চলে আসাটা বোধ হয় ভুল হয়েছে। এমন করে কি বাড়ি পেঁছিন যায়। মান্যুষ কতক্ষণ আর রাগ করে থাকতে পারে। যেতে যেতেই পায়ের তলা ঝলসে যাবে। শরীরের ব্যথাও মরেনি, চললে কষ্ট হয়। তাছাড়া এত গরম বাচ্চাটাই বা সইবে কি করে।

ওদের দেখে দারোয়ান কাছে এল। দীপ্যুকে লক্ষ্য করে জিগ্যেস করল,—গেলে না যে!

চুপ করে রইল দীপ্যু। এবার কমলাকে সে জিগ্যেস করল,—নিতে আসার কথা আছে ব্যুঝি?

—হ্যুঁ।

দারোয়ান চাবির তোড়া বাজাতে বাজাতে চলে গেল। কোথা থেকে কান্নার শব্দ আসছে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। এসে পড়ল। দ্যুই ব্যুড়ি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। রাস্তা থেকে টায়ার ফাটার শব্দ এল। কাক ডাকছে।

—ব্যাটা দরদ দেখিয়ে গেল।

—কে?

—আমি না থাকলে ওর বকশিষ জ্যুটত না।

—লোক ডেকে গাড়ি ঠেলত।

—তাদের তো পয়সা দিতে হত।

হলকা আসছে। বাচ্চাটা আরও ছোট হয়ে গেছে যেন। ব্যুকের আরো কাছে কমলা জড়িয়ে ধরল। দীপ্যুর কানের পিছন দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। আঁচল তুলে ম্যুছিয়ে দিতে গেল, মাথা সরিয়ে নিল দীপ্যু। জামার হাতায় ম্যুছে নিল।

—একটা রিক্সা করে চলে যাই চলো।

—পয়সা?

—তুমিতো জমিয়ে রাখ।

—কে বললো?

—সেদিন দুপুরে যে বাসনওলাকে ডাকছিলে।

—সে তো এমনি ডেকেছিলুম, কিনেছি নাকি!

—তা হলে দোতলার বউদির কাছে ধার নিলেই হবে।

—না ধার কত্তে হবে না।

—কেন, ক্ষতি কি?

—পরে যখন ট্যাক্ ট্যাক্ করে কথা শোনাবে!

—তা বলে সারাদিন এখানে বসে থাকব নাকি।

—তুই অত রেগে উঠছিস কেন? অধৈর্য হোস কেন? দ্যাখনা উনি হয়তো এসে পড়বেন।

—উনি যদি নাই আসেন, তা বলে কি বসে থাকব? আমি পারব না, আমার খিদে পেয়েছে।

দীপু হাঁটতে শুরু করল। একদমে এসে ফুটপাথে দাঁড়াল। কমলা আসতেই চটিটা খুলে এগিয়ে দিল।

—কি হবে?

—পরো, নইলে চলবে কি করে?

—তুই?

—ঠিক আছে।

ততক্ষণে দীপুর পায়ের চেটো জ্বলতে শুরু করেছে। ছুটে সে গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তার গাছ। লিকলিকে তার ছায়া।

মা দাঁড়িয়ে কেন, হাঁটতে আরম্ভ করো।

অবাক হয়ে কমলা ওর কাণ্ড দেখছিল। চটি পরা অভ্যাস নেই। আঙুল দিয়ে ফিতেটাকে আঁকড়ে থপথপিয়ে একটু হেঁটেই থেমে গেল। দীপু পায়ে পা ঘষছে। হেসে ফেলল কমলা।

—দূর, আমি কি এমনভাবে চলতে পারি?

—নইলে দেরী হয়ে যাবে যে। অপু, নীপুদের এখনো খাওয়া হয়নি।

গাছের ছায়ায় কমলা এসে পৌঁছতেই দীপু আবার ছুট লাগাল অনেক-দূরে একটা হাইড্রেন্ট কল লক্ষ্য করে। দুটো লোক স্নান করছে। জলে পা ভিজিয়ে দীপু দাঁড়াল। কমলা অনেক দূরে। ছেলে কোলে, পুঁটলি হাতে থপথপিয়ে হেঁটে আসছে। দু হাতে জল নিয়ে দীপু মাথায় থাপড়াল।

—অ দীপু, অমন করে তুই কত ছুটবি!

—দাঁড়ালে কেন, হাঁটো।

—নীপুটাকে বার্লি দিয়েছিস্ তো?

—হ্যাঁ।

—ওরা চৌবাচ্চায় নাবতো না তো।

—না, না, না, তুমি হাঁটো।

আবার ছুটল দীপু। এবার একটা রিক্সার আড়ালে। রিক্সাওলা হুড ফেলে সিটের ওপর বসেছিল। কমলাকে তার দিকে তাকিয়ে আসতে দেখে নেমে দাঁড়াল। দীপুও লক্ষ্য করেছে কমলার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। রিক্সাটার দিকে কেমন কেমন করে তাকাচ্ছে।

—মা, রিক্সায় ওঠো।

—ধার করলে তোর বাবা রাগ করবে।

—জানবে কি করে?

—তাহলে কার কাছ থেকে নিয়ে ধার শুধবি।

—তবে সময় মত বাবা এলোনা কেন? কেন পয়সা না দিয়ে আমায় পাঠাল?

চীৎকার করল দীপু। চোখে জল এসে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে।

—অ দীপু, তুই চুপ কর।

—কেন করব? তোমার জন্যেই তো এই কষ্ট। দরোয়ানটার কাছ থেকে ঠিক ভাগ আদায় করে নিতুম।

—দীপু, তুই রিসকোয় ওঠ, আমি ধার শোধ করে দেব।

রিক্সাটা বোধ হয় বেশিক্ষণ এখানে এসে দাঁড়ায়নি। ছায়া হলেও পিচ গরম রয়েছে। দীপু ছায়া থেকে বেরিয়ে নর্দমায় পা রেখে দাঁড়াল।

—লক্ষ্মী ছেলে আমার।

—না।

—রিস্কায় ওঠ।

—না।

—কেন?

দীপু চোখ সরিয়ে নিল। কমলার চোখের থেকে দূরের রাস্তা অনেক ঠাণ্ডা। রিক্সাওলা দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। সিটে উঠে বসল।

ঘাম গড়াচ্ছে কমলার কপাল বেয়ে। ভুরু ভিজে গেছে। চোখ জ্বলছে। ঘাড়ে চোখ ঘষল। চোখ দুটো গর্তে বসে গেছে। শুকনো বাতাসে চুল উড়ে পড়ল কপালে। ঠোঁট চাটল কমলা। গলার নলিটা তুলতুল করে কাঁপছে।

—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চল ওখানটায় বসি। মনোহারি দোকানের সিঁড়িতে ছায়া। দীপু সিঁড়িতে বসল। কমলা এলনা। উঠে এসে ওর হাত ধরে দীপু টানল।

—আমি যাব্‌না।

—তাহলে কি করবে?

—জানি না।

মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দীপু টেনে আনল। দোকানি খবরের কাগজ পড়ছিল। ওদের দেখে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল।

—মা তোমার খিদে পেয়েছে?

—না।

—না কেন, এত বেলা হয়েছে!

—বেলায় খাওয়া আমার অব্যেস।

ঘাড় ঘুরিয়ে কমলা দোকানের ভেতর তাকাল। সারি সারি বোয়েমের ওধারে দোকানী কাগজ পড়ছে।

—তোর খিদে পেয়েছে?

—না।

—বললেই বিশ্বাস করবো। সাড়ে নটায় ভাত ভাত বলে চীৎকার করিস না?

—তোমারও তো পেয়েছে।

—আমার গা গুলোচ্ছে। খেলে বমি হয়ে যাবে।

আঁচল থেকে ছ'টা পয়সা খুলে দিল কমলা। বিস্কুট কিনল দীপু। খেতে খেতে আড় চোখে দেখল কমলা তার খাওয়া দেখছে। হাসছে যেন। দুর্গা প্রতিমার মত হাসিটা, মানে বোঝা যায় না। শেষ বিস্কুটটা বাড়িয়ে দিল দীপু।

—না তুই খা।

বাচ্চার বুকের ওপর বিস্কুটটা রাখতেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কমলা ধরে ফেলল। ওইটুকু দেখেই দীপু মুখ ঘুরিয়ে সরে বসল। পা ছড়িয়ে দিল টানটান করে। চোখ বুজল। জিভ দিয়ে মাড়ি পরিষ্কার করে, টাকরায় শব্দ করল।

কমলা তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে একদৃষ্টে। ফুটপাথে বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। অনেক দিনের, অনেক লোকের হাঁটা-চলায় জায়গায় জায়গায় দাগগুলো মিলিয়ে গেছে। দীপুর বাবার মুখের দাগগুলো এখনো মেলায়নি। তখন অনেকেই বলেছিল কচি ডাবের জলে মুখ ধুতে, ধোয়নি। এই ফুটপাথের মত হয়ে আছে ওর মুখটা। কত রোদ, জল, বৃষ্টি, মানুষের পায়ের চাপ খেয়েছে এই ফুটপাথ। মানুষটাও ক্ষ্যাপাটে হয়ে গেছে। ক্ষেপলে মুখটা বাটনা বাটা শিলের মত হয়ে যায়। একঘেয়ে, রোজকার অভ্যাস। আয় বাড়ছে না, ঘর বাড়ছে না, খাটুনিরও কামাই নেই।

—কেন যে এমন করে। এতে আমার কি দোষ, আমি কি করতে পারি, উঁ।

ফুটপাথের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে নিজের মনেই কমলা বলল। বাচ্চার গলায় সুতোর মত ময়লা জমেছে। সাবধানে তুলে ফেলে দিল। মাথায় হাত বুলোল। চুল নেই বললেই হয়। দীপুটারও ছিল না।

আস্তে অস্তে কমলার শূন্য চোখ ভরাট হয়ে উঠল। হাসল সে।

—তোর বেলায় ট্যাক্সি করে এসেছিলুম।

—সে কথা তো বললে।

—বলেছি নাকি। তুই এর থেকেও বড় হয়েছিলি, বলেছি? হলেই কি কান্না। এটা কিন্তু একদম কাঁদেনি।

বাচ্চার ঠোঁট নড়ছে। বোধ হয় খিদে পেয়েছে। কমলা মাই গুঁজে দিল ওর মুখে। দীপু আড়চোখে দোকানির দিকে তাকাল। এইদিকেই তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই কাগজটা তুলে ধরল।

—তোর ষষ্ঠী পুজোর দিন একটা ধনেখালি ডুরে পেয়েছিলুম। ঠাকুরঝির বিয়েতে খোঁচা লেগে ছিঁড়ে গেছল। পর্দা করেছিলুম।

—আমাদের পর্দা ছিল!

—জানালায়। ঘণ্টুদের বাড়িতে একটা লোক তখন ভাড়া ছিল, খালি তাকাতো।

খেয়াল হল, চটিটা এখনো পরে আছে। খুলে ফেলল।

—থাক না।

—না তুই পর। ওটা পরলে কেমন কেমন লাগে। পায়ের পাতায় হাত বুলোল কমলা। আঙুলে হাজা, গোড়ালি ফাটা।

—আমার জন্যই এই কষ্ট, নারে?

—তোমার জন্য কেন হবে।

—এইতো একটু আগে বললি।

দীপু মাথা নামিয়ে পায়ের আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঘষতে শুরু করল। ময়লা উঠছে। ঝেড়ে ফেলে আবার ঘষতে লাগল। কমলা মুখ তুলে তাকাল আকাশে। চোখ পাতা যায় না। তাকাল ফুটপাথে। সেই বসন্তের ঘায়ের মত দাগ। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, কষ্ট কি আমি ইচ্ছে করে দি, সংসারে দুঃখ বাড়ুক তা কি আমি চাই, কিন্তু তোর বাবার যে একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই। বারণ করলে রেগে ওঠে।

—যার কাণ্ডজ্ঞান নেই তার রাগেরও কোন মানে নেই। আপিসে বসে মজা দেখছে হয়তো, আর আমরা এখানে।—

মুখ তুলল কমলা। ছেলের চোখে রাগ, ধমকানি, দুঃখ। ও এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। ধক্ করে উঠল কমলার বুক। ছেলেকে আর চেনা যাচ্ছে না। মস্ত বড় হয়ে গেছে। বুঝতে শিখেছে, ধমকাতে শিখেছে। কিন্তু ও ধমকাচ্ছে কাকে! আমাকে! আমি কি দোষ করেছি, ইচ্ছে করে কি সংসারে অশান্তি এনেছি? ছেলেটা বাপের স্বভাব পেয়েছে, সব তাতেই রেগে ওঠে। ওইটুকু ছেলে রাগে কেন? ওকি বড় হয়ে গেছে, সংসারের হালচাল বুঝে ফেলেছে? যদি বোঝে তা হলে রাগে কেন, কেন আমায় ধমকায়, কেন ওর বাপের স্বভাব পাচ্ছে? এতে আমি কি দোষ করেছি?

কমলা চুপ করে তাকিয়ে রইল। রাস্তার ওপারে ফুটপাথে ছায়া পড়েছে।

খাটিয়ায় একটা লোক ঘুমিয়ে, কাঠ কাটছে একটা মেয়ে মানুষ। হঠাৎ দমকলের ঘণ্টা বাজল। গাড়িগুলো রাস্তার কিনার ঘেঁষে এল। ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল একটা দমকল।

—আহারে, কাদের আবার কপাল পুড়ল।

—যাদেরই পুড়ুক না, তোমার কি?

—ক্ষতিতো হবে!

—হোক্‌গে, তা ভেবে আমাদের কি হবে, বাড়ি পৌঁছতে পারব কি?

ছেলের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে। বেলা হয়েছে। খিদে পেয়েছে। তা ছাড়া কি ভীষণ গরম। পিচ গলে চট্‌চট্‌ করছে। চড়বড় শব্দ হচ্ছে গাড়ির চাকায়। এখন অনেকখানি পথ হাঁটলে তবে বাড়ি পৌঁছোন যাবে। ছেলেমেয়েগুলোকে শিকলি দিয়ে ঘরে আটকে রেখে এসেছে। তাদের খাওয়া হয়নি। গিয়ে উনুন ধরিয়ে রেঁধে খাওয়াতে হবে। ওরা এতক্ষণ কি করছে কে জানে। হুটোপাটি করে ঘরের জিনিষ ভেঙেছে। বালিশ নিয়ে যুদ্ধু-যুদ্ধু খেলেছে। নীপুটার ভীষণ লোভ চিনি খাবার। দেয়ালে পা দিয়ে দিয়ে উঠে হয়তো শিশিটা সাবড়ে দিয়েছে। বাচ্চুর ঘরকন্নার কাজ খুব পছন্দ। কুঁজো থেকে জল ঢেলে, জামাটামা কিছু একটা দিয়ে হয়তো ঘর মুছতে শুরু করেছে। কিন্তু কতক্ষণ ওরা ঝগড়াঝাটি খেলা করবে। খিদে পাবে, চীৎকার করবে, কাঁদবে। ওরাতো সব সময়ই চেঁচায়। পাশের বাড়ির লোকেরা গ্রাহ্যই করবে না। তারপর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়বে। নীপুটা আগে ঘুমোবে। ওর স্বাস্থ্যটাই ভালো। অপুকে হয়তো বাচ্চুই ঘুম পাড়িয়ে দেবে। জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বাচ্চুটাও ঘুমিয়ে পড়বে, এক সময়।

—আবার উঠছে কেন?

—আমি বসে থাকতে পারছি না রে। আমার কষ্ট হচ্ছে।

—হচ্ছেতো যাও, আমি উঠতে পারব না।

—তুই অমন করে আর কথা বলিসনি।

—কেন বলব না, কেন পয়সা পর্যন্ত চেয়ে রাখ না।

—আমায় যদি না দেয়, কি করতে পারি। তুই তো তোর বাপকে চিনিস। কোনদিন আমার হাতে একটা পয়সাও খরচ করার জন্য দেয়নি, দেখেছিস দিতে? হাসিমুখে কথা বলতে দেখেছিস? দোতলার বৌ এখনো হেজলিন পাউডার মাখে, আমায় মাখতে দেখেছিস!

—তুমি একটা বোকা, তাই চাইতে পার না, জোর করে চাইতে পারনা। মান ইজ্জতটাই তোমার কাছে বড়, নইলে দরোয়ানটা পর্যন্ত—

ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে কমলা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ও বলছে আমি বোকা। সংসারে খাটি বলে পয়সা নিতে হবে। ওকি সংসার ভালবাসেনা! ও সংসারের কি বুঝেছে? এ বয়সেই চালাকি শিখে গেছে। চালাকি করে কি

ভালবাসা যায়? দয়ামায়া বলে কিছু আর থাকবে না! তাহলে একটু আগে ও কেন আমায় চটি পরতে দিয়েছিল? ওর নিজের পা পুড়বে তা কি ও জানত না!

মুখ ঘুরিয়ে বসে আছে দীপু। কমলার চোখ টল্‌টল্‌ করছে। দোকানি টেবিলে থুতনি রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। এতক্ষণে একটাও খদ্দের আসেনি।

রোগা জির্‌জিরে একটা গরুকে দুটো লোক টানতে টানতে নিয়ে এল। ইলেকট্রিক পোস্টে বেঁধে লোকদুটো এধার ওধার তাকাতে লাগল। মুচকে হেসে গেল এক ব্যাঙ্কের পিওন। খাটিয়ায় শোয়া লোকটা উঠে বসেছে। উবু থাবড়ে চা-ওলাকে ডাকল। সামনের বারান্দায় ঘোমটা দিয়ে এক বৌ এসে দাঁড়াল।

—শালা যা গরম পড়েছে। না যায় ঘরে বসে থাকা, না যায় বাইরে বেরোন।

লুঙির কসি আঁটতে আঁটতে দোকানি বেরিয়ে এল। টাক্‌নায় শব্দ করে সিঁড়ির ওপর বসল। গোরুটা চোখ বুজে জাবর কাটছে।

—উধার দেখো। গলিকা ভিতর একঠো হ্যায়।

দোকানি হাত দিয়ে কাছের গলিটা দেখিয়ে দিল। দুটো লোকের একজন সেইদিকে গেল। একটা মাছি বসেছে গোরুটার পিঠে। থর্‌থরিয়ে চামড়া কাঁপাল। উঠে দাঁড়াল দীপু। হন্‌হন্‌ করে খানিকটা গিয়ে পিছু ফিরে তাকাল। কমলা সঙ্গে আসেনি।

—কিজন্য দাঁড়িয়ে আছ? চলে আসছ না কেন?

ওর কাছে এসে কমলা বলল, তুই হঠাৎ এমনভাবে হাঁটতে শুরু করে দিলি যে,—

কথা না বলে হাঁটতে লাগল দীপু। ঘাড়টা নিচু দিকে নামান। হাত দুটো আড়ষ্ট। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না।

পা জ্বলছে। জ্বলুক। ওকথা বললেই বিপদ। ছেলে হয় তো আবার বলবে ছায়ায় দাঁড়াই। তাহলে বাড়ি পৌঁছন যাবে না। কিংবা হয়তো চটিটা খুলে দেবে। নিজে কষ্ট পাবে। ছোট ছেলে, কষ্ট দেখলে ওদের মনতো গলবেই। তার চেয়ে এই ভাল। ওকে কষ্টের কথা জানতে না দিলেই হল। এখন অনেক রাস্তা হাঁটতে হবে। ওই খ্যাংরা কাঠির মত আলোর থামটা ছাড়িয়েও বোধহয়।

—অ দীপু, একটু আস্তে চ। আমি কি তোর মত জোরে হাঁটতে পারি।

দীপু দাঁড়াল। কমলা পাশে আসতেই বলল, ওটাকে আমার কাছে দাও।

—নারে বড্ড গরম, পারবি না।

—খুব পারব।

বাচ্চাকে দীপুর কোলে তুলে দিল কমলা। আস্তে আস্তে পা ফেলে চলতে লাগল দীপু।

—হ্যাঁরে, তোর মনে আছে বাচ্চুকে একবার ফেলে দিয়েছিলি?

জবাব দিল না দীপু। কথা বলতে গেলে রাস্তা দেখে চলা যায় না ঠিক মত। ঠোক্কর খেয়ে পড়লে বাচ্চাটা বাঁচবেনা।

—ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌ করতিস খালি বোনকে কোলে নেবো বলে। একদিন দিলুম কোলে তুলে, ওম্মা! দেয়া মাত্তরই যেই দাঁড়াতে গেছিস অমনি টলে পড়ে একসা কাণ্ড—।

—শালা খচরা কোথাকার!

ইঁটটাকে লাথি মেরে দীপু রাস্তায় পাঠাল।

হাতের ছোট্ট পুঁটলিটা দুলিয়ে ছেলে মানুষের মত কমলা হাসল। পায়ের জ্বলুনিটা সয়ে এসেছে। রাস্তার সবটাইতো আর তেতে নেই। মাঝে মাঝে ছায়া আছে। দোকান থেকে গড়িয়ে আসা জল আছে, মাটির ফুটপাথ আছে।

—আচ্ছা বলতো, এখন যদি হঠাৎ তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়, কিংবা সেই দরোয়ানটা এসে বখশিষের পয়সা দিয়ে যায়, তাহলে ট্যাক্সি করে বাড়ি যাওয়া যায় নারে?

দীপুর দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে কমলা কুটকুট করে বিস্কুটে কামড় দিল।

মৃত্যু

দিব্যেন্দু পালিত

বন্ধুদের চোখের দৃষ্টি ছটফট করছিল। একে একে এগিয়ে এল তারা; কাছে, আরো কাছে। তারপর কানে কানে গোপন কথা বলার মতন ভিজে প্রায়-রুদ্ধ গলায় তাদের মনের কথাগুলি বলল।

কান পেতে সবটা শুনল সে। নিথর ঠোঁট দুটো মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, কিন্তু কথা ফুটল না। আরো খানিকটা সময় তখনো ছিল। স স ক'রে অদ্ভুত একটা শব্দ করছিল ইঞ্জিনটা, পুরনো ব্যথার মত ককিয়ে ককিয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল চিমনির কালো ধোঁয়াগুলো। শূন্য নিষ্পলক দৃষ্টিতে স্থিরভাবে তাকিয়ে ছিল সে, আর তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা মনে পড়ছিল তার।

বন্ধুদের একজন তার হাতটা তীব্র আবেগে আঁকড়ে ধরেছিল। তার মনে হচ্ছিল, হাতের আঙুলগুলো এবার ছিঁড়ে খ'সে পড়বে। কিন্তু সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

তার চোখের পাতায় ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত নতুন এক রোমাঞ্চে সেই রাত্রিটা নেমে আসছিল। মালয়ের রবার বনের মাথায় হঠাৎ কলকব্জা অকেজো হয়ে ভেঙে পড়েছে প্লেনটা! তারা ছিল তিনজন। কানের পাশে খুব কাছেই কোথাও মৃত্যুর প্রচণ্ড অট্টহাসি শুনতে পেল যেন। কুড়ি ফুট পঁচিশ ফুট কী তার চেয়ে আরো দীর্ঘ, কদর্য হয়ে কতগুলি উলঙ্গ অস্থির বিভীষিকার ছায়া নাচানাচি করছিল চোখের সম্মুখে। সেই চরম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তার মস্তিষ্কে একটি ধ্রুব-নক্ষত্র তখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছিল। স্পষ্ট জানত সে যে, সে আর বাঁচবে না। কয়েক শো গজ নিচের নিতল শূন্যের অঙ্ক স্পর্শ করতে না করতেই নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হাত পা অঙ্গ-অবয়বের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে নিয়ে কালো গভীর হয়ে নিষ্করুণ রাত্রি নামবে। আর তারও অনেক বছর পরে—

কিন্তু...সে মরল না। মরেও বেঁচে গেল। তার মনে হল, যেন সম্পূর্ণ নতুন এক পৃথিবীতে নতুন ক'রে জন্ম নিয়েছে। আনন্দে চীৎকার করতে গেল সে; গলা চিরে রক্ত বেরুবার মতন হল, তবু একটি শব্দ বেরুল না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, চোখের সামনে বীভৎস একটা দুঃস্বপ্নের মতন পড়ে রয়েছে তার সহ-কর্মীর থেঁতলে ঝলসে যাওয়া ভয়ঙ্কর মুখ! দাঁতের মাড়ি আর দাঁতগুলো সব আল্‌গা আল্‌গা হয়ে ঝুলে রয়েছে বাইরে; চোখের মণি দুটো ফেটে গিয়ে ঘিয়ের মত কেমন একটা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে!

আর সহ্য হল না। দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকতে গিয়ে সহসা যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠল সে। বাঁ হাতটা তার কব্জির কাছ থেকে ভোজবাজির মত কোথায় অদৃশ্য হয়েছে; রক্তে ভেসে গিয়েছে সমস্ত শরীর। ডান চোখটা অসহ্য যন্ত্রণায় টনটন ক'রে জ্বালা ক'রে উঠল; মাথার সমস্ত শিরাগুলো যেন এক সঙ্গে পট্ পট্ ক'রে ছিঁড়ে গেল। অবশ অবসাদে সর্বাঙ্গ ঝিমিয়ে পড়ছিল তার। অন্ধকারে সে আর কিছুই দেখতে পেল না।

কিন্তু তার ভাগ্য ভাল। কারণ, এবারও সে বেঁচে গেল। সে শুনেছে, তিন দিন আর তিন রাত্রির পর তার ঘুম ভেঙেছিল। ঘনবদ্ধ রবার বনানীর পাতা-জালের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে প্রসন্ন সূর্যের ক্ষীণ আলো এসে লুটিয়ে পড়েছিল তার মুখের উপর। সবুজ রঙের ছোট্ট একটা প্রজাপতি ফরফর করছিল তার চোখের সম্মুখে। অবাক বিস্ময়ে চার পাশে তাকাল সে এবং আরো চারটে রুগ্ন, শুষ্ক করুণ অসহায় মুখ তার চোখে পড়ল।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' প্রায় নিঃশব্দ স্বরে তারা বলল, 'তোমার জ্ঞান ফিরেছে। এই তিনদিন আহার নিদ্রা ছেড়ে শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি।'

সে চোখ বন্ধ করল, আবার খুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কে?'

তারা হাসল নীরবে। মধুর মুগ্ধ আনন্দের হাসি। আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা বন্ধু। আজ প্রায় একমাস এইভাবে এই বনের মধ্যে পড়ে আছি। সে এক মহাভারতের কাহিনী। যাক্। তোমাকে সুস্থ দেখে আমরা নিশ্চিন্ত। এই তিনদিন আমরা ঘুমুতে পারিনি, শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি, আর প্রার্থনা করেছি।'

'তোমরা মহৎ', কষ্ট ক'রে সে বলল, 'তোমরা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ। তোমাদের ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে।' তারা বলল। তারপর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে একটু সরব ও সতর্ক হয়ে বলল, 'আজ থেকে আমরা বন্ধু। উই আর ফ্রেন্ডস্।'

রবার বনের ঘন গভীর দুর্ভেদ্য পাতার অরণ্যে সূর্যের আলো তখন একটু একটু ক'রে অনেকখানি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। উষ্ণ কোমল একটা স্পর্শের অনুভূতি ছিল সর্বাঙ্গে। আর বিচিত্র শব্দে মাঝে মাঝে একটা পাখি ডাকছিল। তারা চারজন এবং আরো একজন, পাঁচজনে সেই দুর্বোধ্য ডাকের একটা অর্থ খুঁজে বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।

তারপর সে তার কাহিনী বলে গিয়েছিল।

সে বলেছিল, সে একজন সৈনিক হলেও মৃত্যুকে তার অমানুষিক ভয়। মরতে সে চায়না, বাঁচতে চায়। সুস্থ সহজ সুন্দর ও মনোরম জীবনের ছোঁয়ায় মধুর হয়ে যেতে চায়। শুধু মাত্র দিয়ে দিয়ে আর নিয়ে নিয়েই যে জীবনের আনন্দ, সেই আনন্দের জীবনের স্বাদ বর্ণ ও গন্ধ নিয়ে বেঁচে থাকবার আশ্বাস-টুকুই সে শুধু চায়। চেয়েছে।

তার মনে পড়ছে, এই পৃথিবীর অনেক অসংখ্য সুন্দর দিনের মতন একটি দিনে তার জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্নের সেই শুভ মুহূর্তে আনন্দ-ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হয়নি, বাতাসও কেঁপে ওঠেনি। কিন্তু সেদিনও আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ছিল। সে শুনেছে। জ্যোৎস্নার আলোয় আচ্ছন্ন সেই অপরূপ রাতে গাছের পাতারা হীরের সাজ পরেছিল; নদীর জলে রূপো ঝ'রে পড়েছিল; নীল একখণ্ড মেঘ স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল আকাশের মাঝখানে। যেন চলতে চলতে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একটা নতুন রহস্যের দুরন্ত খেলা দেখছিল। আর জোনাকিরা লুকোচুরির মায়ায় মিশে গিয়ে, জোড়া পায়ে তালি বাজিয়ে বিশ্বচরাচরে আরো এক সুন্দরের জন্ম ঘোষণা করছিল।

তারপর সে বড় হল। তরুলতার মতন এককে জড়িয়ে, অন্যকে নির্ভর ক'রে। ভালবাসার মধ্যে ছড়িয়ে দিল, হারিয়ে দিল—আর মেলে ধরল নিজেকে। ভালবাসতে শিখল।

জীবনের রূপ তখন তার চোখে একটু একটু ক'রে বদলে যাচ্ছে। আরো সুন্দর হয়েছে সব; সুন্দর হয়ে ঝ'রে যাচ্ছে ক্রমশ। তার বাবা তাকে পৃথিবীর নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'সত্যকে গ্রহণ করো, ভালবাসো। তবেই প্রতিদানে ভালবাসা পাবে। তার চেয়ে মহৎ উজ্জ্বল ও পবিত্র আর কিছুই নেই।'

'ভালবাসা কী?'

বাবা বললেন, 'অন্যকে ভালবাসলেই তা ভালবাসা হয় না! সে হল অখণ্ড, অপূর্ণ। কারুর মুখে যদি খুশির হাসি ফোটাতে পার, তৃপ্তির সুষমা—সেখানেই তুমি সার্থক, তোমার ভালবাসা সার্থক।'......

তারপর দেখতে দেখতে একটা শকুনের ডানায় ভর ক'রে যেন অন্ধকার নেমে এল। গহন গাঢ় অন্ধকারে সত্যের পথ-চিহ্ন গেল মুছে। যুদ্ধ শুরু হল। বাবা যুদ্ধে গেলেন, আর ফিরলেন না।

তাদের সেই ছোট অনটনের সংসার আরো স্ফীত হয়েছে তখন। গুটি গুটি ক'রে আরো পাঁচজন এসে দাঁড়িয়েছে তার পিছনে। তাদের চোখে স্বপ্ন, মুখে ক্ষুধা এবং বুকে জ্বালা। হ্যাঁ, সেই সবুজ অবুঝ বয়সেই তাদের ফুল-কোমল বুকগুলিতে একটা গভীর সন্দেহের জ্বালা ধুক্‌পুক্‌ করছিল। বিশ্বাসের বাঁধন গিয়েছিল আল্‌গা হয়ে।

সে তবু বিশ্বাস হারায়নি। দুর্যোগের কালো মেঘ তার সম্মুখে, শকুনের বীভৎস ডানার ছায়া তার মাথার উপর। সে তবু নির্ভয়, নিঃশঙ্ক, নিটুট।

'মা, আমি যুদ্ধে যাবো।' মাকে বলল সে।

বাবার মৃত্যু-সংবাদ তখনো মা'র কানে যায় নি। অশুভ আশঙ্কায় ব্যাকুল বিহ্বল মা শুধালেন, 'কেন?'

'বাঁচার জন্যে।' সে বলল, 'আমাদের বাঁচতে হবে, মা; বাঁচার জন্যে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে অনেক টাকা, অনেক প্রতিপত্তি।' ভবিষ্যতের রামধনু

কল্পনায় ঝক্‌ঝক্‌ করছিল তার চোখের দৃষ্টি, থরথর করছিল গলা। সে বলল, 'আমি বড়লোক হয়ে ফিরে আসব! কিছুদিন তো মাত্র। আমাকে যেতে দাও, মা।'

'কিন্তু সেখানে গেলে যে আর ফেরে না!' বাবার কথাটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন মা।

'অনেকে ফেরে', সে বলল, 'আমরা ফিরব, আমি নিশ্চয় ফিরব।' উত্তেজনায় ফাঁক-ফাঁক নিঃশ্বাস পড়ছিল তার, গলা কাঁপছিল, 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে, তারা কোনদিন পরাজিত হয় না, মা। আমাদের জয় অনিবার্য।'

সে যা শুনেছিল, তাই বলল। এর বেশি অন্য কিছু, নতুন কোন কথা তার জানা ছিল না।

যাবার আগে সে তার বোন দু'টিকে আদর করল, ভাই দু'টিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল। মাকে দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তীক্ষ্ম অথচ শান্ত স্নিগ্ধ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে। মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, গালে গাল চেপে সমস্ত উষ্ণতার উত্তাপ-টুকু মেখে নিয়ে, অবোধ শিশুর মত মা'র বুকে মুখ গুঁজল, গলায় কপালে চুমু খেল। পথভ্রষ্ট অন্ধ হরিণশিশু গন্ধের আকর্ষণে হঠাৎ যেন তার মা'কে খুঁজে পেয়েছে।

'মা, আমি আবার ফিরে আসব।' সে বলল।

মা অশ্রু-সিক্ত রুদ্ধ গলায় বললেন, 'আসবি, আসবি। আমার মাতৃত্ব যদি সত্যি হয়, তাহলে তুই অক্ষত দেহে আবার আমার বুকে ফিরে আসবি।'

'মা!' সে চীৎকার ক'রে উঠল, কাঁদল। তারপর আস্তে আস্তে পুরনো নোনা-ধরা জীর্ণ ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ঝাপ্‌সা চোখে বাড়ীটাকে দেখল একবার। ভাবল, এই জীর্ণ ঘরের মরা সৌন্দর্যে আবার যৌবন ডাকবে। উদ্দাম অস্থির অতি চপল এবং অতি দুরন্ত হবে সেই যৌবনের চেহারা। দরজার বাইরে ফণিমনসার কাঁটা-গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল সে। কাঁটা ফুটে রক্ত বেরুল। টকটকে, লাল, উজ্জ্বল। সে ভাবছিল, এই কাঁটাও একদিন ফুল হবে: রক্তের মতন লাল ফুলের রাশি রাশি স্তবক সুন্দরের স্বপ্ন হয়ে ফুটবে, হাসবে।

এইসব ভেবে পথে পা দিল সে।

'তারপর, দেখছো, আজও আমার ঘরে ফেরা হয়নি!'

বন্ধুরা এতক্ষণ অপলক চোখে, স্ফুরিত অধরে সব শুনছিল। রৌদ্রের আভায় তাদের তামাটে শ্মশ্রুতে কেমন এক ধরনের হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে; কপালের রেখাগুলো আরো ঘন ও পুরু হয়ে জড়াজড়ি করছে, ভ্রূরেখা কাঁপছে, সঙ্কুচিত আর প্রসারিত হচ্ছে।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারা বলল, 'ঠিক এই রকম না হলেও, অনেকটা এই ধরনের, হ্যাঁ, অদ্ভুত জীবন্ত এক জীবনের প্রবল আকর্ষণে আমরা যুদ্ধে সৈনিক হয়েছি। শুনেছি, এ-যুদ্ধ মৈত্রীর যুদ্ধ, সাম্যের যুদ্ধ, ভবিষ্যতের

স্বচ্ছন্দ সাবলীল সম্ভাবনার স্বপক্ষে, বর্তমানের অনিশ্চিত প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে আগামী দিনের যুদ্ধ। কিন্তু, আমরা কী পেলাম!'

তাদের নিঃশ্বাসের শব্দগুলি একসঙ্গে কোলাহল ক'রে বেজে উঠল। তাদের বুকের বেদনাগুলি প্রচণ্ড শব্দে ফেটে পড়ল না; কিন্তু নিটোল অশ্রুতে বাষ্পময় হয়ে উঠল।

সে বলল, 'আমারও সেই কথা মনে হচ্ছে আজ। আমাদের আশা ছিল অনেক, কিন্তু সেই আশার পাওনার কতটুকু আমরা পেলাম! তবু, তবু আমি বিশ্বাস হারাইনি।' নিজের বিকলাঙ্গ জ্বর-তপ্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে সে বলল, 'বন্ধু, তোমরা দ্যাখ, আমার এই পঙ্গু, ভগ্ন দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার বাস্তবিক কোন অর্থ হয় না। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ছিল। কিন্তু আমি মরিনি, মরেও বেঁচে গেছি। আমার মায়ের আশীর্বাদ আমাকে বাঁচিয়েছে; আমার ছোট ছোট ভাইগুলি আর বোনগুলির শুভেচ্ছা আমাকে রক্ষা করেছে। তারা আমার পথ চেয়ে আছে, দিনের পর দিন আমার প্রতীক্ষা করছে। তাদের কাছে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত আমার মৃত্যু হবে না।'

মাথার উপর ভ্রমর গুঞ্জনের মতন অদৃশ্য বোমারু গুঞ্জন ক'রে গেল। ভয়চকিত বিবর্ণ হয়ে তারা শুনল; তারপর ফিসফিস, প্রায় বাতাসের মত নিঃশব্দ গলায় বলল, 'শত্রু, শত্রু। আমাদের চারিদিকে শত্রু। হা ঈশ্বর!'

'তিনিই আমাদের রক্ষা করবেন।' সে বলল, 'আমরা আবার ফিরে যাব। নিশ্চয় যাব। সুযোগ আমি আগেও পেয়েছিলাম, কিন্তু যাইনি। নিঃসম্বল হয়ে শূন্য হাতে শুধুমাত্র একটা বিকলাঙ্গ অক্ষম দেহের মৃত অস্তিত্ব নিয়ে তাদের কাছে আমি ফিরে যেতে পারব না। তাদের জন্য আমি বাঁচার আশ্বাস নিয়ে যাব, সুন্দর ফুলের স্বপ্ন তাদের আমি উপহার দেব। উঃ, তখন তাদের, এবং আমারও, কী আনন্দ যে হবে, তা আমি কল্পনা করতে পারছি না!'

মালয় থেকে টেনাসেরিম। সেখান থেকে মার্গুই, মৌলমিন হয়ে রেঙ্গুন। তারপর—

এইবার তার চোখ ফেটে অশ্রু নামল। ঝাপ্‌সা হয়ে এল দৃষ্টি। ইঞ্জিনের মলিন ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আজ এতদিন পরে এইসব ঘটনার স্মৃতি তার মনে ভিড় ক'রে আসছিল। বুকের চাপ-চাপ জমাট বেদনাগুলো গ'লে জল হয়ে গলার কাছে কাঁপছিল। বন্ধুদের দিকে সে আর চোখ ফেরাতে পারছিল না। সে বেশ বুঝছে, তার এখন জোরে চেঁচিয়ে কাঁদা উচিত; কাঁদতে পারলে অন্তত খানিকটা শান্তি পেত সে। কিন্তু ট্রেনের যাত্রীরা আর আশে পাশে আনাচে-কানাচে যারা ছিল, তারা নেহাত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দেখছে আর হাসছে।

'আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না, তোমাদের কাছ থেকে আমি আলাদা হয়ে যাব! আচ্ছা, তোমরা ভাবতে পার!' আস্তে আস্তে, মৃদু ভগ্ন রুদ্ধ কণ্ঠে সে

বলল, 'প্রায় তিনবছর কী তারও কিছু বেশি দিন আমরা একসঙ্গে ছিলাম। সুখেই ছিলাম, আনন্দে, সুখে এবং শান্তিতে। কোন কোন সময় আমার মনে হয়েছে, সেই ভীষণ ভয়সঙ্কুল অরণ্যের নির্জনতায় আমাদের নতুন ক'রে জন্ম হয়েছিল। কিন্তু—'

সত্যি সত্যিই এবার সে কেঁদে ফেলল এবং ঠোঁট কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেলল। ডানদিকের ছানি-পড়া নিষ্প্রভ চোখে আর পুড়ে-যাওয়া কদাকার উঁচু-নিচু মাংসল গালে তাকে কেমন অদ্ভুত আরণ্যক, হিংস্র অথচ মিষ্টি মমতায় আশ্চর্য করুণ দেখাচ্ছিল।

বন্ধুরা তার চোখের জল মুছিয়ে দিল। বলল, 'তুমি তোমার মায়ের কাছে, ভাইয়ের কাছে আর বোনের কাছে ফিরে যাচ্ছ; এর চেয়ে শান্তির কথা আমাদের কাছে আর কী হ'তে পারে? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। কামরার দরজায় হাতল ধ'রে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে রইল পিছনের দিকে। তারাও তাকে দেখছিল, হাত নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল। বাঁ হাতটা পঙ্গু না হলে সেও বন্ধুদের শেষ সম্ভাষণ জানাতে পারত! কালো নিশ্চল কতগুলি বিন্দুর মত হয়ে ক্রমশ তারা দৃষ্টির দূরত্বে হারিয়ে গেল।

ফিরে এসে সে তার নিজের আসনে বসল। কেমন নিঃসঙ্গ নিরায়ু মনে হচ্ছে নিজেকে। এমন কি, স্বদেশে স্বজনের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছাটুকুও হঠাৎ স্বাদ হারিয়ে ফেলেছে। তার মনে হল, তার শরীরের আরো কয়েকটা হাত-পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অন্য কোথাও ফেলে রেখে এসেছে!

অর্থহীন দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। একটি শিশু তাকে দেখে হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠে তার মা'র বুকে মুখ লুকালো। তিন বছর, দুর্ভেদ্য গহন অরণ্যে সেই আকস্মিক প্লেন দুর্ঘটনার পর থেকে আজ পর্যন্ত, আয়নায় নিজের মুখ দেখেনি সে। ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্নের বিবরে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। বুঝতে পারে সে, ধারণাও করতে পারে, তার মুখের চেহারা একটা পিশাচের চেয়েও রূঢ় আর বীভৎস হয়েছে। অনুভবও করতে পারে, কিন্তু মুখোমুখি হ'তে পারে না। মনে হয়, সেই নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে তার মৃত্যু ভাল। অথচ সে মৃত্যু চায় না; এবং একদিন সত্যিই সে সুন্দর সহজ ও প্রিয় ছিল, ভালবাসার মানুষ ছিল! যুদ্ধ তাকে একটা ভয়ের মানুষ তৈরী ক'রে ছেড়ে দিয়েছে!

মা কী আমায় চিনতে পারবে? আজ আট বছর পরে আমি দেশে ফিরছি!

জানালার বাইরে তাকিয়ে সে ভাবছিল। ঠিক চিন্তা নয়; ভয়, একধরনের ভয়ও ছিল তার মনে। যাদের কাছে সে যাচ্ছে, তার নিজের এতদিনের আশা ভরসা, দুঃখ ও যন্ত্রণা এবং জ্বালার বেদনা নিয়ে, তারা যদি তাকে না চেনে, কিংবা চিনেও ভুল করে! না, তা হয় না। তা হওয়া অসম্ভব বলেই মনে হয়। মা অন্তত তাকে চিনবেন, ছোট ছোট ভাই বোনগুলিও নিশ্চয় তাকে চিনতে

পারবে। তাদের মুখগুলি সে কল্পনা করতে পারছে। আজ তারা অনেক বড় হয়েছে; ছোট বয়সের সেই চপলতা আর চঞ্চলতার হাল্কা নিঃশ্বাসগুলো হারিয়ে বয়সের ভারে বেশ গম্ভীর হয়েছে! তারা ভাল হোক, বড় হোক, মহৎ হোক, মনে মনে সে প্রার্থনা জানালো।

হঠাৎ গিয়ে সে নিশ্চয় সকলকে খুব অবাক ক'রে দেবে। জীর্ণ বাড়ীটা এখন আরো জীর্ণ হয়েছে, ফণিমনসার জঙ্গল আরো ঘন হয়ে বেড়ে উঠেছে। চতুর্দিকে কেমন একটা থমথমে নিস্তব্ধ ভাব। ধীরে ধীরে গিয়ে সে দরজার কড়া নাড়বে। তার ছোট বোন, যাকে সে খুব ভালবাসত, এসে দরজা খুলে দেবে এবং তার বিকৃত মুখ ও চেহারার রূপ দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে আঁতকে উঠে ছুটে পালাবে। সে তবু হাসবে; হাসতে হাসতেই ঘরের ভিতরে ঢুকবে। ভয়ে সঙ্কোচে দ্বিধায় তারপর একে একে সকলেই আসবে, ভিড় করবে তাকে ঘিরে।

'আমাকে চিনতে পারছ না! আমি—' পরিচয় দিতে গিয়েও সে চুপ ক'রে যাবে। কারণ, ততক্ষণে তার মা এসে তার সম্মুখে দাঁড়িয়েছেন। অপলকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে মা-কে দেখবে সে। তারপর ডাকবে, 'মা!' মা একটু কেঁপে উঠবেন, তাঁর বিশ্বাসের সিংহাসনটাই সহসা দুলে উঠেছে যেন। সে আবার ডাকবে, 'মা, আমাকে চিনতে পারছ না!'

এক মুহূর্তে থমকে থেমে মা ছুটে এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবেন তাকে। 'সত্যিই তুই ফিরে এসেছিস, বাবা! আমি ভেবেছিলাম—'

'তুমি যে আমায় আশীর্বাদ করেছিলে, মা। তোমার আশীর্বাদ আমাকে সব সময় ঘিরে ছিল।'

সস্নেহে তার গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠবেন, 'কিন্তু, এ তুই কী রূপ নিয়ে ফিরে এলি, বাবা!' মা'র বুকের পাঁজর আর পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে।

'আমি যে আবার তোমার বুকে ফিরে এসেছি, তাই কী যথেষ্ট নয়, মা!' অনর্থক হলেও মাকে সান্ত্বনা দিতে চাইবে সে।

এতক্ষণ যারা দূরে দূরে ছিল, তারা এবার কাছে আসবে, চোখের কোণে তরল বিন্দুগুলিকে হাসিয়ে তোলবার চেষ্টা করবে। মা ক্লান্ত খুশির হাসি হেসে বলবেন, 'ওরে, শাঁখটা কেউ বাজা, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।'

সে আর ভাবতে পারছিল না। আনন্দে তার বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। ফ্লাস্কে বন্ধুরা জল ভ'রে দিয়েছিল, ইচ্ছা করলেই সে খেতে পারত। কিন্তু সে স্পর্শ করল না পর্যন্ত। ঘরে পা দিয়েই সে তার পিপাসা মেটাবে। মা বুঝবেন, বেচারা ছেলেটার কত তেষ্টাই না পেয়েছিল। কিন্তু, সে জানবে, জলের পিপাসা নয়, এ অন্য কিছু, নতুন কিছু। এ হল অমৃতের তৃষা, বাসনার রাজ্যে জীবনের তৃষ্ণা। যে-তৃষ্ণার জ্বালা নীলকণ্ঠ হলেও বুঝি মেটে না।

কতকগুলি স্টেশন এল আর গেল, তার খেয়াল হল না। মন্ত্রমুগ্ধের মত মনের গুহায় ক্রমাগত আঁচড় কাটছিল সে। তবে অনেকটা সময় যে সে ভেবে ভেবেই কাটিয়ে দিল, অনায়াসে এখন তা বুঝতে পারা যায়। এরপর কী করবে ভাবতে ভাবতে সে পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোক প্রথমে তাকে আমল দিলেন না। তাঁর মুখের ভঙ্গী দেখে মনে হল, এই ধরনের কুদর্শন বিভীষিকার মুখগুলির জন্য তার মনে একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর আতঙ্ক রয়েছে। কিন্তু নেহাত শিশুর মতন যখন সে তার করুণ কাহিনী বলে গেল, ভদ্রলোক নির্বাক হয়ে শুনলেন, শুনে করুণা হল তাঁর।

শূন্য কামরায় তারা দু'জনই শুধু যাত্রী। ভদ্রলোক বললেন, 'আট বছরে তো সমস্ত পৃথিবীটাই ওলট-পালট হয়ে গিয়ে নতুন ক'রে সেজেছে। আপনি কী সব চিনতে পারবেন?'

'কী বলছেন!' সে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠল, 'আমার নিজের দেশ, নিজের বাড়ী আমি চিনতে পারব না! কোথায় কোন গাছটি আছে তা পর্যন্ত আমি বলে দিতে পারি।'

ভদ্রলোক নীরবে হাসলেন।

পাগলের মতন সহসা বাঙ্কের উপর থেকে সে তার পুরনো স্যুটকেশটা টেনে নামাল। তারপর ভদ্রলোকের সম্মুখে খুলে ধ'রে একে একে জিনিসগুলো বার করতে করতে বলল, 'দেখুন, এই জিনিসগুলো আমি তাদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। এগুলি আমার মায়ের জন্যে, আর এগুলি আমার ভাইবোনের জন্যে। অবশ্য মূল্যের অনুপাতে এগুলি কিছুই নয়। তবু, এই সামান্য জিনিসগুলো জোগাড় করতেই আমাকে পুরো দু'বছর প্রাণ-পণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন, আমার এই পঙ্গু শরীরে এর বেশি আর সামর্থ্য ছিল না, সাধ্যও ছিল না। কিন্তু তারা কী আমার এই অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেনা? আপনিই বলুন?'

ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে তার চোখ দু'টি আচ্ছন্ন হয়ে ছলছল করতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি অত বিচলিত হচ্ছেন কেন! আসলে আপনার ওইসব ভাবনার কোন অর্থই হয় না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' সে একটু হেসে বলল, 'আমার ছোট বোনটির কথা তো আপনাকে বলিনি। একবার কী হয়েছিল জানেন—'

সন্ধ্যার সময় সে ট্রেন থেকে নামল। নেমেই একটু হতভম্ভ হল। এ কোথায় এল সে! স্টেশনের নামে অবশ্য সেই নামই চিহ্নিত আছে; কিন্তু সেই পুরনো নামের কাঁচা অক্ষরগুলো সবই নতুন ক'রে সাজানো হয়েছে। কাঁচা মাটির প্ল্যাট-ফর্ম আর নেই। যেন এই আট বছরের মধ্যেই একটা বিরাট পরিবর্তন এসে মাটির মমতাকে ভেঙেচুরে কংক্রীটের কঠিন সাজ পরিয়ে দিয়েছে! দু'টি প্ল্যাটফর্মের

যোগসূত্র হিসাবে গ'ড়ে উঠেছে ইস্পাতের সুদীর্ঘ সেতু। অসংখ্য যাত্রীর কোলাহলে আর ফ্লুরোসেণ্ট লাইটের উজ্জ্বল ধাঁধায় চোখ আর মন ঝলসে গেল তার। অনেকেই তার দিকে তাকালো; কেউ হাসে, কেউ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে তীব্র অস্বস্তি জানায়। কাটা হাতটাকে আস্তিনে ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টায় কেঁচোর মতন একটা ভীরু দেহের সভয় স্বল্পতা নিয়ে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল সে। হুড়োহুড়ি ক'রে ভিড়ের কোলাহলটা ক্লান্ত ও শান্ত হয়ে খেলে মন্থর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

এতটা আশা করেনি সে। কেমন যেন অচেনা, অজানা মনে হয়। একটাও পরিচিত মুখ অনেক খুঁজেও তার চোখে পড়ল না। বহু পরিচিত পুরনো দিনের সেইসব নয়নরম্য দৃশ্যগুলিও ছদ্ম সাজের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে! এবার সত্যি সত্যিই তার ভয় করছিল; এবং বিস্ময় ও সন্দেহ। একজন পুলিশের লোককে তারই দিকে আসতে দেখে অকারণেই সে সন্দিগ্ধভাবে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

হঠাৎ একটা মিষ্টির দোকানে চোখ পড়তেই সে চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টেশনে ঢোকবার মুখে বটগাছের ছায়ায় ব'সে যে লোকটা বরফ বিক্রী করত, সেই লোকটাকে সে দেখেছে এবং দেখেই নির্ভুল চিনে ফেলেছে। তার চোখের বিস্মিত তারা দুটো একটু নরম হয়ে হেসে ফেলল হঠাৎ। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দোকানটার সম্মুখে দাঁড়াল সে। বিমূঢ়ভাবে, টেরিয়ে টেরিয়ে লোকটা তাকে দেখল কিছুক্ষণ; তারপর দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। কয়েকটা কুকুর পিছু পিছু চেঁচাতে চেঁচাতে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। কাটা হাতটা তুলেই সে একবার বাধা দিতে চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে একটা তীব্র জ্বালার ঘোরে সোজা এগিয়ে চলল।

ধাঁ ক'রে একটা চকচকে মোটর ছুটে বেরিয়ে গেল তার পাশ দিয়ে। পড়তে পড়তে সে সামলে নিল নিজেকে। অনেকদিন পরে আবার তার চোখদুটো ব্যথার করকর করছিল।

আচ্ছন্নের মতন পথের দু' পাশে তাকাতে তাকাতে চলছিল সে। অচেনা মানুষ, অচেনা পরিবেশ, পরিবেশের চিহ্নগুলোও বড়ই অচেনা! যুদ্ধের সেই উদ্দাম অস্থির কলরোলের ঢেউগুলি যেন এখানেও আছড়ে পড়ছে!

আবার একটা বাঁক ঘুরল এবং চম্‌কে উঠল সে। আরো একজন চেনা মানুষকে চিনতে পেরেছে। অন্তত এই দ্বিতীয় জন; মন্মথ, যে তার একান্ত অন্তরঙ্গ আর মধুর হৃদয়ের বন্ধু ছিল, নিশ্চয় তাকে চিনতে পারবে এই বিশ্বাসে একেবারে তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমায় চিনতে পার, মন্মথ?'

'কে!' সভয়ে পিছনে স'রে যায় মন্মথ।

'আমি, তোমার বন্ধু। সেই আট বছর আগে একদিন যুদ্ধে গিয়েছিলাম

মনে নেই? যাবার আগে তুমি কত মানা করেছিলে, কত অনুনয় করেছিলে, ভুলে গিয়েছ! মন্মথ, আজ এইমাত্র আমি দেশে ফিরছি।'

'ও, হ্যাঁ, কিন্তু—' আপাদ-মস্তক তাকে নিরীক্ষণ ক'রে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে মন্মথ বলল, 'ও, মনে পড়েছে। বেশ; এইমাত্র এলে বুঝি! আচ্ছা, পরে দেখা হবে।'

পিছন দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ সে নির্বাক, পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য! কেউ তাকে চিনতে পারছে না! অথবা, চিনেও ভুলে যেতে চাইছে! তার বিশ্বাসের গ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে ভেঙে পড়ছিল ক্রমশ।

তবু সে শান্ত হল, ঋজু হয়ে দাঁড়াল আবার। দূরের মন্দিরটা আর মন্দিরের পাশের সেই খয়ের গাছটা দেখেই সে বুঝে নিয়েছে যে, তার বড় আদরের পুরনো জীর্ণ বাড়ীটাও আর বেশী দূরে নেই। ওই তো বাঁকের পাশ দিয়ে যে পথটা ঘুরছে, সেই পথের উপরেই তার বাড়ী।

কিন্তু বাঁকের পথ ঘুরেই তার চোখের দৃষ্টি যেন আর্তনাদ ক'রে উঠল। স্পষ্ট দেখছে সে, তার চোখের সম্মুখে সেই বাড়ী আর নেই, বাড়ীর বাইরে সেই ফণি মনসার জঙ্গলও কোথায় অদৃশ্য হয়েছে! অথচ, বাড়ীর পাশে সেই দেবদারুর গাছটা ঠিক তেমনিই আছে। শুধু বাড়ীটাই বদলে গিয়েছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে দেখল, জীর্ণ পুরনো চেহারার বাড়ীর কঙ্কালটাকে পায়ের নিচে থেঁতলে মাড়িয়ে দোতলা সুদৃশ্য ও সুবিশাল হর্ম্য উঠেছে সেখানে। কাঁটার খোসা ছাড়িয়ে অজস্র ফুলে ফুলে বাগান ভ'রে গিয়েছে। বিরাট লোহার ফটকের বাইরে অপেক্ষমান ঝকঝকে মোটর গাড়ীটার পাশে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে সে এইসব দেখতে লাগল। দেখতে তার ভালই লাগছিল। সেও এই রকম ছবির মতন যৌবন-পুষ্ট আনন্দের পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিল! সে-স্বপ্ন তার আগেই সার্থক হয়ে ধরা দিয়েছে! এবং আট বছর পরে সে ফিরে এসেছে, সেই আনন্দে স্বপ্নের কুঁড়িগুলি এবার ফুল হয়ে ফুটবে, গন্ধ ছড়াবে। সে ভাবল।

ভাবতে ভাবতে সে এই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করবার পথ খুঁজছিল। সহসা তার মুগ্ধতাকে ভেঙে দিয়ে বাড়ীর ভিতর থেকে একটি যুবক আর একটি যুবতী বেরিয়ে এল, পথের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

এই তো আমার বোন! আমার সেই ছোট্ট এতটুকুন বোনটি আজ কত বড় হয়েছে! সে ভাবল। আর এমন ফুলের মতন রূপ, দুধের মতন রঙ, ঝলমলে পোষাকে পরীর মতন আশ্চর্য সুন্দর! সে ঠিক চিনেছে। তার ইচ্ছা করছিল, তার ছোট আদরের বোনটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। তবু, সেই অচেনা পুরুষটিকে দেখে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল।

ফটকের বাইরে এসে যুবক-যুবতী মোটরে উঠতে যাচ্ছিল। সে বেশ বুঝতে পারল, এখুনি স্টার্ট নিয়ে মোটরটা তাকে না চিনেই অদৃশ্য হয়ে যাবে। সেই

মুহূর্তে সমস্ত আবহাওয়াটাই তার কেমন অসহ্য মনে হল; মস্তিষ্কের সমস্ত বুদ্ধি আর বোধগুলি অচেতন হবার আগে হঠাৎ কেমন সচেতন হয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়ে সে দেখল—তার গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। আড়ষ্ট অস্ফুট কণ্ঠে সে তবু ডাকল, 'যূথি, যূথি!'

শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ায় মেয়েটি। তারপর কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে খুঁজছেন আপনি! কার নাম ডাকলেন!'

অসহিষ্ণু গলায় ব্যস্ত ভাবে সে বলল, 'সে কী! তুমিও আমাকে—' এই পর্যন্ত ব'লে সে থেমে গেল। তারপর অন্য ভাবে তার পরিচয় দিতে চাইল।

'তোমার মনে পড়ে, আট বছর আগে তোমার এক দাদা যুদ্ধে গিয়েছিল, তারপর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'হ্যাঁ', অবিচল কণ্ঠে মেয়েটি বলল, 'তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি। সে মারা গেছে।'

'মারা গেছে!' কাতর অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করল সে।

মেয়েটি অল্প একটু হেসে, যেন তার মুখের উপর একটা করুণার স্পর্শ বুলিয়ে মোটরে গিয়ে বসল, এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হল।

সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিশাল বাড়ীটার ভিতর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তার মনে হল, তার মাকে সে দেখতে পেয়েছে। মা, মা! মনে মনে চেঁচিয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে পাগলের মতন বাড়ীর ভিতরে ঢুকতে গিয়ে সে দেখল, তার চোখের সম্মুখে কখন দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পর পর সাজানো অনেকগুলি দরজার কোনটি দিয়ে গেলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে, তা বুঝতে পারল না।

তার ভয়ঙ্কর মুখটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ফেটে পড়ল; কঠিন চোখ দুটো গ'লে গিয়ে অশ্রু হয়ে ঝ'রে পড়ল। মাথার চুলগুলো এক হাতেই টেনে টেনে ছিঁড়তে চাইল সে। তারপর আস্তে আস্তে স্খলিত পায়ে পথে বেরিয়ে, কাছেই পথের পাশে মন্দিরটার দেয়ালে গা এলিয়ে দিয়ে, ক্লান্ত পাঁজর ভেঙে ব'সে পড়ল।

মন্দিরের আরতি কখন শেষ হল, আকাশে চাঁদ উঠল; সুন্দর ধবল অপরূপ চাঁদ এবং তারা; জ্যোৎস্নার বিভায় আচ্ছন্ন হল চতুর্দিক; সে খেয়াল করল না। স্থির শূন্য দৃষ্টি মেলে সে শুধু তার সম্মুখের সুবিশাল হর্ম্যের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মনে হচ্ছিল, তার চোখের সম্মুখে বাড়ীটা ক্রমশ প্রশস্ত হচ্ছে, এবং দীর্ঘ হয়ে আকাশের দিকে স্পর্ধিত হাত বাড়িয়েছে! বাড়ীটার ছায়ার আড়ালে ক্রমশ সব হারিয়ে যাচ্ছে! জ্যোৎস্নার মাধুর্যটুকুও অবশেষে তার চোখের সম্মুখে অন্ধ হয়ে হারিয়ে গেল।

সেই রাত্রেই তার মৃত্যু হল।

প রি চ য়

সুবোধ ঘোষ—বহু বিচিত্র ও ব্যাপক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সত্যকার বৈদগ্ধ্য ও শিল্প-নৈপুণ্যের সামঞ্জস্য সুবোধ ঘোষের রচনাকে দুর্লভ বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আশৈশব পরিচিত ছোটনাগপুর অঞ্চল তাঁর বহু রচনার পটভূমি হলেও বর্তমান বিশ্ব তাঁর মধ্যে বিম্বিত। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগি সম্পাদক।

আশাপূর্ণা দেবী—যে দৃষ্টি থাকলে বিন্দুতে বিশ্ব দেখা যায় আশাপূর্ণা দেবী তার অধিকারিণী। সহজ সাধারণ সংসার যাত্রার নেপথ্যে নগণ্য মানুষকে এমন বিস্ময়-বৈচিত্র্যে উদ্ভাসিত করে তোলার দৃষ্টান্ত যে-কোন সাহিত্যেই বিরল। বাসস্থান কলকাতা।

ভবানী মুখোপাধ্যায়—সংখ্যায় নয় ভবানী মুখোপাধ্যায়ের বিচার উৎকর্ষের মাপ-কাঠিতে। প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বজন স্বীকৃত; এবং মৌলিক রচনাও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। থাকেন কলকাতায়।

সতীনাথ ভাদুড়ী—প্রতিটি রচনায় যিনি নতুন বৈচিত্র্যের স্বাদ দিতে পারেন, মানবমনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্যা এবং সন্দেহ ও আবেগ যাঁর রচনায় নির্মমভাবে প্রকট, তিনি সতীনাথ ভাদুড়ী। স্থায়ীভাবে পূর্ণিয়ায় থাকেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী—বোধহয় যুদ্ধোত্তর যুগের সবচেয়ে নিন্দিত ও প্রশংসিত লেখক। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জগতের পরিবেশে তিনি এক উজ্জ্বল দর্পণ, যেখানে সবকিছুই নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত। চিন্তায় মননধর্মী। কলকাতায় থাকেন; সংবাদপত্রের সংগে যুক্ত।

বিমল মিত্র—বিমল মিত্রের খ্যাতি মূলতঃ ঔপন্যাসিক হিসেবে। তিনি 'সাহেব বিবি গোলামে'র লেখক। গল্প রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। অনায়াসভাষা ও পরিমিতবোধের অসাধারণত্বে তিনি একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী। কলকাতায় থাকেন।

নবেন্দু ঘোষ—বাস্তবধর্মী সমাজসচেতন শিল্পী নবেন্দু ঘোষ বস্তু ও আঙ্গিকের প্রতি সমান যত্নবান। চিন্তায় বলিষ্ঠ, দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক। প্রত্যেক রচনাতেই প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়। ছায়াচিত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত, থাকেন বোম্বাইয়ে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র—মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু সেই দুর্জ্ঞেয় মনের রহস্য উন্মোচনে এবং হৃদয়ের নিপুণ বিশ্লেষণে নরেন্দ্রনাথ মিত্র যে প্রখর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়

দিয়েছেন, তা বিস্ময়কর। কাহিনী বিন্যাসে ও চরিত্রসৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা অসামান্য। ভাষা স্নিগ্ধ, সাবলীল। সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত, কলকাতায় থাকেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবান সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মন ও বস্তু-জগতের সঙ্গে বহির্জগতের দুঃসাধ্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে। মানুষের পাশাপাশি বিশ্বপ্রকৃতিকেও তিনি ভালবেসেছেন। রূপসৃষ্টিতে অসাধারণ, দৃষ্টি নিঠুর দরদী। কাব্যমণ্ডিত ব্যঞ্জনাময় ভাষা। অন্যতম জনপ্রিয় সাহিত্যিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপক। কলকাতায় থাকেন।

সুশীল জানা—আধুনিক সমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে যে ক'জন সাহিত্যিক নির্মম বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছেন এবং বাস্তবের মধ্যেই সাহিত্যের উপকরণ খুঁজেছেন, সুশীল জানা তাঁদের মধ্যে অন্যতম ও বিশিষ্ট। সাহিত্যের অধ্যাপক। কলকাতায় থাকেন।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়—বিদেশের পটভূমিকায় সাহিত্য রচনা ক'রে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় খ্যাতি লাভ করেছিলেন। মানবতায় বিশ্বাসী, রচনায় স্নিগ্ধ সরসতা বর্তমান। ভাষা মনোরম। কলকাতায় থাকেন।

সন্তোষকুমার ঘোষ—বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যরচনায় সন্তোষকুমার ঘোষ আধুনিক কালে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খুব কম কথায় তিনি অনেক বেশী বক্তব্য উপস্থিত করেন। তীক্ষ্ম মার্জিত ভাষায় হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভবকে ব্যক্ত করবার দুর্লভ নৈপুণ্যে তিনি অদ্বিতীয়। দৃষ্টি তির্যক, সহৃদয়। শিল্পী হিসাবে তিনি ব্যঞ্জনাশ্রয়ী। কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত।

রমাপদ চৌধুরী—বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময় অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে যাঁরা বিস্তৃত করেছেন, রমাপদ চৌধুরী সেই বিরলতম গোষ্ঠীর অন্যতম। অরণ্য থেকে শহর, বন্যহৃদয় থেকে মধ্যবিত্ত মানস অবধি তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি। মূলতঃ রোমাণ্টিক। ভাষা মার্জিত, সুষমামণ্ডিত। সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। থাকেন কলকাতায়।

ননী ভৌমিক—মূলত প্রগতিপন্থী, মনোভাব বলিষ্ঠ। সামাজিক শৈথিল্যের উদ্ঘাটনে একাগ্রমন। মানবতার প্রতি আস্থা তাঁর সাহিত্যে নতুন ব্যঞ্জনা যুক্ত করেছে। কর্মসূত্রে বর্তমানে মস্কোয় থাকেন।

প্রতিভা বসু—নারী হৃদয়ের আলো অন্ধকারকে সাহিত্যে সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করার স্বাভাবিক নৈপুণ্যে প্রতিভা বসু বহুল পরিচিত। লাবণ্যময় ভাষার সৌকর্যে এবং কাহিনীর মনোরম বিন্যাসে তিনি সিদ্ধহস্ত। কলকাতায় থাকেন।

বিমল কর—নিজস্ব চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রয়োগে সাম্প্রতিক সাহিত্যকে সবচেয়ে বেশী চিহ্নিত করেছেন বিমল কর। গল্প উপন্যাসে তিনি নতুন রীতির পরীক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন। ভাষা ঋজু, ইঙ্গিতময়। চিন্তা বুদ্ধিদীপ্ত, সৃষ্টি মননধর্মী। একটি প্রখ্যাত সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। কলকাতায় থাকেন।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—ঔপন্যাসিক হিসাবে বেশী পরিচিত হলেও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য গল্পরচনায় একজন নিপুণ শিল্পী; যদিচ তাঁর গল্পের সংখ্যা খুব বেশী হয়ত নয়। কলকাতায় থাকেন।

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—ইউরোপের পটভূমিকায় উপন্যাস ও গল্পরচনা ক'রে সুধী-রঞ্জন মুখোপাধ্যায় খ্যাতিলাভ করলেও তাঁর সাম্প্রতিক রচনা আধুনিক সভ্যতার নকল রূপোদ্ঘাটনে তৎপর। কলকাতায় থাকেন।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাত্যহিক জীবনের বাইরের এক বিশাল জগতের ঐশ্বর্য সন্ধানে শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অখণ্ড মনোনিবেশ। আঞ্চলিক সাহিত্য রচনা ক'রে দূরকে নিকট করেছেন। কলকাতায় থাকেন।

লীলা মজুমদার—শিল্পী হিসাবে লীলা মজুমদার ঐতিহ্যের পরিপূরক। নিখুঁত গল্প রচনা ও তার মধ্যে জীবনের সূক্ষ্ম প্রতিফলন তাঁর বৈশিষ্ট্য। ঔপন্যাসিক ও শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি রয়েছে। অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত। কলকাতায় থাকেন।

সমরেশ বসু—বাংলাদেশের মাটির খুব কাছের শিল্পী সমরেশ বসু জীবনবাদী ও সমাজ সচেতন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর, এবং আন্তরিকতার নিবিড় উত্তাপে প্রত্যেক সৃষ্টিকে জীবন্ত করতে পারেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি অকৃত্রিম, চিন্তাধারা বলিষ্ঠ। মানুষ ও প্রকৃতি তাঁর রচনায় সমভাবে উপস্থিত। নৈহাটিতে থাকেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—সাহিত্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিচারের দুরূহ ব্রত নিয়েছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রত্যেক রচনাতেই একটি করুণ নম্র সমবেদনার সুর ব্যাপ্ত। উপন্যাস এবং গল্পের কাহিনী বয়নে দক্ষ কুশলী। প্রখ্যাত সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত। কলকাতায় থাকেন।

গৌরকিশোর ঘোষ—শিল্প চেতনায় একসঙ্গে লঘু ও গুরুর সংমিশ্রণ ঘটানোর দুর্লভ অভিনবত্বে গৌরকিশোর ঘোষ অদ্বিতীয়। মানব চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখী এবং তীক্ষ্ণ। কৌতুকরস জারিত হলেও দৃষ্টি মূলতঃ মমতাময়, বেদনামিশ্রিত। ছদ্মনাম 'রূপদর্শী'। ভাষা প্রসাদগুণান্বিত। কলকাতায় থাকেন এবং সাংবাদিক।

সত্যপ্রিয় ঘোষ—সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে হৃদয়কে প্রাধান্য দিলেও, বুদ্ধিকেও যাঁরা গ্রহণ করেছেন সত্যপ্রিয় ঘোষ তাঁদের একজন। শিল্পভাবনায় তিনি জীবনবাদী, প্রগতিপন্থী। বাস্তবের প্রতি অনুরাগ নিবিড়। কলকাতায় থাকেন।

অমল দাশগুপ্ত—জীবনের প্রতি গভীর মমত্ববোধ অমল দাশগুপ্তের রচনার প্রেরণা। কাহিনীর চেয়ে চরিত্রসৃষ্টির দিকে যেন তাঁর ঝোঁক বেশী। চিন্তায় বলিষ্ঠ, বাস্তবধর্মী। কলকাতায় থাকেন।

প্রফুল্ল রায়—আঞ্চলিক জীবনকে সাহিত্যের উপজীব্য করে ইদানিংকালে রসিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন প্রফুল্ল রায়। তাঁর রচনা মূলতঃ কাহিনীপ্রধান, কিন্তু চরিত্র চিত্রণও উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় থাকেন।

মতি নন্দী—তরুণ লেখকদের মধ্যে মতি নন্দী অত্যল্পকালের মধ্যেই রচনার গুণে সুপরিচিত হয়েছেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের যথার্থ রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা লক্ষ্যণীয়। একটি মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কলকাতায় থাকেন।

দিব্যেন্দু পালিত—তরুণতরদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে ক'জনের রচনায় বিশেষ শক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে, দিব্যেন্দু পালিত তাঁদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ। বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও মননের সংমিশ্রণে ইতিমধ্যেই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠরত। কলকাতায় থাকেন।